জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের
শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

ষষ্ঠ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

চাইতে গিয়ে
অধিকার
হয়ে গেলাম
রাজাকার

বাংলাদেশ

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

৬ষ্ঠ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা

জুলাই-২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

সম্পদ ও সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ প্রিয় বাংলাদেশ বিগত সাড়ে ১৫ বছরেরও বেশি সময় ফ্যাসিবাদী শাসনের নিপীড়নে জর্জরিত ছিল। দুঃসহ এই পরিস্থিতি থেকে জাতিকে মুক্ত করে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। এ অভ্যত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন স্তব্ধ করতে নির্বিচারে গুলি চালানোর আদেশ দেন ফ্যাসিস্ট সরকারের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরই জেরে শত শত ছাত্র ও নানা পেশার মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১০ হাজারের বেশি মানুষ কোনো না কোনো অঙ্গহানির শিকার হয়েছেন। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো সরকারের এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড ঘটানোর দৃষ্টান্ত যেমন নজিরবিহীন, তেমনি ফ্যাসিবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে এমন কোনো নজির বিশ্বে বিরল। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্র-জনতার এই অবিশ্বাস্য ত্যাগ ও কুরবানিগুলো তথ্য আকারে সংগ্রহে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে।

এই বাস্তবতায়, জুলাই-আগষ্ট মাসের গণঅভ্যুত্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় শাহাদত বরণকারী ভাই-বোনদের তথ্য নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র উদ্যোগে দশ খন্ডে "দ্বিতীয় স্বাধীনতার শহীদ যারা" শীর্ষক এই স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনীয় ডিজাইনসহ সম্পাদনা করেছেন এবং ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তাদের সকলের পরিশ্রম ও সময়দান আল্লাহ তা'আলা কবুল করুন।

সময়কে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে আমরা কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই কাজটি করেছি। তাই মুদ্রণ সংক্রান্ত ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে আপনাদের পরামর্শ ও মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযোজিত হবে। এখানে আরো একটি সীমাবদ্ধতাও প্রসঙ্গত স্বীকার করা প্রয়োজন। আমরা যখন পুস্তকাকারে এই বইটি প্রকাশ করছি, তখনও জুলাই বিপ্লবের শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। যারা আহত ছিলেন তাদের অনেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করায় তারা আহতের তালিকা থেকে এখন শহীদের তালিকায় চলে আসছেন। এ তালিকা সামনের দিনে আরো দীর্ঘ হবে বলে আমাদের আশংকা। কেননা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বেশ কিছু আহতের অবস্থা এখনো আশংকাজনক। তাই আগামীতেও বইটির কলেবর ও তথ্য স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হতে পারে।

দেশকে ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মুক্ত করার জন্য; দেশের মানুষগুলোকে মুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করলেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল্লাহ তাদের দ্রুত সুস্থতা দান করুন। আমিন।

বাংলাদেশ
জামায়াতে ইসলামী

আমীরে জামায়াতের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি সোনার বাংলাদেশ বিগত প্রায় দুই দশক ধরে আইনের শাসন, সুশাসন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করে একটি সমঝোতার নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসে ২০০৮ সালে। এরপর থেকেই তারা পরিকল্পিতভাবে দেশকে বিরাজনীতিকরণ ও বিরোধীমতশূণ্য করার অপপ্রয়াস শুরু করে।

বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী দুঃশাসনে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে অসহনীয় নির্যাতন করে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিচার বহির্ভুত হত্যাকান্ড, রিমান্ডের নামে অত্যাচার, ক্রসফায়ার, বিতর্কিত বিচারের মাধ্যমে বিরোধী নেতাদের হত্যা, গুম, খুন, আয়নাঘর, অপহরণ, বাক স্বাধীনতা হরণ, সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া, বিরোধী দলগুলোর অফিস অবরুদ্ধ করা, রাষ্ট্রীয়ভাবে নাগরিকদের কোণঠাসা করা কিংবা আইন সংশোধন করে ভিন্নমতের মানুষগুলোকে বিচারের মুখোমুখি করার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশ জুড়ে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি তৈরি করে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি, আলেম-ওলামাসহ সমাজের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর চরিত্রহনন, দেশকে একদলীয় কায়দায় শাসন, বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার, দেশের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস বা দুর্বল করার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই অন্যায্য কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করেছে। এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য সব বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতের শীর্ষ ১১ নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনটি প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জোরপূর্বক ক্ষমতা ধরে রেখেছে। নিজেদের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার কোনো বিকল্পও তাদের সামনে ছিল না। আর সে কারণেই জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও তারা কার্পণ্য করেনি। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই বিডিআর বিদ্রোহের নামে দেশপ্রেমিক ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করেছিল। ট্রাইবুনালে আল্লামা সাঈদীর বিরুদ্ধে রায়কে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ দমাতে সারা দেশে গুলি করে একই দিনে দুশোরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের ৫ মে ঢাকার শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের ওপর আওয়ামী সরকার গণহত্যা চালিয়েছিল। এর বাইরে পুরো ১৫ বছর জুড়ে নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে তাদের হত্যা, অপহরণ ও ক্রসফায়ার চলমান ছিল।

দেশের মানুষ আওয়ামী অনাচারের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বারবার। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে জনগণের সেই স্বতঃস্ফুর্ত আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই সময়ের চাকার আবর্তনে ২০২৪

সাল আমাদের মাঝে উপনীত হয়। এ বছরের একদম ২০২৪-এর শুরুর দিকে আওয়ামী লীগ বিতর্কিত ডামি নির্বাচন সম্পন্ন করে চতুর্থবারের মতো ক্ষমতায় আসে। তারা ধরেই নিয়েছিল স্বঘোষিত ভিশন অনুযায়ী ২০৪১ সাল পর্যন্ত এভাবেই তারা মসনদে থেকে যাবে।

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারি চাকুরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কারের দাবিতেই শুরু হয়েছিল এ আন্দোলন। কিন্তু সরকার বরাবরের মতোই দমন পীড়নের মাধ্যমে এই আন্দোলনটিও নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। তারা ছাত্রলীগের গুন্ডাদের দিয়ে ক্যাম্পাসগুলো থেকে আন্দোলনকারীদের বিতাড়িত করে। আর পুলিশ, র‍্যাব ও আইন শৃংখলা বাহিনী দিয়ে নির্বিচারে আন্দোলনরত ছাত্রজনতার ওপর গুলি বর্ষণ করে। এতে শতশত মানুষ নিহত হয় আর আহত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। অঙ্গহানি হয় ১০ হাজারের বেশি মানুষের।

এত রক্ত, এত লাশ এই জনপদ কোনো আন্দোলনের ইতিহাসে আর দেখেনি। নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি সরকার যেভাবে গুলি করেছে, নির্যাতন করেছে, লাশ পুড়িয়ে আলামত গায়েব করেছে তেমনটা অনেক যুদ্ধাক্রান্ত দেশেও দেখা যায় না। শেখ হাসিনার সরাসরি হুকুমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো দলীয় কর্মীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে নির্যাতন অব্যাহত রাখে এবং "দেখামাত্র গুলি" নীতি প্রয়োগ করতে থাকে।

দুঃখজনক হলেও সত্য, সরকারদলীয় মিডিয়াগুলো এই অমানবিক কার্যক্রমের তথ্য ও ছবি আড়াল করে যায়। সরকারের পোষ্য এ মিডিয়াগুলো বরং সরকারি বয়ানের আলোকে কথিত স্থাপনা ধ্বংসের ছবি ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে মায়াকান্না দেখায়। ফলে, এই জুলুম ও জুলুমের ভিকটিমদের দুর্বিষহ নির্যাতনের বিবরণীগুলো মূলধারার অনেক মিডিয়াতেই পাওয়া যায়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই কেবল এই ফুটেজ ও বর্বরতার দৃশ্যগুলো মানুষ দেখার সুযোগ পেয়েছে। যদিও দফায় দফায় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মাধ্যমে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপরও খড়গ চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই বাস্তবতায় জুলাই বিপ্লবের শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আমরা একটি সংকলন বের করার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু এসব তথ্য ও ছবি অনেক গণমাধ্যমই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে এড়িয়ে গিয়েছে, তাই আমাদেরকে পৃথক টিম ও দল তৈরি করে তৃণমূল পর্যায়ে প্রেরণ করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এরপরও সাংগঠনিক দিকনির্দেশনার আলোকে আমাদের নেতাকর্মীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এবং কষ্ট সহ্য করে ৩৬ জুলাই'র আত্মত্যাগের ঘটনাগুলো পুস্তকবন্দী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সমগ্র বিশ্বকে এই আওয়ামী সরকারের শেষ সময়ের এই হত্যাকান্ড ও জুলুম সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে অবহিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মুদ্রণ সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সময় ও সুযোগের অপর্যাপ্ততার কারণে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত করাও সম্ভব হয়নি। আশা করি, এই বইয়ের মধ্য দিয়ে সংকলিত বিষয়গুলো জানার পাশাপাশি শহীদ, আহত-পঙ্গু, নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ ভাই-বোনদের এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলেই এগিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমল ও দোয়া কবুল করুন। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী ও জনতার কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। এত ত্যাগের বিনিময়ে যে দুঃশাসন বিদায় নিয়েছে, তা যেন আবার ভিন্ন কোনো মোড়কে ফিরে না আসে। সকলে একতাবদ্ধ থেকে যেন আমরা দেশ ও জাতিকে সব ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারি। এত ত্যাগের বিনিময়ে আসা 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' সফল ও স্বার্থক হোক। আমিন।

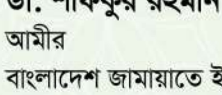

ডা. শফিকুর রহমান
আমীর
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
	৬ষ্ঠ খন্ড (বরিশাল বিভাগ)	
৩৩৮	শহীদ মো: আল আমিন হোসেন আগমন	৭-৯
৩৩৯	শহীদ মো: টিটু হাওলাদার	১০-১৩
৩৪০	শহীদ মো: লিটন	১৪-১৬
৩৪১	শহীদ মো: মিজানুর রহমান	১৭-২০
৩৪২	শহীদ মো: রাসেল মাহমুদ	২১-২৪
৩৪৩	শহীদ মো: আমিন	২৫-২৭
৩৪৪	শহীদ মো: দুলাল সরদার	২৮-৩০
৩৪৫	শহীদ মো: বাচ্চু	৩১-৩৪
৩৪৬	শহীদ মো: রায়হান আকন	৩৫-৩৮
৩৪৭	শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া	৩৯-৪৩
৩৪৮	শহীদ মো: মিলন	৪৪-৪৬
৩৪৯	শহীদ মো: জসিম উদ্দীন	৪৭-৪৯
৩৫০	শহীদ মো: নবীন তালুকদার	৫০-৫২
৩৫১	শহীদ সাংবাদিক মো: মেহেদী হাসান	৫৩-৫৬
৩৫২	শহীদ মো: সাইদুর রহমান ইমরান	৫৭-৫৯
৩৫৩	শহীদ জিহাদ হোসেন	৬০-৬২
৩৫৪	শহীদ মো: আতিকুল ইসলাম	৬৩-৬৫
৩৫৫	শহীদ মো: রাসেল	৬৬-৬৮
৩৫৬	শহীদ মো: সাগর গাজী	৬৯ -৭১
৩৫৭	শহীদ মো: মামুন	৭২-৭৪
৩৫৮	শহীদ মো: শাহ জামাল ভূঁইয়া (জামাল)	৭৫-৭৭
৩৫৯	শহীদ আখতারুজ্জামান নাইম	৭৮-৮২
৩৬০	শহীদ মো: জাকির হোসেন	৮৩-৮৪
৩৬১	শহীদ মো: আরিফ	৮৫-৮৭
৩৬২	শহীদ মো: বাবলু মৃধা	৮৮-৯০
৩৬৩	শহীদ মো: মনির	৯১-৯৩
৩৬৪	শহীদ মো: রাব্বি	৯৪-৯৬
৩৬৫	শহীদ মো: ইয়াছিন	৯৭-৯৯
৩৬৬	শহীদ মো: সজিব	১০০-১০২
৩৬৭	শহীদ মো: সিয়াম	১০৩-১০৫
৩৬৮	শহীদ মোসা: লিজা	১০৬-১০৮
৩৬৯	শহীদ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	১০৯-১১১
৩৭০	শহীদ মো: বাহাদুর হোসেন মনির	১১২-১১৪
৩৭১	শহীদ মো: নাহিদুল ইসলাম	১১৫-১১৮

সূচিপত্র

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
৩৭২	শহীদ মো: শাহিন	১১৯-১২১
৩৭৩	শহীদ সাইদুল ইসলাম	১২২-১২৪
৩৭৪	শহীদ মো: সেলিম তালুকদার	১২৫-১২৮
৩৭৫	শহীদ কামাল হোসেন	১২৯-১৩৩
৩৭৬	শহীদ মিরাজ	১৩৪-১৩৫
৩৭৭	শহীদ মো: রনি	১৩৬-১৩৮
৩৭৮	শহীদ মো: শামিম হাওলাদার	১৩৯-১৪১
৩৭৯	শহীদ হাবিবুর রহমান	১৪২-১৪৪
৩৮০	শহীদ মো: ফজলু	১৪৫-১৪৭
৩৮১	শহীদ মো: শিহাব উদ্দিন	১৪৮-১৫০
৩৮২	শহীদ মো: রাকিব	১৫১-১৫৩
৩৮৩	শহীদ ওমর ফারুক	১৫৪-১৫৬
৩৮৪	শহীদ মো: জসিম	১৫৭-১৬০
	(খুলনা বিভাগ)	
৩৮৫	শহীদ মো: হাফিজ উদ্দিন	১৬১-১৬৪
৩৮৬	শহীদ সামিউর রহমান সাদ	১৬৫-১৬৮
৩৮৭	শহীদ আব্দুল আজিজ (চাঁন মিয়া)	১৬৯-১৭১
৩৮৮	শহীদ মো: রিয়াদ শেখ	১৭২-১৭৫
৩৮৯	শহীদ ফজল মাহদী চয়ন	১৭৬-১৭৮
৩৯০	শহীদ মো: খালিদ হোসেন শান্ত	১৭৯-১৮১
৩৯১	শহীদ মো: সাকিবুল হাসান মাহি	১৮২-১৮৪
৩৯২	শহীদ মো: ইউসুফ আলী	১৮৫-১৮৭
৩৯৩	শহীদ মো: মেহেদী হাসান আলিফ	১৮৮-১৯০
৩৯৪	শহীদ মো: মেহেদী হাসান	১৯১-১৯৩
৩৯৫	শহীদ রোকনুজ্জামান রাকিব	১৯৪-১৯৬
৩৯৬	শহীদ মো: রাসেল রানা বাশার	১৯৭-১৯৯
৩৯৭	শহীদ মো: আলামিন বিশ্বাস	২০০-২০২
৩৯৮	শহীদ মো: তারেক রহমান	২০৩-২০৬
৩৯৯	শহীদ সিফাত হোসেন ফেরদৌস	২০৭-২০৮
৪০০	শহীদ এম এম তৌহিদুর রহমান	২০৯-২১১
৪০১	শহীদ ইমতিয়াজ আহম্মেদ জাবির	২১২-২১৪
৪০২	শহীদ সাকিবুল হাসান সাকিব	২১৫-২১৮
৪০৩	শহীদ মো: সোহানুর রহমান শিহাব	২১৯-২২১
৪০৪	শহীদ সৈয়দ মিথুন মোর্শেদ	২২২-২২৪

বিভাগ ভিত্তিক শহীদের তালিকা
ঢাকা সিটি ১১৮
সিলেট বিভাগ ৩০
ঢাকা বিভাগ ১৩৩
রাজশাহী বিভাগ ৫৬
বরিশাল বিভাগ ৭৭
খুলনা বিভাগ ৬০
চট্টগ্রাম বিভাগ ১০৯
রংপুর বিভাগ ৫২
ময়মনসিংহ বিভাগ ৭৬
মোট : ৭১১
০৫ পঞ্চগড়
০৪ ঠাকুরগাও
০৪ নিলফামারী
০৮ লালমনিরহাট
০৪ কুড়িগ্রাম
০৮ দিনাজপুর
১৭ রংপুর
রংপুর ৫০
গাইবান্ধা
০৪ জয়পুরহাট
০৭ নওগাঁ
১৫ বগুড়া
০১ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী ৫৫
০৩ রাজশাহী
০৮ নাটোর
১০ সিরাজগঞ্জ
০৭ পাবনা
১৮ শেরপুর
১৪ জামালপুর
৭৫ ময়মনসিংহ
১২ নেত্রকোনা
৩০ ময়মনসিংহ
০১ সুনামগঞ্জ
সিলেট ২৮
১৩ সিলেট
১৪ হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
০৭ টাঙ্গাইল
০৭ কিশোরগঞ্জ
২৪ গাজীপুর
১২৭ ঢাকা
১৮ নরসিংদী
২১ ঢাকা জেলা
০৩ মানিকগঞ্জ
০১ রাজবাড়ী
১১৮ ঢাকা সিটি
১৯ নারায়ণগঞ্জ
০৭ ফরিদপুর
০৯ মুন্সিগঞ্জ
০৫ শরীয়তপুর
০৯ মাদারীপুর
০৪ গোপালগঞ্জ
১২ কুষ্টিয়া
মেহেরপুর
০২ চুয়াডাঙ্গা
০২ ঝিনাইদহ
০৭ মাগুরা
২৪ যশোর
নড়াইল
খুলনা ৫৯
০৪ সাতক্ষীরা
০৪ খুলনা
০৪ বাগেরহাট
২০ বরিশাল
০৪ পিরোজপুর
বরিশাল ৭৪
২২ ভোলা
০৫ ঝালকাঠি
২১ পটুয়াখালী
০৫ বরগুনা
০৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২৭ কুমিল্লা
১৮ চাঁদপুর
০৮ লক্ষীপুর
২১ নোয়াখালী
১২ ফেনী
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
১৩ চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম ১০৫
বান্দরবন
কক্সবাজার

শহীদ মো: আল আমিন হোসেন আগমন

ক্রমিক : ৩৩৮

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৬

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আল আমিন হোসেন আগমন ১৯৯০ সালের ১৪ এপ্রিল বরগুনা জেলার নাপিতখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মো: হানিফ চিশতী ও মাতা মোছা: মুনিয়া বেগমের একমাত্র ছেলে ছিলেন আল আমিন হোসেন আগমন। নয় ভাই বোনের মধ্যে তিনি একমাত্র ছেলে সন্তান। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে তিনি কত আদরের সন্তান ছিলেন। ঢাকায় নিজস্ব কম্পিউটার ও মোবাইলের দোকান ছিল আগমনের।

জীবনে অনেক স্বপ্ন এঁকে ছিলেন যে ঢাকায় অনেক বড় বাড়ি করবেন এবং বড় ব্যবসায়ী হবেন। আর তার স্বপ্নগুলো শুধু নিজেকে নিয়ে নয় গরিব দুঃখী মানুষকে নিয়েও ছিল। তিনি বলতেন আমাদের জীবনের সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন এজন্য যে আমরা যেন এগুলো ভালোভাবে বন্টন করতে পারি। আমাদের সম্পদ শুধু আমরা ভোগ করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে পারবো না। আমাদের সম্পদের ভিতরে গরিব-দুঃখীদের হক আছে। সেই হক আমাদের সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। আওয়ামীলীগ সন্ত্রাসী পুলিশের গুলিতে দুনিয়ার সকল স্বপ্নকে বাদ দিয়ে পরকালে পাড়ি জমাতে হলো মোঃ আল আমিন হোসেন আগমনকে।

ঘটনার সংক্রান্ত বিবরণ

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী শাসনের দ্রুত পতনটি ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহিলা রাষ্ট্রপ্রধানের ঐতিহাসিক পতন মধ্যপ্রাচ্যের আরব বসন্তের প্রতিফলন, যা ২০১০ সালে শুরু হয়েছিল। যখন কর্তৃত্ব বিরোধী বিদ্রোহ এই অঞ্চলে একের পর এক কুখ্যাত স্বৈরশাসকের পতন ঘটায়। তার আচরণ তিউনিসিয়ার বেন আলী, মিশরের হোসনি মোবারকের মতো ক্ষমতাচ্যুত আরব নেতাদের আগ্রাসী স্বৈরাচারী প্রবণতা এবং নৃশংস পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।কে জানতো যে ফ্যাসিবাদী সরকার পতনের পরেও এভাবেই সাধারণ মানুষের উপর হত্যাকান্ড চালাবে! বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুরো সময় ধরে যত মানুষ শহীদ হয়েছেন তার চেয়ে বেশি শহীদ হয়েছেন সম্ভবত বিজয়ের দিন । শেখ হাসিনা ভেবেছিল আমি যখন চলেই যাব, তখন বাংলাদেশের মানুষদের যতোটুকু পারা যায় কাঁদিয়ে যাবো।

শহীদ আল আমিন হোসেন আগমন শুরু থেকেই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। ৫ আগষ্ট ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পালিয়ে যাবার পর বিজয় মিছিল নিয়ে বাড্ডা থানার সামনে থেকে মেইন রোড হয়ে গনভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। তখন বিকাল ৫:০৫ মিনিটের দিকে মিছিলের উপর মুহুর্মুহু গুলি আসতে থাকে। হঠাৎ তিনি কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়েন। পরবর্তীতে সেখান থেকে বিপ্লবী ছাত্রজনতা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরাও খবর পেয়ে ঢাকা মেডিকেলে যান। পরবর্তীতে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারনে কালক্ষেপণ না করে বাবা আবু হানিফ চিশতী (৬৭) তার লাশ নিয়ে বরগুনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ঐ দিন রাত ১১টায় বরগুনা সদরের নাপিতখালী নিজ গ্রামে দাফন করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই শহীদদের রক্ত, এই শহীদদের গল্প এবং এই শহীদদের উদাহরণ ছাড়া আর কোন ইতিহাস লেখা হয়নি। এই শহীদদের মতো লোকেদের দ্বারা জাতি প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বাসে সজীব হয় এবং চিন্তার জয় হয়।

শহীদের এক বন্ধুর কথা

আমাদের মাঝে আল আমিন ছিল সবার প্রিয়। তার অমায়িক ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করত শহীদ আল আমিন হোসেন আগমন নিয়মিত সকলপ্রকার সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতেন। সমাজের মানুষের যেকোন বিপদে সে সবার আগে ছুটে যেতেন। সকলের কাছে আল আমিন পরোপকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সে সব সময় স্থানীয় সকল ভালো উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতেন। আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি নিয়মিত মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। আল আমিন বন্ধুদের কাছে সব সময় বলতেন- আমি যেন শহীদ হতে পারি।

পিতার অনুভূতি

আমি আমার একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে ফেললাম। সে তো কোন অন্যায় করেনি বরং অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। আমার ছেলে সকলের কাছে প্রিয় ছিল। তারপরেও স্বৈরাচার শেখ হাসিনা আমার ছেলেকে হত্যা করলো। আমি শেখ হাসিনা সহ হত্যাকাণ্ডে জড়িত সকলের ন্যায্য বিচার দাবি করছি।

পারিবারিক অবস্থার বিবরণ

আল আমিন হোসেনের বাবা আবু হানিফ চিশতী(৬৭) সেগুন বাগিচায় জেনারেটরের ব্যবসা করেন। এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন দোকান ও প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকেন। তার বাবা দুই বিয়ে করেন। ১ম ও ২য় স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে সেগুন বাগিচায় থাকেন। আল আমিনের বাবা মোট ৯ সন্তানের জনক। ৮ মেয়ে ও একমাত্র ছেলে আল আমিন (২৫)। আল আমিন হোসেন ভাটারায় আগমন মোবাইল এন্ড কম্পিউটার পয়েন্ট এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। আল আমিন ও তার বাবার আয়ের মাধ্যমে পরিবার চলতো। তিনি ৫ বছর পূর্বে বিয়ে করেছিলেন এবং পারিবারিক কলহে তালাক হয়ে যায়। বর্তমানে তার কোন স্ত্রী, সন্তান নেই। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে আল আমিনের বাবা, মা ও বোন পাগল প্রায়। এমতাবস্থায় আর্থিক সমস্যা বেশি না থাকলেও একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে অসহায় হয়ে গেছে।

এক নজরে শহীদ আল আমিন

নাম	: মো: আল আমিন হোসেন আগমন
জন্ম তারিখ	: ১৪-০৪-১৯৯০
জন্মস্থান	: নাপিতখালী, বরগুনা সদর, বরগুনা
পেশা	: ব্যবসা, (আগমন মোবাইল এন্ড কম্পিউটার পয়েন্ট)
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: ২৭/সি তোপখানা রোড, এলাকা : সেগুনবাগিচা
থানা	: শাহবাগ, জেলা: ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:গ্রাম: নাপিতখালী, ইউনিয়ন: বুড়িরচর থানা : বরগুনা সদর, জেলা: বরগুনা
পিতার নাম	: মো: হানিফ চিশতী (৬৭) জেনারেটর ব্যবসায়ী
মাতার নাম	: মুনিয়া বেগম (৫৫) গৃহিণী
বোন	: ৮ বোন, ভাই নেই
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত (বিচ্ছেদ)
আঘাতকারীর	: পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: আজমপুর, উত্তরা, ০৫-০৮-২০২৪, বিকাল ৫:০৫টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ০৫-০৮-২০২৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সন্ধ্যা ৬:০০টায়
জানাজ	: ০৫-০৮-২০২৪ রাত ১১:০০ টায়
কবরস্থান	: নাপিতখালী , বরগুনা সদর, বরগুনা

শহীদ মোঃ টিটু

ক্রমিক : ৩৩৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৭

শহীদ মোঃ টিটু এর প্রাথমিক জীবন

বরগুনার বেতাগী থানার দক্ষিণ হাসনাবাদে ১৯৯১ সালের প্রথম দিন জন্মগ্রহণ করেন টিটু হাওলাদার। পিতা আব্দুর রহিম হাওলাদার মাতা রাশেদা বেগমের সন্তানদের মধ্যে টিটু হাওলাদার ছিলেন দ্বিতীয়। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে শিক্ষাজীবনের ইতি টানেন। তারপর তিনি মাইক্রো বাসের ড্রাইভার হওয়ার জন্য ড্রাইভারের প্রশিক্ষণ নেন। মৃত্যু কালীন সময়ে তিনি অ্যাম্বুলেন্স চালাতেন। তার পরিবারে স্ত্রী সহ তিন সন্তান আছে। স্ত্রীসহ তিন সন্তান গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন এবং টিটু হাওলাদার ঢাকাতে এক ডাক্তারের অ্যাম্বুলেন্স চালাতেন। কিছুদিন আগে ঋণ করে তিনি একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করেছিলেন। এই অ্যাম্বুলেন্সটা তার নিজ এলাকায় ভাড়া দেওয়া আছে। বসত বাড়ি ছাড়া তার ফসলি কোন জমি বা সম্পত্তি নেই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ভালোভাবেই ইসলাম চর্চা করতেন। ইসলামের জন্য তার হৃদয়টা ছিল অনেক বড়। ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে ১৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে পুলিশের গুলিতে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

শাহাদাতের ঘটনা

হাওলাদার যেদিন শাহাদাত বরণ করেন সেদিন জুম্মার নামাজ পড়ে তিনি পরিবারের সাথে কথা বলেছিলেন। তার স্ত্রী তাকে বললেন "তুমি কিন্তু আন্দোলনে যাবে না। আমরা গরীব মানুষ আমাদের আন্দোলনে যেয়ে কোন ক্ষতি হয়ে গেলে কেউ দেখবে না।

হাওলাদার জবাবে বললেন, আমার যদি মৃত্যু লেখা থাকে আন্দোলনে গেলেও হবে না গেলেও হবে। আমি আন্দোলনে যাবো আমাকে অবশ্যই সত্যের পথে থাকতে হবে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আমি যদি আন্দোলনে শরিক না হই তাহলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেব। তার স্ত্রী বললেন, যে কোন ক্ষতি হয়ে গেলে আমাদের পরিবারকে কে দেখবে। আমরা কিভাবে বাঁচবো? শহীদ হাওলাদার বললেন, যে আল্লাহ সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে রিযিক দিচ্ছেন, আমি যদি শহীদ হই আমার পরিবারের রিজিকও তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

টিটুর এক বন্ধু তাকে বলেছিলেন যে, তোমার আন্দোলনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ঢাকাতে দেখার তোমার কেউ নেই। তাই তুমি অ্যাম্বুলেন্স চালাচ্ছো ভালো কথা কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে যেও না। হাওলাদার কারো কথায় কান না দিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি দৃঢ় মনোবল নিয়ে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। ১৯ জুলাই ২০২৪ জুম্মার নামাজ আদায় করার পর বাসা থেকে খাওয়া-দাওয়া করে তিনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিতে ধানমন্ডি ৬ নম্বর রোডে উপস্থিত হন। এখানে পুলিশ এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। পুলিশ নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের উপরে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকে। তারা যেভাবে মানুষের উপরে গুলি করছে মনে হচ্ছে যেন ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। মনে হচ্ছে এক দেশ আরেক দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। অথচ এই পুলিশ বাহিনী এদেশেরই সন্তান এদেশের মানুষ। তাহলে এদেশের সন্তান হয়ে কিভাবে তারা আরেক ভাইয়ের বুকে গুলি করছে অবাক করার বিষয়।

এক পর্যায়ে টিটু হাওলাদার দৌড়ে-দৌড়ে আন্দোলনকারীদের সাহস যোগানোর জন্য বিভিন্ন উৎসাহমূলক কথা বলতে ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ সামনে থেকে পুলিশের একটি বুলেট এসে তার মাথায় বৃদ্ধ হয়। যে কপাল দিয়ে তিনি নিয়মিত আল্লাহকে সিজদা করতেন সেই কপালেই পুলিশ গুলি করে শহীদ করলেন। বাবাকে হারানো শিশুদের কান্না দেখে আশে-পাশে মানুষগুলোও চোখের পানি ধরে রাখতে পারে না। সন্তান হারিয়ে পাগল প্রায় বাবা আব্দুর রহিম হাওলাদার। স্ত্রী আয়েশা বেগম তিন শিশু সন্তান নিয়ে চরম অসহায় হয়ে পড়েছেন। বাবা স্ত্রী ও তিন শিশু সন্তানকে বাড়িতে রেখে টিটু হাওলাদার একা কর্মস্থলে থাকতেন। টিটু হাওলাদারের স্ত্রী আয়েশা বেগম জানান, টিটু গত ১১ জুলাই বাড়ি থেকে কর্মস্থল ঢাকায় যান। গত শুক্রবার বিকেলে ফোন করে তাদের এক নিকট আত্মীয় জানান, তোমার স্বামীর গায়ে গুলি লেগেছে। বিনা অপরাধে তাকে জীবন দিতে হলো। আমি অবুঝ সন্তানদের কী বুঝ দেবো? গত রোববার (২১ জুলাই) রাতে টিটু হাওলাদারের ফুফাতো ভাই মোঃ রাকিব লাশ নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে আসেন। ঐ দিন

রাতেই জানাজা শেষে স্থানীয়ভাবে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এক সহকর্মীর বক্তব্য

টিটু হাওলাদার সব সময় ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতেন। আমরা

তাকে বৈষম বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করলেও সে বলতো আমি শাহাদাত বরণ করব, কিন্তু আন্দোলনকারীদের পক্ষে থেকে দূরে থাকতে পারবো না। স্বৈরাচার শেখ হাসিনা এদেশের ছাত্রদের যেভাবে বৈষম্যের ভিতরে আটকিয়ে রেখেছে আমি সেটার মুক্তি চাই। তোমরা আমাকে

নিষেধ করোনা পারলে তোমরাও অংশগ্রহণ করো।

শহীদের মেয়ে হিরা মনির বক্তব্য

আমার বাবাকে কেন মারা হলো? আমার বাবার দোষ কি ছিল? আমার বাবা কি কাউকে হত্যা করেছে যে আমার বাবাকে তারা হত্যা করল? এই দুনিয়ায় সত্যের পথে থাকাও কি দোষ সত্য কথা বললেই তাকে মরতে হবে? তাহলে তো কেউ সত্য কথা বলবে না কেউ ভালো কথা বলবে না সবাই মিথ্যা কথা বলবে এবং অন্যায়ের পক্ষ নিবে।আমার বাবাকে তোমরা ফিরিয়ে দাও। আমি আমার বাবাকে চাই।

পারিবারিক অবস্থা

মো. টিটু হাওলাদারের অটো চালক বাবা আব্দুর রহিম হাওলাদার এখন বয়সের ভারে ন্যুজ। আর টিটুর চার ভাই বোনের মধ্যে মো. ইমরান হোসেনও অটোরিকশা চালিয়ে চলে। বলতে গেলে এখন মানুষের দানে চলে টিটুর পরিবারের জীবিকা। বিবাহিত বড় বোন রুমেনা বেগম (৩৫) থাকেন স্বামীর সংসারে আর ছোট বোন ফাতিমা আক্তার (১৮) প্রতিবন্ধী হওয়ায় বসবাস করেন একই

সংসারে।বড় মেয়ে তানজিলা বাড়ির কাছে আনোর জলিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে ও ছেলে সাইমুন স্থানীয় বয়াতি বাড়ি কওমি মাদরাসার প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ও তিন বছরের আরেকটি সন্তান নিয়ে শহীদ টিটো হাওলাদারের স্ত্রী আয়েশা বেগম এখন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

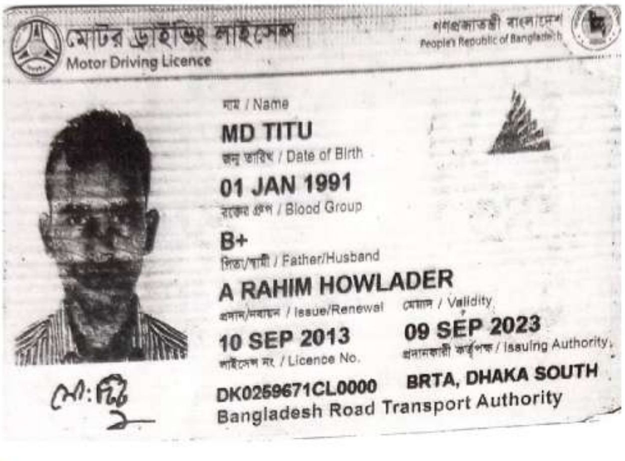
মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স
Motor Driving Licence
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
People's Republic of Bangladesh
নাম / Name
MD TITU
জন্ম তারিখ / Date of Birth
01 JAN 1991
রক্তের গ্রুপ / Blood Group
B+
পিতা/স্বামী / Father/Husband
A RAHIM HOWLADER
প্রদান/নবায়ন / Issue/Renewal
10 SEP 2013
মেয়াদ / Validity
09 SEP 2023
লাইসেন্স নং / Licence No.
DK0259671CL0000
প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ / Issuing Authority
BRTA, DHAKA SOUTH
Bangladesh Road Transport Authority
মো: টিটু

৩নং হোসনাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

-ঃ মৃত্যু সনদ পত্র ঃ-

এই মর্মে মৃত্যু প্রমান পত্র প্রদান করা যাইতেছে যে, বরগুনা জেলার অন্তর্গত বেতাগী উপজেলাধীন হোসনাবাদ ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের, মোঃ টিটু, পিতাঃ আঃ রহিম হাওলাদার, মাতাঃ মোসাঃ রাশেদা বেগম, গ্রামঃ দক্ষিণ হোসনাবাদ, ডাকঘরঃ রহিমাবাদ, উপজেলাঃ বেতাগী, জেলাঃ বরগুনা। তিনি বিগত ২০/০৭/২০২৪ ইং তারিখ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলি-বিদ্ধ হয়ে গ্রীন লাইফ হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।

এক নজরে শহীদ মোঃ টিটু

নাম	: মোঃ টিটু
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-১৯৯১
জন্মস্থান	: দক্ষিণ হসনাবাদ, বেতাগী, বরগুনা
পেশা	: অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ হোসনাবাদ, ইউনিয়ন: ৩ নং হোসনাবাদ, থানা: বেতাগী, জেলা: বরগুনা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ হোসনাবাদ, ইউনিয়ন: ৩ নং হোসনাবাদ, থানা: বেতাগী, জেলা: বরগুনা
পিতা	: মোঃ রহিম হাওলাদার
মাতা	: মৃত রাশেদা বেগম
স্ত্রী	: আয়েশা বেগম (৩০), গৃহিনী
ছেলে মেয়ে	: ১. হিরা মনি (১২), আনোয়ার জলিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়, চতুর্থ শ্রেণি ২. সায়মুন (৭), নূরানী মাদ্রাসা, প্রথম শ্রেণি ৩. তামান্না আক্তার (৩)
আঘাতকারীর	: আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: ধানমন্ডি, ৬ নম্বর রোড, ১৯-৭-২০২৪, বিকেল ৪:০০টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০-০৭-২০২৪, দুপুর ১২:০০টায়, গ্রীন লাইন হাসপাতাল, ধানমন্ডি ঢাকা
জানাজা	: ২১-০৭-২০২৪, রাত ১০:০০ টায়
কবরস্থান	: নিজে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে

২. সন্তানদের লেখা-পড়ার দায়িত্ব নেয়া দরকার

মো: লিটন

ক্রমিক : ৩৪০

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৮

জন্ম পরিচয়

কীর্তিমানদের কখনো মৃত্যু হয় না। কী জাগ্রত কী নিশীথে কীর্তিমানরা চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ে। ঠিক তেমনি রয়ে যাবে বরগুনা জেলার সোনার বাংলা গ্রামের সোনার ছেলে মো: লিটন মাতুব্বর। তিনি একজন সংগ্রামী ও সাহসী যুবক ছিলেন। লিটন ১৯৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বরগুনা জেলার বেতাগি থানার অন্তর্ভুক্ত সোনার বাংলা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: তৈয়াব আলী এবং মাতা মোসা: মনোয়ারা বেগম। চার ভাইবোনের মধ্যে লিটন ছিলেন সবার বড়। পরিবার প্রধান বাবা অসুস্থ থাকায় ভাইবোনসহ পুরো পরিবারের দায়িত্বও নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। অভাবের সংসারে বড় হওয়া লিটন বেশি দূর পড়াশোনা করতে পারেননি। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পরে দারিদ্রতার কষাঘাতে এবং পরিবারের দায়িত্ব নিতে ছুটে চলেন রাজধানীর উদ্দেশ্যে। গত ২০ বছর ধরে শহীদ লিটন মাতুব্বর রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় বসবাস করে টাইলস মিস্ত্রীর কাজ করে আসছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই সংগ্রাম করতে শিখেছিলেন। কঠোর পরিশ্রম আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা লিটনকে তৈরি করেছিল বাস্তবিক জীবন সংগ্রামের একটি মূর্ত প্রতীক।

শহীদ লিটনের অর্থনৈতিক অবস্থা

পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি ছিলেন লিটন। তার সেই আয়েই এত দিন চলছিল প্রতিবন্ধী বাবার চিকিৎসা। লিটনকে হারিয়ে এখন তার চিকিৎসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। বাবার অসুস্থতার কারণে লিটন মাতুব্বরের বিয়ে করাও হয়ে ওঠেনি। ৩৫ বছর বয়স হলেও একমাত্র বাবার চিকিৎসার কথা চিন্তা করে তিনি বিয়ে করেননি। অর্থের অভাব থাকলেও তার মনে ছিল না কোনো ক্লান্তি, বরং এক ধরনের শান্তি খুঁজে পেতেন পরিবারের হাসিমুখ দেখে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতা তার শান্ত জীবনের সবকিছুকে এক মুহূর্তে এলোমেলো করে দিল। একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে শহীদ হয়ে যান লিটন। তার মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। এখন তারা চিন্তিত, কীভাবে চলবেন এবং কীভাবে সংসারের খরচ চালাবেন ? লিটনের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদ মো: লিটন মাতুব্বর শৈশবকাল থেকেই ছিলেন সচেতন ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং সদালাপী মানুষ ছিলেন। ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলতেন। তিনি পিতামাতার বাধ্যগত সন্তান ছিলেন। সব সময় তিনি তার পিতাকে নিয়ে ভাবতেন, কীভাবে তার বাবাকে সুস্থ করা যায়। তিনি তার ভাইবোনকেও অনেক স্নেহ করতেন।

লিটনের বাবা তৈয়ব আলী কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'মোরে এখন কে ওষুধ কিনে দেবে? মোরে না কইয়া মোর পোলাড়া এই রকম মরবে, তা কোনো সময়ই ভাবি নাই।'তাছাড়া লিটনের বড় ভাই মো: বশির মাতুব্বর বলেন, 'কিছুতেই আমি আমার ভাইকে ভুলতে পারছি না। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিকে হারিয়ে আমি এখন অকূল সাগরে এবং চারদিকে অন্ধকার দেখছি।'

তিনি আরও জানান, পরদিন পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করলে বাড়ি নিয়ে এসে পারিবারিক কবরস্থানে লিটনকে দাফন করা হয়।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

মূলত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিলো জুলাই, ২০২৪ জুড়ে। ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের ন্যায্য দাবি না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টিমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়া হচ্ছিল ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে। ছাত্রদের ঘোষণা অনুসারে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি শুরু হয়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৮ জুলাই শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিলে হানাদার আওয়ামী পুলিশ বাহিনী হামলা করে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এদিন আন্দোলনের মূল হাল ধরে। সেদিন মুগ্ধসহ মোট ৪০ জন শহীদ হন। এদিন সংঘর্ষ বেশি হয় রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশের পাশাপাশি সারাদেশে বিজিবি মোতায়েন করে স্বৈরাচার সরকার। একপর্যায়ে দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলছিল। এ সময় লিটন কাজের উদ্দেশ্যে বাড্ডা এলাকায় সড়ক পার হয়ে একটি বাসায় যাচ্ছিলেন। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হওয়ার পর লিটনকে ঢাকার কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরে পুলিশ তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার এমন মৃত্যুতে তার পরিবার বাকরুদ্ধ। তাইতো কবির ভাষায়,

'দুঃখরা কেন এভাবে মিছিল করে আসে
খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনের স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে?
দুঃখরা কেন বারবার ওদেরকেই ভালোবাসে
ওদের হাসি-কান্নায় ভরপুর জীবনকে স্তব্ধতায় ঢেকে দিয়ে?'

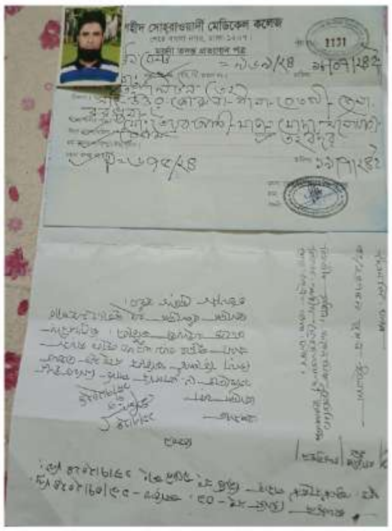

এক নজরে

নাম	: মো: লিটন
জন্ম তারিখ	: ১০-১২-১৯৮৮
জন্মস্থান	: সোনার বাংলা, বেতাগী, বরগুনা
পেশা	: টাইলস্ মিস্ত্রি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সোনার বাংলা, থানা: বেতাগী, জেলা: বরগুনা
পিতা	: মো: তৈয়াব আলী
মাতা	: মোসা: মনোয়ারা বেগম
আঘাতকারীর	: আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৮-০৭-২০২৪, বাড্ডা, ঢাকা
মৃত্যুর তারিখ ও স্থান	: ১৮-০৭-২০২৪, কুর্মিটোলা হাসপাতাল, ঢাকা
কবরস্থান	: নিজ গ্রাম

প্রস্তাবনা

১. বাবার চিকিৎসার খরচ বহন করলে উপকার হবে

২. মানসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

৩. মাসিক বা এককালিন সহযোগিতা করা দরকার

শহীদ মো: মিজানুর রহমান

ক্রমিক : ৩৪১
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০২৯

"কাজে না গেলে না খেয়ে থাকতে হতো পরিবারের; সেই কাজে গিয়েই ফিরলেন লাশ হয়ে"

পরিচিতি

মো: মিজানুর রহমান ছিলেন এক সংগ্রামী জীবনযোদ্ধা, যার প্রত্যেকটি দিন ছিল কঠিন সংগ্রামের। তিনি বরগুনার ছোট্ট গ্রাম কালিরতবকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে। পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের টানে তিনি ঠেলাগাড়ি চালিয়ে দিনমজুরের কাজ করতেন। তার পিতা, মো: জাকির হোসেন দুলাল, একজন ড্রাইভার হলেও বয়সের ভারে কাজ কমিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে মিজানুরই হয়ে উঠেছিলেন পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস।

তার পরিবারের সদস্যরা ছিলেন স্ত্রী জাকিয়া আক্তার শিরিন এবং দুই সন্তান, সামিয়া (৮) ও সাজিদুল (৪)। সন্তানদের মুখে আহার জোগাতে ও সংসারের চাকা সচল রাখতে নিরন্তর পরিশ্রম করেছেন মিজানুর। নিজের স্বপ্নগুলোর পাশে রেখে পরিবারের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। যদিও জীবন তাকে কঠিন বাস্তবতার সামনে দাঁড় করিয়েছে, তবুও মিজানুর কখনো ভেঙে পড়েননি, বরং সবসময় চেষ্টা করেছেন পরিবারকে ভালো রাখতে।

২০২৪ সালের ২০ জুলাই, ঢাকার মানিক নগর বিশ্বরোডে বিকাল ৪ টায় এক নির্মম পুলিশি আক্রমণের শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন মিজানুর। পরিবারের ভাষ্যমতে তিনি কোন রাজনীতি করতেন না। কিন্তু সেদিনের উত্তপ্ত ও উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে পিঠে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। সেদিন মুগদা মেডিকেল কলেজে বিকাল ৫টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবারের স্বপ্ন ও আশা তার মৃত্যুতে থেমে যায়। তার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ তাকে শহীদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

তার জন্মভূমি কালিরতবক, বরগুনার সদর থানায় তাকে সমাহিত করা হয়। যে মাটি তার শৈশবকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই মাটিতেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হন। মিজানুরের এই আত্মত্যাগ তার পরিবারের কাছে যেমন বেদনার, তেমনি আমাদের কাছে প্রেরণার।

শহীদ মো: মিজানুর রহমান আমাদের মনে এক অবিচল ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের প্রতীক হয়ে থাকবেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, একজন মানুষের নৈতিকতা, মানবিকতা, এবং পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা কখনো ম্লান হয় না। তার মতো মানুষের স্মৃতি আমাদের মননে সদা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, এবং তার জীবনের সংগ্রাম আমাদের কর্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

২০ জুলাই, ২০২৪ কোটা সংস্কার ঘিরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আন্দোলন ঘিরে অগ্নিগর্ভ দেশ। দেশজুড়ে কারফিউ জারি ও সেনা

মোতায়েন করে শেষ রক্ষার চেষ্টা ক্ষমতালোভী সরকারের। পরিস্থিতি সামাল দিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে খুনী হাসিনা। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে স্বৈরাচার হাসিনার লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডাবাহিনী, পেটুয়া পুলিশ বাহিনী উপর্যুপরি হামলায় সংঘর্ষ নানা বাঁধে। শিক্ষার্থীদের সাথে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলতে থাকে। নিরস্ত্র আনদোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় হিংস্র পুলিশ।

এ দিন সকাল ৮টার দিকে প্রতিদিনের মতো মিজানুর তার স্ত্রী, সন্তান ও বাবাকে বাসায় রেখে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কাজ শেষে বিকেলের দিকে বাসায় ফেরার পথে ঢাকার মানিকনগর বিশ্বরোড এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। নিষ্ঠুর পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে তার একটি আঘাত হানে মিজানের পিঠে। এ সময় সঙ্গে থাকা কয়েকজন মিলে তাকে ঢাকা মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘরে বাজার নেই, ঠেলাগাড়ি নিয়ে কাজে বেরিয়ে গুলিতে নিহত মিজানুর

জেলা প্রতিনিধি, বরগুনা
০৩ আগস্ট ২০২৪, ০৭:২৪ এএম

সেখানেই বিকেল ৫টায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি। ডাক্তার তাকে কোনো চিকিৎসা দেয়নি বলে জানান তার স্ত্রী। পরে ওই দিন রাতেই মিজানুরের মরদেহ বরগুনার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসেন স্বজনরা। পরদিন সকালে তার গ্রামের বাড়ি নিজ গ্রাম, কালিরতবক, সদর থানা, বরগুনায় তাকে দাফন করা হয়।

মিজানুরের মৃত্যুর খবর শোনার পর তার স্ত্রী ও সন্তানদের জীবন যেন এক অনিশ্চয়তার আঁধারে নিমজ্জিত হয়। স্ত্রী জাকিয়া আক্তার শিরিন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, "আমার দুই অবুঝ ছেলেমেয়ে, তাদের জন্য আমি কী করব?" তার কথায় ফুটে ওঠে এক মায়ের হৃদয়বিদারক অবস্থা। শহীদ মিজানুর রহমান যে একাধারে একজন ভালো মানুষ এবং মানবতার সেবক ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার পরিবারের অবস্থান কতটা শোচনীয় তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

স্বজন ও বন্ধুদের বক্তব্য

শহীদের বাবা জাকির হোসেন দুলাল বলেন,আমার ছেলে কোন রাজনীতি করতো না। ছেলের স্মৃতি মনে পড়লে কিছুই ভালো লাগে না। বড় সন্তান ছিলো। বড় হলেও পিতা-মাতার কাছে সন্তান কখনো বড় হয় না। ঢাকায় বাবা-ছেলে একসাথে কাজ করতাম। ওর বাসাতেই খেতাম। আল্লাহর কাছে কই, আর কোন পিতা- ,মাতার বুক যেন খালি হয় না।

শহীদের চাচা- মো. নজিম শেখ বলেন, মো. মিজানুর রহমান, খুব ভালো ছেলে। সে খুব গরিব পরিবারের থেকে বেড়ে উঠেছে। পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে ঢাকায় গিয়ে ঠেলা চালিয়ে পরিবার চালাতো। তিনি খুব শান্ত, শিষ্ট ও নম্র ভদ্র ছিলো।

আমার স্বামীকে ডাক্তার চিকিৎসা করে নাই, যখন হাসপালে নেওয়া হয়েছে তখন জীবিতো ছিলো। ডাক্তার চিকিৎসা করলে আমার স্বামী মারা যেতোনা। আমার ছেলে মেয়ে এতিম হতো না, এখন আমি কোথায় যাবো কি করবো? এই ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে নিয়া। বিলাপ করতে করতে কথা গুলো বলেন তার সহধর্মীনি।

একমাত্র ছেলে বলে, আম্মু, আমার আব্বুকে কিনে নিয়ে আসো। আমি আব্বুকে ছাড়া থাকতে পারবো না।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মিজানুর রহমানের মৃত্যুর পর তার পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। জীবনের প্রতিটি দিনই সংগ্রামের ছিল মিজানের জন্য। তিনি ঠেলাগাড়ি চালিয়ে উপার্জন করে এবং তার পরিবারের দেখভাল করতেন। বর্তমানে মিজানের সন্তানরা ও স্ত্রী সহায়হীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তার পিতা মোঃ জাকির হোসেন দুলাল, যিনি বয়সের ভারে আগেই কাজ কমিয়ে দিয়েছিলেন। এখন পরিবারের প্রধান অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মিজানের স্ত্রী, জাকিয়া আক্তার শিরিন, স্বামীর অনুপস্থিতিতে ছোট দুই সন্তান নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। স্বামীর মৃত্যুতে ছোট সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি। এখন জাকিয়া আক্তারের কোনো উপার্জনের উৎস নেই, এমনকি তাদের মাথা গোঁজার জন্য একটি

নির্দিষ্ট জায়গাও নেই। শ্বশুরের সাথে গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করলেও তা দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

প্রস্তাবনা

শহীদ মিজানুর রহমানের মৃত্যুর পর তার ৩ সদস্যের পরিবারটি কঠিন সংকটে পড়েছে। তাদের জীবন এখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। এজন্য কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো:

প্রস্তাবনা-১: এই পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তা এখন অত্যন্ত জরুরি। তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা-খাবার, পোশাক এবং চিকিৎসার খরচ মেটাতে সমস্যায় পড়ছে।

প্রস্তাবনা-২: মিজানুরের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে তাদের পড়াশোনা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা খুব গুরুত্বপুর্ণ। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তাদের নিরাপদ ভবিষ্যত গড়ার উপায় দরকার।

প্রস্তাবনা-৩: শহীদ মিজানের স্ত্রী জাকিয়া আক্তার শিরিনকে পুনর্বাসিত করার জন্য মানসিক ও আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে তিনি তার সন্তানদের নিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবেন।

প্রস্তাবনা-৪: মিজানুরের পিতাকে একটি কর্মসংস্থান করা জরুরি। কেননা, তিনিও স্বচ্ছল নন। সুতরাং একইসাথে নিজেরও মিজানের পরিবারকে দেখাশোনা করতে পারবেন।

চিরদিনের জন্য হারানো প্রিয় স্বজনকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয় কিন্তু তাদের দুঃখ-কষ্ট কমাতে আমারা সকলে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র
মোঃ মিজানুর রহমান
Date of Birth 01 Feb 1990
823 605 8700
I<BGD823605870<09<<<<<<<<<<<<<<
9002018M3211175BGD<<<<<<<<<<<<6
RAHMAN<<MD<MIZANUR<<<<<<<<<<<<<

একনজরে শহীদের সম্পর্কিত তথ্য

শহীদের পূর্ণ নাম	: মো: মিজানুর রহমান
জন্ম তারিখ	: ০১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০, জন্মস্থান: বরগুনা
পেশা	: দিনমজুর (ঠেলাগাড়ী চালক)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কালিরতবক, ইউনিয়ন: ৮ নং বরগুনা, থানা: সদর, জেলা: বরগুনা
পিতার নাম	: মো: জাকির হোসেন দুলাল
পিতার পেশা ও বয়স	: ড্রাইভার, বয়স ৫৪
মা	: মোছা: শাহিনুর রহমান
মায়ের পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, বয়স ৪৫
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
স্ত্রী	: জাকিয়া আক্তার শিরিন
১. মেয়ে	: সানিয়া আক্তার, বয়স: ৮ বছর, শ্রেণি: ৩য়, কালিরতবক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
২. ছেলে	: সাজিদুল ইসলাম, বয়স: ৪ বছর
ঘটনার স্থান	: মানিক নগর বিশ্বরোড, ঢাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৪টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৫টা
মৃত্যুর স্থান	: মুগদা মেডিকেল কলেজ
শহীদের কবরের অবস্থান	: নিজ গ্রাম, কালিরতবক, সদর থানা, বরগুনায়

'অভাবী পরিবারের সুন্দর দিন ফেরানোর স্বপ্ন দেখতেন'

শহীদ মোঃ রাসেল মাহমুদ

ক্রমিক : ৩৪২

আইডি : ঢাকা সিটি ০৩০

পরিচিতি

শহীদ মোঃ রাসেল মাহমুদ (২২), ৮ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে পটুয়াখালী জেলার, গলাচিপা উপজেলার, চরকাজল ইউনিয়নের, ছোট শিবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে তার পরিচিতি ছিল। দরিদ্র পরিবারের সন্তান রাসেল ছোটবেলা থেকেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। পরিবারের সুন্দর দিন ফেরানোর স্বপ্ন দেখতেন। তার পিতা আবুল হাওলাদার, একজন কৃষক এবং মাতা রাশেদা বেগম গৃহিণী। তারা শহীদের আদর্শ অভিভাবক।

রাসেলের শিক্ষাজীবন শুরু হয় '১৮৪ নং শিবারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে'; যেখানে তিনি ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি অর্জনসহ, জিপিএ ৫ পেয়ে সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে 'আব্দুস সালাম আকন আইডিয়াল স্কুল' থেকে এসএসসি এবং ঢাকার শ্যামপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয় থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হন।

মেধা এবং মননশীলতার অধিকারী রাসেল ২০২৪ সালের কোটাবিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকেই ছিলেন সক্রিয়। ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে যাত্রাবাড়ী থানার সামনে পুলিশের অতর্কিত হামলায় তিনি কপালে গুলিবিদ্ধ হন। মৃত্যুর পরে ৬ আগস্ট ঢাকা মেডিকেলে তার লাশ সনাক্ত হয়।

রাসেলের মৃত্যুতে পটুয়াখালীতে এক শোকের ছায়া নেমে এসেছিলো। তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয় ছোট চর শিবার ঈদগাহ মাঠে ও তৎসংলগ্ন কবর স্থানেই তাকে সমাহিত করা হয়। শহীদ রাসেল মাহমুদ তার স্বপ্নের পথে অগ্রসর হতে পারেননি; কিন্তু তার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ আমাদের স্মরণে থাকবে চিরকাল। তিনি দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শহীদ মো: রাসেল মাহমুদ ছিলেন মানবতার এক বিরল উদাহরণ, যিনি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের দিনটি, যা হতে পারতো একটি নতুন সূর্যোদয়ের সাক্ষী, সে দিনেই তার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। সেদিন শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর পুরো দেশজুড়ে সাধারণ মানুষ বিজয়ের আনন্দে মেতে ওঠে। তাদের চিৎকারে মুখর হয়ে ওঠে ঢাকার রাস্তা, যেন নতুন সম্ভাবনার এক দুয়ার খুলে গিয়েছে সবার জন্য। কিন্তু এই বিজয়ের স্বাদ শহীদ রাসেল মাহমুদ এবং তার মতো অনেকের জন্য রক্তাক্ত অধ্যায়ে পরিণত হলো।

সেই বিকালটা ছিল সাধারণ একটি বিকালের চেয়ে অনেক বেশি। দেশের মানুষের জন্য এক বিপ্লবী মুহূর্ত। বিকেল ৩ টার দিকে রাসেল মাহমুদ হাজারো মানুষের সাথে যাত্রাবাড়ীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। যাত্রাবাড়ী তখন পরিণত হয়েছে প্রতিবাদের এক প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে। সমবেত মানুষেরা তখন যাত্রাবাড়ী থানার সামনে জড়ো হয়ে নিজেদের অধিকার এবং অবিচারের প্রতিকার দাবি করছিল। হঠাৎ করেই পুলিশের একটি বড় দল ফিল্মি কায়দায় থানার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে অতর্কিত গুলি চালাতে শুরু করে। নিরীহ, প্রতিবাদী মানুষদের উপর ঝরে পড়ে বুলেটের বৃষ্টি। রাসেল মাহমুদ ছিলেন সেই মুহূর্তে এক মিছিলের অগ্রভাগে। তার মাথায় পুলিশের ছোঁড়া একটি গুলি আঘাত হানে, মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি।

যখন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেওয়া হলো, তখন সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মাথায় গুলির যে আঘাত ছিল, তা ছিল এতটাই গুরুতর যে তার বেঁচে থাকার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না। অথচ, সেই দিনটি তার জন্য বিজয়ের মুহূর্ত হওয়ার কথা ছিল। তার স্বপ্ন ছিল একটি নতুন বাংলাদেশের, যেখানে স্বৈরাচারের কোনো স্থান নেই, যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে, কথা বলতে পারবে, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

যাত্রাবাড়ী ছিল সেদিন ঢাকার অন্যতম উত্তপ্ত প্রতিবাদকেন্দ্র। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ঢাকার এ এলাকাটি পরিণত হয়েছিল শত সহস্র প্রতিবাদীর সম্মিলনের স্থানে। সেদিন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ এবং শিক্ষার্থী যাত্রাবাড়ী থানার সামনে ঘেরাও করে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই পুলিশের বর্বর হামলায় আহত হন, কেউ কেউ নিহতও হন। পুলিশ কোনো রকম পূর্বসতর্কতা ছাড়াই নির্বিচারে গুলি চালাতে শুরু করে, যেন মানুষের জীবন তাদের কাছে কোনো অর্থবহ বিষয় নয়। প্রাণহানি এবং আহতদের সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত, যেন জীবন শুধুই একটি সংখ্যা।

অধিকাংশ হতাহতকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য হাসপাতালে। সেদিনের গুলিবর্ষণে তিন শতাধিক মানুষ আহত হন এবং তাদের মধ্যে বহু মানুষ নিহত হন। নিহতের লাশগুলি যখন হাসপাতালগুলোতে পৌঁছাতে থাকে; তখন সেখানকার পরিবেশ শোকের আবহে ছেয়ে যায়।

শহীদ মো: রাসেল মাহমুদ ছিলেন সেই প্রতিবাদের এক অগ্নিসাক্ষী, যিনি শুধু নিজের জন্য নয়, পুরো জাতির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তিনি জানতেন যে, তার এই ত্যাগ একদিন ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হবে।

অথচ, যিনি দেশের মানুষের জন্য স্বপ্ন দেখতেন, নিজের জীবনকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি সেদিন তার বিজয়ের মুহূর্তটি উপভোগ করার সুযোগই পেলেন না। তার রক্তে রঞ্জিত হলো মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া জনতার আন্দোলন। এই নির্মমতার পরেও স্বৈরাচারী শাসনের পতনের সেই বিকেলটি শুধু রাসেল মাহমুদের জন্য নয়; অসংখ্য অন্যায়-নিহতদের জন্য এক শোকাবহ দিন হয়ে থাকবেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদের চাচা আবু সালেহ বলেন, রাসেল ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে যাত্রাবাড়ীতে মারা যান। সে খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। আশা করি বাংলার মানুষ শহীদদের চিরদিন স্মরণ করবে। সরকারের কাছে আমার দাবি আমার ভাতিজাসহ সকল শহীদের হত্যার বিচার যেন দ্রুততম সময়ে সরকার করেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ রাসেল মাহমুদের বাবা, আবুল হাওলাদার (৬৩), একজন দরিদ্র কৃষক, যিনি কষ্টার্জিত আয় দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ করেন। তার বড় ছেলে মিরাজ (২৮) বিয়ে করে আলাদা হয়ে গিয়েছে। সেও কৃষিকাজের মাধ্যমে সে তার নিজস্ব পরিবার চালায়। ছোট ছেলে শাওন (১৬) এখন ৯ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। আবুল হাওলাদার তার স্বল্প আয়ে শাওনের পড়াশোনা ও পরিবারের খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে দিন দিন এটি তাদের জন্য আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিবারটি নিজের কোনো জমি না থাকায় অন্যের জায়গায় ঘর তুলে বসবাস করছে, যা তাদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার দুর্বলতাকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।

প্রস্তাবনা: পরিবারটির সহযোগিতা প্রয়োজন

এই পরিবারের বর্তমান অবস্থান অত্যন্ত নাজুক। তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন অনেক কষ্টে চলে, আর ভবিষ্যতের কোনো নিশ্চয়তাও নেই। এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানো খুবই জরুরি, যাতে তারা কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে এবং শাওন তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।তাদের বিভিন্ন কারণে সহযোগিতা প্রয়োজন যা উল্লেখ করা হলো-

প্রস্তাবনা-১: মায়ের চিকিৎসা সহায়তা

শহীদের মা নানা অসুস্থতায় জর্জরিত। তার নিয়মিত চিকিৎসার জন্য অর্থের প্রয়োজন। চিকিৎসা নিশ্চিত করা হলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন এবং পরিবারের সঙ্গে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন।

প্রস্তাবনা-২: বাবার সাহায্য

শহীদ রাসেলের বাবা একজন বৃদ্ধ কৃষক। তার জন্য আর্থিক সহযোগিতা জরুরি। একটি মুদি ব্যবসার মত ব্যবসা ধরিয়ে দিলে পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরবে আশা করা যায়।

প্রস্তাবনা-৩: ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ

ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার জন্য অর্থ সহায়তা প্রয়োজন, যাতে সে তার শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে পারে; পরিবারটির অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সহায়ক হবে।

এই সহযোগিতাগুলি নিশ্চিত করা হলে পরিবারের সদস্যরা একটি স্থিতিশীল জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে এবং তাদের উন্নতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

শহীদের পূর্ণ নাম:	মো: রাসেল মাহমুদ
জন্ম তারিখ:	০৮ জানুয়ারি, ১৯৯৯
জন্মস্থান:	পটুয়াখালী
পেশা/পদবী:	ছাত্র
নিজ জেলা:	পটুয়াখালী
পেশাগত পরিচয়:	ছাত্র
রক্তের গ্রুপ:	ও(+)
ঠিকানা:	গ্রাম: ছোট শিবা
ইউনিয়ন:	চরকাজল
থানা:	গলাচিপা
জেলা:	পটুয়াখালী

পরিবার সংক্রান্ত তথ্য:

পিতার নাম:	আবুল হাওলাদার
পিতার পেশা ও বয়স:	কৃষক, ৬৩ বছর
মায়ের নাম:	রাশেদা বেগম
মায়ের পেশা ও বয়স:	গৃহিণী, ৫০ বছর
মাসিক আয়:	৫,০০০ টাকা
আয়ের উৎস:	কৃষি কাজ

ভাই-বোনদের তথ্য:

১. মো: মিরাজ মাহমুদ (বড় ভাই), বয়স ২৮

পেশা:	কৃষক, বিবাহিত

২. মো: শাওন (ছোট ভাই), বয়স ১৬, শ্রেণি: ৯ম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:	আব্দুস সালাম আকন আইডিয়াল স্কুল
ঘটনার স্থান:	যাত্রাবাড়ী
আক্রমণকারী:	পুলিশ
আহত হওয়ার সময়:	বিকাল ৩ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়:	৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৩টা
মৃত্যুর স্থান:	যাত্রাবাড়ী থানার সামনে
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান:	নিজ গ্রাম ছোট চর শিবা
জিপিএস লোকেশন:	22°06'14.4"N 90°32'04.5"E

শহীদ মো: আমিনুল ইসলাম আমিন

ক্রমিক : ৩৪৩

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: আমিনুল ইসলাম আমিন পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার কেশবপুর ইউনিয়নের ভরী পাশা গ্রামে ২ আগস্ট ২০০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের পিতা জনাব মোঃ ওবায়দুল ইসলাম (৫২) পেশায় একজন রিকশা চালক এবং তার মা সেলিনা বেগম (৪৫) একজন গৃহিণী। দরিদ্র পরিবারের একমাত্র ছেলে আমিন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে পরিবারের দারিদ্রের কবলে পড়ে তার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে ঢাকার একটা বৈদ্যুতিক সুইচ তৈরীর কারখানায় কাজ নেন। পিতা-মাতা এবং তার একমাত্র ছেলে আমিনকে নিয়ে ঢাকার কদমতলী এলাকার দক্ষিণ দনিয়ায় একটি টিনশেডের বাসায় ভাড়া থাকতেন। তার অসুস্থ দাদী গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। শহীদ আমিন এবং তার রিকশাচালক বাবার যে সামান্য আয় হতো তা দিয়েই তার দাদি এবং পরিবারের ভরণপোষণ করতেন। আমিন ফুটবলার হতে চেয়েছিল। কারখানায় কাজ করার পর যে সময় পেত, স্থানীয় ক্যান্টেন মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলত। তিন-চার মাস আগে এলাকায় ফুটবল খেলে একটি ক্রেস্ট পেয়েছিল। মাকে বলেছিল, এটি তার জীবনের প্রথম পুরস্কার।

গুলিবিদ্ধ কিশোরকে দেখে রিকশাচালক, 'এতো আমার ছেলে!

শহীদের পিতা ওবায়দুল ইসলাম জীবিকার তাকিদে ঢাকা শহরে অটোরিকশা চালিয়ে তার সংসার পরিচালনা করতেন। একা আয় করে তার সংসার চালানো দিন দিন কষ্টকর হয়ে পড়ে। শহীদ আমিনের অসুস্থ দাদির চিকিৎসা সেবা দেওয়া এবং সন্তান আমিনের পড়ালেখার খরচসহ সংসার চালানো একার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। ২০২০ সালের করোনাকালীন সময়ে সংসার চালানো আরো কঠিন হয়ে পড়ে। তার একমাত্র সন্তান আমিনের পড়ালেখার স্বপ্ন ভেংগে যায়। পরিবারের হাল ধরতে শহীদ আমিনকেও ঢাকায় পাড়ি জমাতে হয়। শহীদ আমিন পিতামাতার সাথে ঢাকার কদমতলী এলাকার দক্ষিণ দনিয়ায় একটা টিনশেডের বাসায় ভাড়া থাকতেন। খুব ভোরে উঠেই জীবিকার তাগিদে পিতা অটোরিকশা নিয়ে এবং ছেলে কারখানায় চলে যেতেন। ২০১৮ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ছাত্র অধিকার পরিষদ গঠিত হয়। ছাত্রদের ন্যায্য আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার কোটা পদ্ধতি বাতিল করে পরিপত্র জারি করে। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে হাইকোর্ট কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল রেখে রায় দিলে ছাত্ররা তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। স্বৈরাচারী সরকার প্রতিটি ন্যায্য দাবির আন্দোলন কে দমন করার জন্য তার স্বৈরাচারী পুলিশ বাহিনী এবং তার দোসরদের ব্যবহার করতেন। সরকার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তার নিজের মতো করে পরিচালনা করতেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকেও স্বৈরাচারী সরকার একই কায়দায় দমন করতে চেয়েছিলেন। ১৫ জুলাই পরবর্তী ছাত্রদের উপর স্বৈরাচারী সরকারের ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ একযোগে ঢাকা শহর এবং বাহির থেকে গুণ্ডাবাহিনী ভাড়া করে দেশি-বিদেশি আগ্নেয় অস্ত্র হাতে নিয়ে ছাত্রদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। সেদিন গুণ্ডাবাহিনীর হাতে শতাধিক ছাত্র- ছাত্রী আহত হয়। ছাত্রীদের উপর যেভাবে আঘাত করা হয় যার দৃশ্য আজও চোখে ভেসে উঠলে শরীর শিউরে উঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে নারী শিশুদের উপর হাত তোলা আইন পরিপন্থী সেখানে একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিভাবে ন্যায্য আন্দোলনে নিরীহ নারীদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয় তা সারা বিশ্ববাসী দেখেছে। দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়া প্রতিটি মানুষ ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। ছাত্র আন্দোলন ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ। ২১ জুলাই বিকেল ৫ টার দিকে আমিন ঘুম থেকে উঠে দোকান থেকে রান্না করার জন্য চাল এনে দেয়। মায়ের কাছ থেকে ২০ টাকা নিয়ে বাসা থেকে বের হয়। সেই ২০ টাকা তার পকেটেই ছিলো। বাসার সামনে থাকা একটি দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলন দেখছিল আমিন। ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশ বাহিনী এবং যুবলীগ দেশীয় অস্ত্র হাতে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার উপর উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। এলোপাতাড়ি রাবার বুলেট, ছররা গুলি এবং সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। হঠাৎ একটি গুলি এসে আমিনের বুকের বাম দিক দিয়ে ঢুকে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আমিন বাসার দিকে ছুটে আসতে চাইলে কিছুটা দৌড়ে এসে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। তখন স্থানীয় দুই যুবক তাকে অনাবিল হাসপাতালে নিয়ে যান।

গুলিবিদ্ধ কিশোরকে দেখে রিকশাচালক, 'এ তো আমার ছেলে'

জীবিকার তাগিদে প্রতিদিনের মতো গত ২১ জুলাই ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা নিয়ে বের হন আমিনের পিতা ওবায়দুল ইসলাম। ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার অনাবিল হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ এক কিশোরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে অনুরোধ জানান দুই

পথচারী। তিনি রাজি হলেন। গুলিবিদ্ধ সেই কিশোরকে অটোরিকশায় তুলে হাসপাতালে গিয়ে কোলে করে নামাবার সময় মুখ দেখে চমকে ওঠেন ওবায়দুল। সেই কিশোরকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা চিৎকার করে ওবায়দুল বলেন, 'এ তো আমার কলিজার টুকরা ছেলে'। এ সময় তার আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতালের পুরো এলাকা। ভিড় করেন শত শত মানুষ। একমাত্র সন্তান আমিনুল ইসলাম আমিনকে (১৬) রিকশা থেকে কোলে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই আমিনের জীবন প্রদীপ নিভে গেছে। নিহতের দাদি শাহজাদী বেগম বলেন, 'আমার অনেক শখের নাতি, এই নাতি আমি কোথায় পাবো! আমি নাতির ছবি দেখতে পারি না, দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকেনা। রাতেই অ্যাম্বুলেন্সে করে আমিনের লাশ গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরদিন সকালে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে পরিবার ও নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

ঢাকার যাত্রাবাড়ী এলাকার অনাবিল হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ এক কিশোরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানান দুই পথচারী। আমি রাজি হলে তারা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অটোরিকশায় তুলে। হাসপাতালে গিয়ে কোলে করে নামাবার সময় মুখ দেখে চমকে ওঠি আমি। 'এ তো আমার কলিজার টুকরা ছেলে', ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বুকফাটা চিৎকার করি।

-শহীদের বাবা, মো: ওবাইদুল ইসলাম শহীদ আমিন তার বাবা মায়ের সাথে ঢাকায় থাকতেন। দুই ঈদে গ্রামের বাড়িতে আসতেন। সকল আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিশতেন। তার আচরণ অত্যন্ত ভালো ছিল। সবাই তার আচরণে খুশি ছিলেন।

-শহীদের চাচা মো: মুজিবর রহমান (৪০)

সহোযোগিতার সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: বাসস্থান প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২: বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: মো: আমিনুল ইসলাম আমিন
পেশা	: কারখানা শ্রমিক
পিতা	: মো: ওবাইদুল ইসলাম, পেশা: অটোরিকশা চালক
মাতা	: সেলিনা বেগম, পেশা: গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভরী পাশা, ইউনিয়ন: কেশবপুর থানা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: দক্ষিণ দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান : ২১ জুলাই ২০২৪, ধনিয়া, যাত্রাবাড়ী

শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান: ২১ জুলাই, ২০২৪, ধনিয়া, যাত্রাবাড়ী পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন

শহীদ মো: দুলাল সরদার

ক্রমিক : ৩৪৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩২

শহীদ পরিচিতি

পটুয়াখালী জেলার সদর উপজেলাধীন হকতুল্লা গ্রামে ০১ জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে হতদরিদ্র পরিবারে শহীদ মো: দুলাল সরদার (৪৮) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রামে ছোটবেলা থেকেই অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি গাড়ি চালিয়ে যে আয় উপার্জন করতেন তা দিয়ে অসুস্থ বাবা-মা সহ ছেলে সন্তান এবং স্ত্রী পরিজনদের জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার স্ত্রী তাসলিমা আক্তার দীর্ঘদিন ধরে হার্টের রোগে আক্রান্ত। তার পিতা বয়োবৃদ্ধ জনাব সুলতান সরদার (৭০) অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। তার মা বয়োবৃদ্ধা হালিমা বেগম(৬৫) অসুস্থ অবস্থায় দিন পার করছেন। বড় ছেলে সাইদুল রহমান সোহান (২৬) তিতুমীর কলেজে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত। দ্বিতীয় ছেলে সজীব সরদার (২১) এ কে এম রহমাতুল্লাহ কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র। তৃতীয় ছেলে রাজিব সরদার (১৬) পড়ালেখা করেননি। আবদুল্লাহ বিন দুলাল (০৪) নামে তার একটি কনিষ্ঠ শিশু সন্তানও রয়েছে। পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানসহ মোট আট সদস্য নিয়ে তার পরিবার এবং তিনিই পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। পরিবারের সবাই গ্রামে বসবাস করেন। জীবিকার তাগিদে তিনি ঢাকার নেকল বাডডা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। পেশায় দুলাল সরদার একজন গাড়ি চালক ছিলেন। মাসুম রেন্ট এ কার এর গাড়ি চালাতেন দুলাল সরদার।

যেভাবে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন দুলাল সরদার

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে অনেকেই স্বৈরাচারী সরকার বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শুধু ছাত্রদেরকেই জীবন দিতে হয়নি বরং জীবন দিতে হয়েছে ভ্যানচালক, রিকশা চালক, ড্রাইভার, দিনমজুর এবং বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবী মানুষের। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বহাল রাখায় মেধাবী ছাত্ররা তাদের যোগ্য স্থান থেকে বঞ্চিত হয়। অযৌক্তিক কোটার বিরুদ্ধে ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের বীজ বপন হয়েছিল ২০১৮ সালে কোটাবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে। একই সালে কোটা পদ্ধতির বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে অনেককেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়। স্বৈরাচারী সরকার তখন চাপের মুখে পড়ে তাদের দাবি মেনে নেয়। ২০২৪ সালে এসে স্বৈরাচারী সরকার আবারো কোটাপ্রথা বহাল রেখে ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। যৌক্তিক দাবিতে গড়ে তোলা এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে ১৬ জুলাই ওবায়দুল কাদের এর কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তার গুণ্ডাবাহিনী ছাত্রলীগ এবং যুবলীগকে উস্কে দেয়। ১৭ জুলাই ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভাড়া করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং টোকাই লীগের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপরে নির্যাতন চালানো হয় । ১৮ জুলাই শান্তিপূর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে পড়ে। সেদিন আন্দোলনে যাদের ভূমিকা না বললেই নয় তারা ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ। সেদিন তারা শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন। কিন্তু সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী ছিলেন তৎপর। দেশী-বিদেশী অস্ত্র হাতে নিয়ে পুলিশের সাথে হেলমেট পড়ে সন্ত্রাসী যুবলীগ বাহিনী রাস্তায় নেমে পড়ে

সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপরে হামলায় তীব্র আক্রোশ নিয়ে। তীব্র হামলার নিন্দার প্রতিবাদ নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারেননি অভিভাবকবৃন্দ। তারাও তাদের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ায়। ক্রমে আপামর সাধারণ জনগনও শিক্ষার্থীদের পাশে অভিভাবক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ এবং সন্ত্রাসী যুবলীগের অস্ত্রের হাত থেকে রেহাই পায়নি সাধারণ জনগন। গাড়ি চালক থেকে শুরু করে সবজি বিক্রেতা এবং দিনমজুরও রেহাই পায়নি তাদের হাত থেকে। তাদেরই একজন গাড়িচালক ছিলেন শহীদ জনাব মো: দুলাল সরদার। তিনি মাসুম রেন্ট এ কারে গাড়ি চালাতেন। গাড়ি পার্কিং করে রাস্তা ক্রস করার পর তিনি দেখতে পান ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের গোলাগুলি চলছে। তিনি ছাত্রদের পাশে গিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন। পুলিশ এবং আওয়ামী সন্ত্রাসী যুবলীগরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে। হঠাৎ একটি গুলি এসে তার বুক ঝাঁঝরা করে দেয়। তিনি দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। দুলাল সরদারের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁকা সড়ক। আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ছাত্ররা দ্রুত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিকটস্থ ফরাজী মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যান। অবশ্য ততক্ষণে তিনি দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে শাহাদাতের সুধা পান করেন। শহীদের লম্বা তালিকায় যুক্ত করে নেন নিজেকেও। বেলা তখন ১১ টা। গ্রামে থাকা স্ত্রী তাসলিমা আক্তারের মুঠোফোনে হঠাৎ রিং বেজে ওঠে স্বামী দুলাল সরদারের নাম্বার থেকে। স্ত্রী তাসলিমা চমকে ওঠে তড়িঘড়ি করে ফোনটি রিসিভ করেন। একজন অপরিচিত কণ্ঠস্বর তাকে জিজ্ঞেস করে এই ফোনটি কার। তখন তার স্ত্রী বলেন, ফোনটি তার স্বামী দুলাল সরদারের এবং তার কাছ থেকেই তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শোনেন। সাথে সাথে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে তার পরিবার।

শহীদের ব্যাপারে নিকটাত্মীয়/প্রতিবেশীর অনুভূতি

শহীদ দুলাল সরদারের প্রতিবেশী (চাচাত ভাই) মো: জসিম উদ্দিন (৩২) বলেন, দুলাল ভাই ব্যবহারে খুবই অমায়িক এবং ভালো মানুষ ছিলেন। তার সাথে কারো শত্রুতা ছিলোনা। তিনি সবার সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি কোন রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতেন, তার মতো ভালো মানুষ দ্বিতীয়জন আমাদের এলাকায় হবেনা।

সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: তার বড় ছেলের স্নাতক সম্পন্ন হয়েছে, তার চাকুরী প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২: তার মেঝো ছেলের পড়াশুনার খরচ বহন করা দরকার।

প্রস্তাবনা-৩: তার স্ত্রী ও মায়ের চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা দরকার।

এক নজরে শহীদ দুলাল সরদার

নাম	: মো: দুলাল সরদার, পেশা: গাড়িচালক
জন্ম	: ০১ জানুয়ারি ১৯৭৬
পিতা	: মো: সুলতান সরদার (বয়োবৃদ্ধ)
মাতা	: হালিমা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হকতুল্লা, ইউনিয়ন: বদরপুর থানা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৮ জুলাই, ২০২৪, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৮ জুলাই, ২০২৪ ফরাজী মেডিকেল হাসপাতাল বনশ্রী, ঢাকা

শহীদ মোঃ বাচ্চু

ক্রমিক : ৩৪৫

আইডি: বরিশাল বিভাগ ০৩৩

পরিচিতি

মোঃ বাচ্চু সালে ৩ জুলাই ১৯৭৭ সালে পটুয়াখালী সদরের পশ্চিম শরিকখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল মজিদ হাওলাদার এবং মাতা মোসাম্মৎ মানিক বড়ু। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন এবং ১৭ বছর বয়সে উপার্জন তাগিদে ঢাকায় পাড়ি জমান। পিতা মাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে ঢাকা মিরপুর-১ এ বাসা ভাড়া করে থাকতেন। মিম ফ্যাশন টেইলার্স, মোহাম্মদপুর লালমাটিয়া ঢাকায়, কর্মরত ছিলেন তিনি। দুই মেয়েকে লেখাপড়া করাতে পারলেও ছেলেকে নিজের কাজের সহযোগিতার জন্য খুব বেশি লেখাপড়া করাতে পারেনি। গ্রামের এলাকায় চাষাবাদের কোন জমি নেই শুধু থাকার মতো একটি বাড়ি আছে তাও আবার দীর্ঘদিন পড়ে থাকার দরুন থাকার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান তার পরিবার ঢাকা ছেড়ে গ্রামের দিকে বসবাস করছেন।

শহীদ বাচ্চুর শাহাদাতের ঘটনা

দীর্ঘ শাসনে সবাইকে পেঁপিয়ে তুলেছিলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। তাঁর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও অর্থনীতির মন্দা পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। আর রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের বাইরে অন্য সব দল সরকারবিরোধী অবস্থানে চলে যায়। এর ফলে শেখ হাসিনা রাজনৈতিক দিক থেকেও একা হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনেও সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মৃত্যু এক অনিবার্য মহাসত্য। মৃত্যুর হাত থেকে কেউই মুক্তি পায়নি। মানুষের কীর্তিই মানুষকে চিরভাস্বর করে রাখে। মৃত্যুর পরেও হয়ে থাকে অমর। পৃথিবীর বুকে তাকে রাখে চিরস্মরণীয় বরণীয়। তেমনি কীর্তিগাথা আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গকারী এক শহীদ মো:বাচ্চু ।

৫ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ২ টার দিকে যখন মোঃ বাচ্চু খবর পাই যে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে তখন তার আনন্দ দেখে কে। স্ত্রীকে বললেন দ্রুত একটু খাবার দাও শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে বাইরে যেতে হবে আনন্দ করতে হবে। শহীদ বাচ্চু এবং তার ছেলে খুব তাড়াহুড়া করে খাওয়া দাওয়া করলেন। তারপর গোসল করে গণভবনের দিকে রওনা দিলেন। মিরপুর এক নম্বরে তাদের বাসা সেখান থেকে গণভবনে হেঁটে গেলেন যেহেতু সেদিন কোনো গাড়ি চলছিল না। বাচ্চু তার ছেলে এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে গণভবনে ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ধানমন্ডি লালমাটিয়া থেকে ফোন আসলো তার মালিকের কাছ থেকে যেখানে তিনি কাজ করতেন। ছেলেকে বলল আমার মালিক দোকান থেকে ফোন দিয়েছে আমি একটু দেখা করতে যাব তুমি বাড়িতে চলে যাও। ছেলে এবং বাবা আলাদা হয়ে গেল। একটু পর আদাবর থানার সামনে পুলিশ নিরস্ত্র মানুষের উপর অতর্কিত হামলা শুরু করে। গোলাগুলির বিশাল শব্দে রাস্তার মানুষ দিক বেদিক ছোটাছুটি করতে লাগলো। শহীদ বাচ্চু তার জীবন রক্ষা করার জন্য পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পুলিশের একটি বুলেট হঠাৎ তার পিঠে এসে বিদ্ধ হয়। কয়েকটা এগিয়েই বাচ্চু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রাস্তার মানুষজন তাকে ধরে মোহাম্মদপুর পপুলার হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিন তারা বলেন রোগীর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে বাচ্চু শাহাদাত বরণ করেন। শেখ হাসিনা পতনের আনন্দ করাই তার জীবনের শেষ আনন্দ হল এবং এই আনন্দই ডেকে আনলো শাহাদাতের মৃত্যু। হয়তো আমাদের কাছে তার মৃত্যুটা কঠিন মনে হচ্ছে কষ্ট মনে হচ্ছে কিন্তু আল্লাহ

তালার কাছে তিনি অত্যন্ত ভালোভাবে উপস্থিত হলেন। যে মৃত্যুতে আল্লাহ খুশি হয়, যিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনিও খুশি হন।

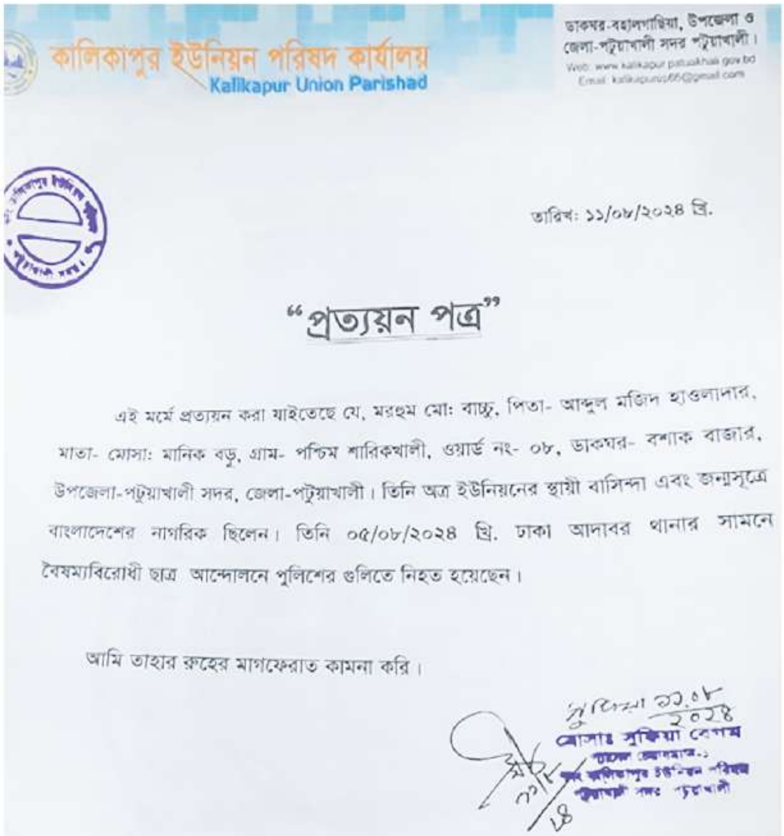

কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
Kalikapur Union Parishad

ডাকঘর-বহালগাছিয়া, উপজেলা ও জেলা-পটুয়াখালী সদর পটুয়াখালী।

তারিখ: ১১/০৮/২০২৪ খ্রি.

"প্রত্যয়ন পত্র"

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, মরহুম মোঃ বাচ্চু, পিতা- আব্দুল মজিদ হাওলাদার, মাতা- মোসাঃ মানিক বড়ু, গ্রাম- পশ্চিম শারিকখালী, ওয়ার্ড নং- ০৮, ডাকঘর- বশাক বাজার, উপজেলা-পটুয়াখালী সদর, জেলা-পটুয়াখালী। তিনি অত্র ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন। তিনি ০৫/০৮/২০২৪ খ্রি. ঢাকা আদাবর থানার সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

আমি তাহার রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

মোসাঃ সুফিয়া বেগম

আমরা ছাত্রসমাজের পক্ষে আছি। আমরা চাই, আগামী দিনের বাংলাদেশ আলেম-ওলামার নেতৃত্বে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ মোঃ বাচ্চুর পরিবার তার চাকুরী থেকে উপার্জনকৃত অর্থের মাধ্যমে চলতেন। উপার্জন ও ভালো ছিলো। তারা মিরপুরের লালকুঠিতে ফ্ল্যাট বাসায় ভাড়া থাকতেন। পরিবারে দুই মেয়ে মাছুমা (২২) ও নির্জনা (১৫) এবং এক ছেলে মাহীন (১৮) কে নিয়ে তাদের সংসার চলে যাচ্ছিলো মোটামুটি। মেয়ে দুই জন কলেজ ও হাইস্কুলে পড়াশুনা করে। ছেলেটি বাবার সাথে সেলাইয়ের কাজে সাহায্য করতো। মোঃ বাচ্চুর মৃত্যুতে বাসা ভাড়া ও ঢাকায় সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালাতে পারবেন না বলে তারা ইতিমধ্যেই গ্রামে চলে গিয়েছেন। ভিটে আছে কিন্তু ঘর নাই তাদের। আপাতত ভাড়া বাসায় উঠেছেন তারা। স্ত্রী লাইলী (৩৮) সেলাইয়ের কাজ জানেন। তার আবার রয়েছে শারীরিক নানা রকম অসুস্থতা যেমন পায়ে ব্যথা, কোমড়ে ব্যথা, লিভারে জটিলতা, হাঁপানী। এই শরীর নিয়ে মিসেস লাইলী যদি সেলাই কাজ করতে পারেন তবে তা থেকে উপার্জিত অর্থই হবে সন্তানদের লেখাপড়া, খাবার খরচ, নিজের চিকিৎসা খরচ ও বাসা ভাড়া দেয়ার একমাত্র অবলম্বন।

শহীদ বাচ্চুর হৃদয়ের কথা

এই দেশ আলেম-ওলামার দেশ। এই দেশে কোনও ভারতীয় এজেন্ডা আমরা বাস্তবায়ন করতে দেবো না। দেশে আলেম-ওলামা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: মোঃ বাচ্চু
Name: Md Bachchu
পিতা: আব্দুল মজিদ হাওলাদার
মাতা: মোসাঃ মানিক বড়ু
Date of Birth: 03 Jul 1977
ID NO: 6725811466356

বা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে যেকোনও চক্রান্ত আমরা একসঙ্গে রুখে দেবো, ইনশাআল্লাহ। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা হেফাজত, চরমোনাই, জামায়াত সবাই একত্র হয়ে যান।

শহীদ বাচ্চুর স্ত্রীর বক্তব্য

আমার স্বামী বাড়ি থেকে যখন বের হয় খুব তাড়াহুড়া করে ভাত খেয়ে গোসল করে ছেলেকে সঙ্গে করে গণভবনের দিকে গেল। যাওয়ার আগে আমি বললাম যাওয়ার দরকার নেই বাইরে অনেক গণ্ডগোল হতে পারে। আমার স্বামী বললেন আজকে স্বাধীনতার দিনে আবার গণ্ডগোল হবে কেন, আজকে তো কোন সমস্যা হওয়ার কথা না। আজকের দিনে সবাই আনন্দ করবে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি বললাম তা অবশ্য ঠিক , যাও তবে সাবধানে থেকো। এই যাওয়াই আমার স্বামীর শেষ যাওয়া। স্বাধীনতার পরেও মানুষকে এভাবে পুলিশের হাতে মরতে হবে এমন ইতিহাস পৃথিবীর বুকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। যে অস্ত্র শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশের হাতে দেয়া হয়েছে সেই অস্ত্র দিয়ে কেন শান্তি নষ্ট করবে? আমার স্বামীকে যে সব পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে তাদেরকে আমি ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে চাই। এ ধরনের আচরণ পুলিশ যেন আর কোনদিন করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: পটুয়াখালী সদর
জেলা: পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।

জমনি ফরম-৩

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন বহি নম্বর: ৮

সনদ প্রদানের তারিখ: ১৭/১১/২০২১

নিবন্ধনের তারিখ: ১৭১১২০২১

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১ ৯ ৭ ৭ ৭ ৮ ১ ৯ ৫ ৩ ৩ ১ ১ ২ ৫ ১ ৩

নাম: বাচ্চু মিয়া

জন্ম তারিখ: ০৩ ০৭ ১৯৭৭

লিঙ্গ: পুরুষ

কথায়: তিন জুলাই উনিশশত সাতাত্তর

সন্তানের ক্রম: ১

জন্মস্থান: পটুয়াখালী

স্থায়ী ঠিকানা: - গ্রাম: পশ্চিম শরিকখালী, ডাকঘর: বশাক বাজার ৮৬০০, ওয়ার্ড - ৮ কালিকাপুর, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী, বরিশাল বিভাগ

পিতার নাম: আব্দুল মজিদ হাওলাদার
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার নাম: মোসা: মানিক বড়ু
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সিলমোহর

প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর

যাচাইকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সিল)

এক নজরে শহীদ মো: বাচ্চু

নাম	: মো: বাচ্চু
জন্ম তারিখ	: ০৩-০৭-১৯৭৭
জন্মস্থান	: গ্রাম: পশ্চিম শরিকখালী
ইউনিয়ন	: কালিকাপুর, থানা: পটুয়াখালী সদর, জেলা : পটুয়াখালী, পেশা: অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম শরিকখালী, ইউনিয়ন: কালিকাপুর, থানা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম শরিকখালী, ইউনিয়ন: কালিকাপুর, থানা: পটুয়াখালী সদর, জেলা : পটুয়াখালী
পিতা	: মৃত আব্দুল মজিদ হাওলাদার
মাতা	: মৃত মানিক বড়ু
স্ত্রী	: লাইলী খাতুন (৩৮), সেলাইয়ের কাজ জানেন
ছেলে মেয়ে	: মাসুম আক্তার লিজা (২২), দ্বাদশ শ্রেণি
	: মুন্না ইসলাম মাহিন (১৮), বেকার
	: নির্জনা আক্তার (১৫), নবম শ্রেণি
আঘাতকারী	: আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: আদাবর থানার সামনে, ০৫-০৮-২০২৪, বিকেল ৪:৩০টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: আদাবর থানার সামনে, ০৫-০৮-২০২৪, বিকেল ৪:৩০টায়
জানাজা	: ০৫-০৮-২০২৪ সকাল ১০:০০টায়
কবরস্থান	: নিজে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১.মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা যায়

২.বড় মেয়ের চাকরির ব্যবস্থা করা যায়

শহীদ মোঃ আবু রায়হান

ক্রমিক : ৩৪৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩৪

শহীদের জীবনী

মো: কামাল এবং রেহেনা বেগমের ঘরে ১ এপ্রিল ২০০৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ মো: আবু রায়হান। রায়হানের জন্ম পটুয়াখালী জেলার সদর থানার চালিতাপুর্নিয়া গ্রামে। দুই ভাই বোনের মধ্যে শহীদ রায়হান আকন ছিলেন বড়। বড় হওয়ার কারণে সংসারের অর্থনৈতিক সমস্যায় হাল ধরতে হয় অল্প বয়সেই। কওমি মাদ্রাসায় পঞ্চম জামাত পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যায় লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। শাহাদতের তিন মাস আগে তিনি ঢাকার সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস বাড্ডা এলাকায় দশ হাজার টাকা বেতনের চুক্তিতে ডেলিভারি ম্যান এর চাকরি নেন। শহীদ মো. রায়হানের পিতা পেশায় একজন দিনমজুর। সম্পদ হিসেবে ৩০ শতাংশ আবাদি জমি ও ১৫ শতাংশ জমিতে বসতবাড়ি রয়েছে তাদের। মা মোসা. রেহেনা গৃহিনী (৪০) ও হার্টের রোগী। বাবার স্পাইনল কর্ডের সমস্যা আছে এবং ছোট বোন জান্নাত (১১) ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ালেখা করে।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শহীদ রায়হান যখন ছোট তখন শাপলা চত্ত্বরে গণহত্যাকারী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার আলেম-ওলামাদের যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড করেছিল তা সে টিভিতে দেখেছিল। তখন থেকেই সে

আওয়ামীলীগকে জানে। আস্তে আস্তে যখন বড় হয় তখন আওয়ামী লীগের আরো দুর্নীতি অপরাজনীতি এবং বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন দেখেছে। রায়হান মনে করতো হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আমরা সবাই এ দেশের গর্বিত নাগরিক। আমরা সবাইকে নিয়ে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ চাই, যেখানে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না, ক্ষুধামুক্ত, ভয়ভীতিহীন ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ দেখতে চাই। এ জন্য আমাদের সবাইকে একতাবদ্ধ থেকে এই আওয়ামী লীগ অপশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে

শহীদ মোঃ রায়হান আকন কোটা বৈষম্য আন্দোলনের একজন সক্রিয়কর্মী ছিলেন। ছোটকালে মাদ্রাসায় পড়েছেন তাই সত্য মিথ্যার পার্থক্য ভালই করতে জানেন। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকার যে সাধারণ ছাত্রদের উপর অত্যাচার করছে তা দেখে সে সহ্য করতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে করতেন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ২৪ ঘন্টায় ছাত্রদের সাথে আন্দোলন করি । কিন্তু পারিবারিক সমস্যায় চাকরি ছাড়া সম্ভব না তাই চাকুরির ফাঁকে সুযোগ পেলে তিনি ছুটে যেতেন আন্দোলনে। রাজপথে সাহসীকতার সাথে ভূমিকা রেখেছেন। অদম্য সাহসী এই যুবকের সামনে অসংখ্য তাজা প্রাণ ঝরে যায় তবুও তিনি ভয়ে কাতর হয়ে আন্দোলন থেকে সরে যাননি।

স্বৈরচার পতনের শেষদিন ৫ আগস্ট ২০২৪ দেশ ছেড়ে পালায় রক্ত পিপাসু স্বৈরসরকার প্রধান খুনি হাসিনা। এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্বৈরাচার পলিয়েছে খবর শুনে টগবগে যুবক রায়হান ছুটে যায় ঢাকার বাড্ডা এলাকার রাজপথে। অতি উৎসহসী হায়েনা পুলিশগণ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর চড়াও হয়। ধাওয়া দেয় সাধারণ মানুষদের। তখনি পুলিশের হাতে ধরা পরে রায়হান। পুলিশ নির্মমভাবে রায়হানকে প্রহার করে।

এক পর্যায়ে পুলিশ বুটজুতা পায়ে তাকে এক পা দিয়ে চেপে ধরে অন্য পা মোচড়িয়ে ভেঙ্গে দেয়। রায়হানের পা ভেঙ্গে ক্ষান্ত হয়নি পুলিশ। তাকে পা দিয়ে ধরে কোমরে পরপর দুটি গুলি করে ফেলে রাখে বাড্ডা সড়কে। গুলি একপাশ ভেদ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। রায়হানের রক্তে রাজপথ ভিজে যায়। বিকাল ৩ ঘটিকায় রায়হানকে উদ্ধার করে সাধারণ লোকজন নিয়ে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তখনো রায়হান জীবিত, কর্তব্যরত ডাক্তার দ্রুত রক্ত ব্যবস্থা করতে বলেন, দু ব্যাগ রক্ত ব্যবস্থা করে পুশ করা হয় রায়হানের শরীরে কিন্তু তাতে বড্ড দেরি হয়ে যায়।

ঠিক ঘড়ির কাটায় বিকাল যখন ৪ টা রায়হান তখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। খবর শুনে রায়হানের আপন ফুফাতো ভাই মো. কাওছার এবং সাদ্দাম হোসেন ঢাকা মেডিকেলের মর্গে ছুটে এসে লাশ গ্রহণ করে। এভাবে জীবন দিয়ে নতুন বাংলাদেশের অধ্যায় সূচনা করে শহীদ রায়হান।

বিশেষ তথ্য

৫ আগস্ট ২০২৪, সোমবার। শহীদ রায়াহান মানুষের মাঝে এত প্রিয় ছিলেন যে তাকে হারিয়ে এলাকার সবাই ব্যথিত। বিশেষ করে আপন বড় চাচা মো. নুরুল ইসলাম আকন (৫০) নিজের ছেলের মত করে দেখতেন। তাই রায়হানের শাহাদাতের সংবাদ শুনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । একমাত্র ভাতিজার মৃত্যু সহ্যকরতে পারেননি। অতপর তিনি ৯ আগস্ট ২০২৪ স্ট্রোক করে মারা যায়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

শহীদের নানা মো. দিলু খান বলেন, আমার নাতি রায়হান সকলের চেয়ে আলাদা ছিলো ও আনেক ভালো ছেলে। তার বাবা ও খুব ভালো মানুষ। মাদ্রাসার পড়া-লোখা ছেড়ে সে পরিবারের হাল ধরার জন্য ঢাকায় চাকুরি করতো।

শহীদের বাবা মো. কামাল আকন বলেন, রায়হান আমাকে বিকাল ৩টায় ফোন দিয়ে বলে আব্বা আমাকে পুলিশ দুটি গুলি করেছে। আমার পা ভেঙ্গে দিছে আমি আর বাঁচব না, আমাকে মাফ করে দিয়েন আব্বা। রায়হানের বাবা আরো বলে, একথা গুলো আমার কানের কাছে এখনও বেজে ওঠে।

সাথে থাকা লোকের সাথে রায়হানের ফোনে বাবা যোগাযোগ রক্ষা করে। বিকাল ৪ টায় লোকটি রায়হানের বাবাকে ফোন দিয়ে বলেন, আপনার ছেলে চলে গেছে। তখন বাবা জিঙ্গাসা করে আমার রায়হান কোথায় গেছে? লোকটি বলে, দুনিয়ার মায়া ছেড়ে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থের অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরেন রায়হান। ঢাকাতে তিন মাস হল কুরিয়ার সার্ভিসের ডেলিভারি ম্যান হিসেবে চাকরি নিয়েছেন। ঘরবাড়ি ছিল না। শহীদ মো. রায়হানের পরিবার থাকার জন্য গত তিন বছর আগে একটি টিনশেড মাটির ঘর র্নিমাণ করেন। শহীদ মো. রায়হানের পিতা পেশায় একজন দিনমজুর। সম্পদ হিসেবে ৩০ শতাংশ আবাদি জমি ও ১৫ শতাংশ জমিতে বসতবাড়ি রয়েছে। মা মোসা. রেহেনা গৃহিণী। তিনি হার্টের রোগী। বাবার স্পাইনল কর্ডের সমস্যা আছে। ছোট বোন জান্নাত) ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। রায়হানের টাকায় সংসার চলত কিন্তু এখন তার পরিবার কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

নামঃ মোঃ রায়হান আকন
বয়সঃ ২১
পিতাঃ মোঃ কামাল আকন
পেশাঃ দিনমজুর
মাতাঃ মোসাঃ রেহেনা
পেশাঃ গৃহিনী
গ্রামঃ চালিতাবুনিয়া
ওয়ার্ডঃ ০৭
ইউনিয়নঃ মাদারবুনিয়া
থানা ও জেলাঃ পটুয়াখালী

৫ আগষ্ট ২০২৪
দুপুর ২ টা গুলি বিদ্ধ হয় পরে বিকাল ৩ ঘটিকায় ঘটিকায় মৃত্যু বরণ করেন গুলি ২ টা লাগছে, পুলিশ পারাইয়া ধইরা গুলি করছে।

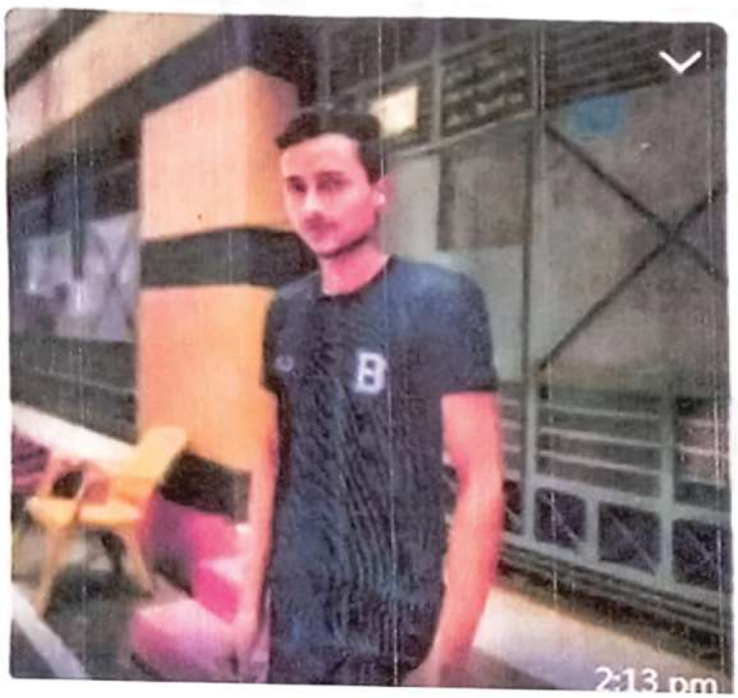

জন্ম নিবন্ধন সনদ

এক নজরে শহীদ মো: আবু রায়হান

নাম	: মো: আবু রায়হান
জন্ম তারিখ	: ০১-০৪-২০০৬
জন্মস্থান	: চালিতাবুনিয়া পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী
পেশা	: ডেলিভারি ম্যান, সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস ,বাড্ডা, ঢাকা
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: চালিতাবুনিয়া, ইউনিয়ন: মাদারবুনিয়া, থানা: পটুয়াখালী সদর, জেলা : পটুয়াখালী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চালিতাবুনিয়া, ইউনিয়ন: মাদারবুনিয়া, থানা: পটুয়াখালী সদর, জেলা : পটুয়াখালী
পিতার নাম	: মো: কামাল (৪৬), দিনমজুর
মাতার নাম	: মোছা: রেহেনা বেগম (৪০), গৃহিণী
ছোট বোন	: মোছাম্মৎ জান্নাত (১২), ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী
আঘাতকারী	: আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ায় ও স্থান সময়	: ঢাকা বাড্ডার মেইন রোড ০৫-০৮-২০২৪ বিকেল ২:৩০টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০-০৭-২০২৪, দুপুর ৪:০০টায়, ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল, ঢাকা
জানাজা	: ০৬-০৮-২০২৪ সকাল ১০:০০টায়
কবরস্থান	: নিজে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা

১. একটি পাকা ঘর নির্মাণ করে দেয়া দরকার

২. নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করে দেয়া যায়

হৃদয় চন্দ্র তরুয়া

ক্রমিক : ৩৪৭

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩৫

স্বপ্নের অসমাপ্ত যাত্রা

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একজন অকুতোভয় যোদ্ধা হিসেবে হৃদয় চন্দ্র তরুয়া আমাদের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কাঠমিস্ত্রী বাবা রতন তরুয়া ও মা অর্চনা রানীর কোল আলো করে ২০০৩ সালের ৩ এপ্রিল পটুয়াখালী জেলার চরপাড়া, নতুন বাজার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হৃদয় চন্দ্র তরুয়া। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এই মেধাবী ছাত্রের স্বপ্ন ছিল একদিন বিসিএস ক্যাডার হয়ে দেশের সেবা করবেন। নিজের পরিবারের দরিদ্রতা দূর করে তাদের সুখী করাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার স্বপ্ন দেখা এই তরুণের জীবন অকালে বিনষ্ট হয়ে গেল।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট ব্রিজের নিচে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হৃদয় চন্দ্র তরুয়া আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি। তার মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকাহত হয়ে পড়ে। একজন মেধাবী ছাত্র, একজন দেশপ্রেমিক যুবক হৃদয়ের মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি।

হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ছিলেন একজন সাহসী ও নির্ভীক যুবক। দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি পিছপা হননি। তার এই ত্যাগ ও বলিদানকে কখনো ভুলতে দেওয়া যাবে না। হৃদয়ের মৃত্যু আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেশের জন্য লড়াই করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা আশা করি, হৃদয় চন্দ্র তরুয়ার আত্মা শান্তি পাবে এবং তার বলিদান সার্থক হবে।

যেভাবে তিনি চির স্মরণীয় হলেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হৃদয় চন্দ্র তরুয়া একজন সক্রিয় ছাত্র সংগঠক ছিল। সরকারি চাকরিতে বৈষম্যমূলক

কোটাপ্রথা আদালত কর্তৃক পুনর্বহালের প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে নেমে আসে। সেই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দিতে হৃদয় তার আরও কয়েকজন বন্ধু সহ বহদ্দারহাট এলাকায় ১৮ জুলাই দুপুর দেড়টার দিকে যান।

শিক্ষার্থীদের স্লোগানে মিছিল এগিয়ে যেতে থাকে।

'তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার
কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার।'

'চাইলাম অধিকার
হয়ে গেলাম রাজাকার'

'লাখো শহীদের রক্তে কেনা
দেশটা কারো বাপের না।'

'আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম'
'দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ'

'আমার খায়, আমার পরে,
আমার বুকেই গুলি করে';

'তোর কোটা তুই নে,
আমার ভাই ফিরিয়ে দে'

'আমার সোনার বাংলায়
বৈষম্যের ঠাঁই নাই'

'বুকের ভেতর অনেক ঝড়,
বুক পেতেছি গুলি কর'

জালিমের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেওয়া এইসব বজ্রকণ্ঠ স্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে বীর চট্টলার রাজপথ।

মিছিল সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ও ছাত্রলীগ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছাত্রদের বাধা প্রদান করে। এসময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করলে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

হৃদয় চট্টগ্রামের স্থানীয় না হওয়ায় এলাকা খুব ভালো করে চিনত না। বহদ্দারহাট চার রাস্তার মোড়ে পুলিশ ও বিজিবি অবস্থান নিয়েছিল। বাম পাশের রাস্তার একটা অংশ থেকে ঢিল ছুড়ছিল শিক্ষার্থীরা। পুলিশ কিছুক্ষণ পরপর গুলি করছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী হৃদয়ের এক বন্ধু জানান "ধাওয়া খেয়ে আমরা তখন নিরাপদ স্থানের খোঁজে দৌড়াতে থাকি তখন বিকট শব্দ হয়। চারপাশে তাকিয়ে দেখি হৃদয় পড়ে আছে, হাত দিয়ে ডাকছে। আমি তখন তার দিকে তাকাতেও পারছিলাম না। প্রথমবার গুলিবিদ্ধ মানুষ দেখলাম। অনেককে সাহায্যের জন্য ডাকি। পরে অল্প বয়সী কয়েকজন ছেলের সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে যাই।" রিকশায় সে সময়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ও বারবার বলছিল–'আমার পা অবশ হয়ে যাচ্ছে। পা নড়াইতে পারছি না।' আমি তার পা-টা ধরে ছিলাম। বারবার জিজ্ঞেস করছিল, 'আর কতক্ষণ'।"

পুলিশের গুলি সরাসরি হৃদয় তরুয়ার বুকে বিদ্ধ হয়। ফুটো করে দেয় ফুসফুস। আহত অবস্থায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে তাকে

Hridoy Tarua
Jul 7 ·

"আমার সোনার বাংলায়,
বৈষম্যের ঠাঁই নাই।"

নেয়া হয়। ডাক্তাররা জানালেন, তার ওপেন হার্ট সার্জারি করে বুলেট বের করতে হবে। কিন্তু সে আন্দোলনকারী হওয়ায় তার সার্জারি করতে চাচ্ছিল না। এছাড়াও ওপেন হার্ট সার্জারি করতে কয়েক লাখ টাকা লাগে। ১৮ তারিখ রাতে Digital Crackdown শুরু হওয়ার পর সব মোবাইল ব্যাংকিং, অঞ্চগ বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতালগুলো জানিয়েছিল, সার্জারির আগে ৬০-৭০% টাকা পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে ২০ তারিখ সকালে তাকে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়। ঢামেকে ICU ম্যানেজ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। পরবর্তীতে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ICU ম্যানেজ করা হয় কিন্তু তখনো কোনো মেডিকেল সার্জারি করতে রাজি হয়নি। পরে হৃদয়কে পিজিতে নেয়া হয়, ওখানে 'আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী' জানার পরে ওকে ভর্তি নিতে রাজি হয়না কর্তৃপক্ষ। এরপর 'স্কয়ার হাসপাতালে' যোগাযোগ করা হয় সেখানেও একই পরিস্থিতি। তারা জানিয়ে দিল প্রায় ১০ লাখ টাকা আগাম পরিশোধ করতে হবে। নাহলে সার্জারি হবে না। তারপর বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নেয়ার পর তারাও মানা করে দেয়।

এভাবে ৫ দিন পর্যন্ত বুকে গুলি নিয়ে হৃদয় হাসপাতাল থেকে হাসপাতালে ঘুরতে থাকে। সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে পরবর্তীতে ২৩ জুলাই সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আই সি ইউ তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তার মতো অগণিত হৃদয় এভাবে আন্দোলনের সময় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।

প্রতিবাদী হৃদয় তরুয়া

হৃদয় চন্দ্র তরুয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রথম থেকে অংশগ্রহণ করেন। ১৭ জুলাই ২০২৪ প্লাকার্ড হাতে তার একটি ছবি এখনো ফেইসবুকে ভেসে বেড়ায়। তাতে লেখা "কোটা রেখে কলম

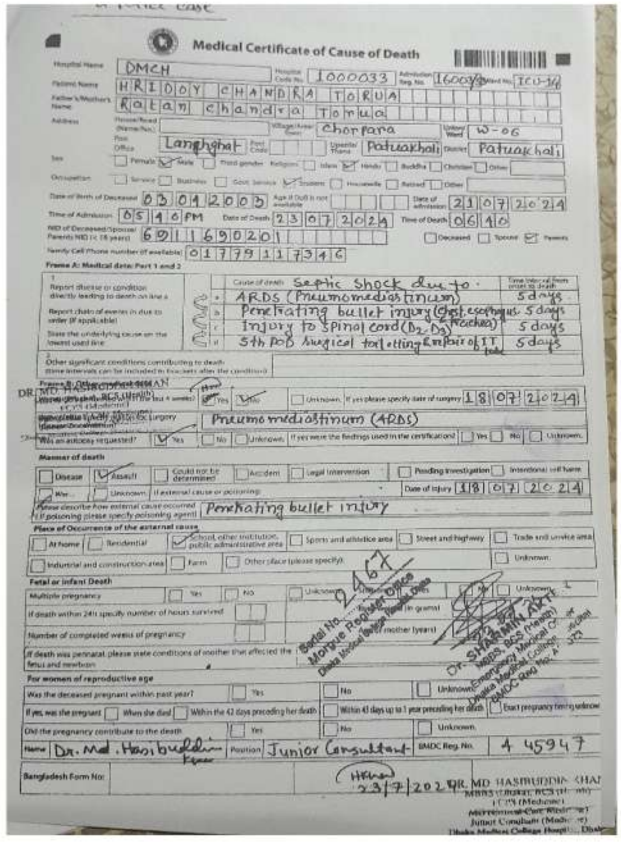
Medical Certificate of Cause of Death
Hospital Name: DMCH — Hospital Code No: 1000033
Patient Name: HRIDOY CHANDRA TORUA
Father's/Mother's Name: Ratan chandra Torua
Address: Village/Area: Chorpara — Union/Ward: W-06 — Post Office: Langhghat — Upazila/Thana: Patuakhali — District: Patuakhali
Date of Birth of Deceased: 03 04 2003 — Date of admission: 21 07 2024
Time of Admission: 05 46 PM — Date of Death: 23 07 2024 — Time of Death: 06 40
NID of Deceased/Spouse/Parents: 6911690201
Family Cell Phone number: 01779117346
Frame A: Medical data: Part 1 and 2
Cause of death: Septic shock due to
a. ARDS (Pneumomediastinum) — 5 days
b. Penetrating bullet injury (chest, esophagus, trachea) — 5 days
c. Injury to spinal cord (D2-D3) — 5 days
d. 5th POD surgical toiletting & repair of IT tube — 5 days
Date of surgery: 18 07 2024
Pneumomediastinum (ARDS)
Manner of death: Assault — Date of injury: 18 07 2024
Penetrating bullet injury
Name: Dr. Md. Hasibuddin Khan — Position: Junior Consultant — BMDC Reg. No. A 45947
23/7/2024

ধর, নিজের বীরত্ব প্রকাশ কর।"

একই দিন এসএসসি ব্যাচ-১৮ তার বন্ধুদের উদ্দেশ্য করে ফেইসবুক পোস্টে যা লিখেন, তা হুবহু তুলেধরা হলো- "আমি পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের এসএসসি-২০১৮ ব্যাচের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে, আমাদের ব্যাচ থেকে কেউ যদি সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার ঘটনায় প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে তবে উপযুক্ত প্রমাণস্বরূপ উক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাচ থেকে বয়কট করার ঘোষণা করছি। ভবিষ্যতে ১৮ ব্যাচের কোনো কার্যক্রমে উক্ত ব্যক্তিবর্গকে ডাকা হবে না এবং

তার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখবে না। জুবিলীয়ান"- এমনই ছিলো তার প্রতিবাদী ভাষা।

DC Patuakhali
1d · 🌐

২০২৪ সালের জুলাই- আগস্ট মাসে সংঘটিত ছাত্র-শ্রমিক-জনতার বিপ্লবে স্বৈরাচারের গুলিতে নিহত, ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের অগ্রসেনানী শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়ার বাবা-মা এবং পরিবারবর্গের সাথে আজ বিকালে পটুয়াখালী জেলার নবনিযুক্ত মান্যবর জেলা প্রশাসক জনাব আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন এবং পটুয়াখালী জেলার সুদক্ষ পুলিশ সুপার জনাব মো: আনোয়ার জাহিদ সৌজন্য সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে জেলা প্রশাসক মহোদয় শহীদ হৃদয় তরুয়ার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস জ্ঞাপন করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

১. নিহতের দুলাভাই, দ্বীপক মিস্ত্রি বলেন, খুবই ভালো মানুষ ছিলো। সে খুব কষ্ট করে করে লেখা পড়া করছে। আমার সাথে তার খুব ভালো সম্পর্কে ছিলো। ১৮ জুলাই হঠাৎ আমার কাছে কল আসে হৃদয় গুলিবিদ্ধ হয়ছে। পরে চট্টগ্রামে গিয়ে ওকে এনে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি করাই। পরে ২৩ তারিখ মারা যায়। সে খুবই মিশুক ছিলো।

২. নিহতের বাবা রতন তরুয়া (৫০) বলেন, 'হৃদয় চন্দ্র তরুয়া আমার একমাত্র ছেলে। অনেক কষ্ট করে পড়া-লেখা করাইছি, খুব ভালো ছাত্র ছিলো আমার ছেলে, জুবলি স্কুল দিয়া এসএসসিতে এ+ পাইছে। পটুয়াখালী সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসিতেও এ+ পাইছে। আমার ছেলে খুব ভালো ছিলো। ভদ্র, নম্র। এলাকায় ওর মত এতো ভালো ছেলে নাই। অনেক কষ্ট কইরা পোলাডারে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি করছি। আমার বাবা হৃদয় কইছে পড়ালেখা শেষ করে বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হইবো।'

৩. বড়বোন মিতু বলেন, 'ভাইটা খুবই মেধাবী ছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন চান্স পায়, মা-বাবা প্রতিবেশী সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিলেন। হৃদয়ও জানত, তার ওপর কত বড় দায়িত্ব। বাবাকে ফোন করলেই বলত, বাবা আর কয়েকটা বছর। তারপর আর কষ্ট করতে হবে না।'

হৃদয় বিহীন পরিবার

হৃদয়ের বাড়ি পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলায়। বাড়ি মির্জাগঞ্জে হলেও পটুয়াখালীর সদরে চরপাড়া, নতুন বাজার এলাকায় ভাড়া থাকে হৃদয়ের পরিবার।

হৃদয়কে হারিয়ে পাগলপ্রায় মা-বাবা। পরিবারের জীবনযুদ্ধের কথা তুলে ধরেন তাঁর বড় বোন মিতু। তিনি বলেন, মা বাসা-বাড়িতে কাজ করে জমানো টাকা হৃদয়ের জন্য পাঠাতেন। ও একদিন বড় হবে। চাকরি করবে, দুঃখ-দুর্দশা মুছবে; সেই আশায় ছিলাম সবাই।

ছেলের মৃত্যুর খবরে কয়েকবার বেহুঁশ হয়েছেন অর্চনা রানী। হুঁশ ফিরলেই বিলাপ করছেন। কোনো কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না তাঁকে।

মিতু বলেন, 'আমার ভাই তো কোনো অস্ত্র তুলে নেয়নি। কাউকে আঘাতও করেনি। হয়তো কোটা আন্দোলনে শরিক হয়েছিল। তাই তাকে এভাবে গুলি করে মারতে হবে? আমরা এর বিচার চাই।'

পরিবার অর্থনৈতিক অবস্থা

বীর হৃদয় চন্দ্র তরুয়ার বাবা রতন তরুয়া (৫০) পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি। পটুয়াখালী শহরের ভাড়া বাসায় থেকে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে গিয়ে আসবাবপত্র নির্মানের কাজ করেন তিনি। মা অর্চনা রানী(৪৫) হৃদরোগী হয়েও অন্যের বাসায় কাজের বুয়ার কাজ করেন। তার পরিবার খুব কষ্ট করে দিনাতিপাত করে। ছেলে টিউশন করে পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করতেন। অর্থনৈতিকভাবে পরিবারটি অসচ্ছল। তাদের একমাত্র ছেলে ছিলো হৃদয় চন্দ্র তরুয়া।

নিজেদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের টাকায় এ দম্পতি মানুষ করতে চেয়েছিলেন একমাত্র ছেলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হৃদয় চন্দ্র তরুয়াকে। ছেলেও চেয়েছিলেন একদিন মা-বাবার সব কষ্ট দূর করবেন। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাবেন। ফোন করলেই তাঁদের সেই স্বপ্নের কথা বলতেন; কিন্তু একটি বুলেট সব শেষ করে দিল।

হৃদয় চন্দ্র তরুয়ার পরিবারের নেই কোন নিজস্ব বাসস্থান। বাবা-মা একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে এই পরিবারটি এখন একটি নিঃস্ব পরিবারে পরিণত হয়েছে। তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই নেই, একমাত্র মেয়ে বিবাহ দেওয়া তার জামাইও কাঠমিস্ত্রি কাজ করে। পরিবারে হালধরার মতন কেউ নেই। বাবা-মা দুজনেই ছেলে হারানোর শোকে কাতর এবং পাড়া প্রতিবেশীরাও যেনো বাকরুদ্ধ।

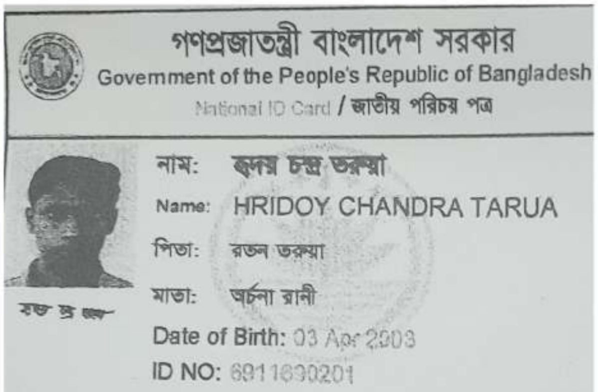

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
National ID Card / জাতীয় পরিচয় পত্র

নাম: হৃদয় চন্দ্র তরুয়া
Name: HRIDOY CHANDRA TARUA
পিতা: রতন তরুয়া
মাতা: অর্চনা রানী
Date of Birth: 03 Apr 2003
ID NO: 6911690201

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: হৃদয় চন্দ্র তরুয়া
জন্ম তারিখ	: ০৩-০৪-২০০৩
পিতা	: রতন তরুয়া
মাতা	: অর্চনা রানী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চরপাড়া নতুন বাজার, ইউনিয়ন: পটুয়াখালী পৌরসভা, থানা: সদর, জেলা: পটুয়াখালী
পেশা	: ছাত্র (স্নাতক ৩য় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ)
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ঘটনার স্থান	: বহদ্দারহাট ব্রিজের নিচে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৮ জুলাই, দুপুর ২:৩০ (আনুমানিক), বহদ্দারহাট মোড়, চট্টগ্রাম
শাহাদাতের সময়কাল	: ২৩ জুলাই, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আইসিইউ
আঘাতের ধরন	: বুকে গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শেষকৃত্য স্থান	: গ্রামের বাড়িতে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়

প্রস্তাবনা

১. তার মায়ের হৃদরোগের চিকিৎসা খরচ বহন করা যেতে পারে
২. পিতাকে ব্যবসার জন্য পুঁজি দেওয়া যেতে পারে
৩. স্থায়ী বাসস্থান প্রয়োজন

শহীদ মোঃ মিলন

ক্রমিক : ৩৪৮

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩৬

এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ যাত্রা

২০২৪ সালের জুলাই মাস, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গৌরবজ্জ্বল অধ্যায় যোগ করেছে। ছাত্রজনতা কর্তৃক সরকারের প্রতি কোটা সংস্কারের মত অতি সাধারণ একটি দাবীকে সরকার যেভাবে দমননীতির মাধ্যমে একটি সহিংস পরিনতির দিকে ঠেলে দেয়, তার অন্যতম শিকার শহীদ মো: মিলন।তিনি ছিলেন সাধারণ একজন মাছ ব্যবসায়ী।

পটুয়াখালী জেলার দুমকি থানার আঙ্গারিয়া ইউনিয়নের ঝাটরা গ্রামের বাসিন্দা মোঃ মিলন। ১৯৮৮ সালের ২৬ মার্চ জন্মগ্রহণকারী এই যুবকের জীবন ছিল সরল ও স্বাভাবিক। তিনি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাছ ব্যবসা করতেন। তার স্ত্রী মমতাজ বেগম এবং দুই সন্তান দ্বীন ইসলাম ও সুমাইয়া ইসলামকে নিয়ে তার একটি সুখী পরিবার ছিল।

কিন্তু ভাগ্যের খেলায় তাকে এই সুখী জীবন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ২০২৪ সালের ২১ জুলাই, চিটাগাং রোডে বিক্ষোভের সময় পুলিশের গুলিতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। দুপুর ১২টার দিকে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।

একজন নিরীহ মাছ ব্যবসায়ী হয়েও মিলন জাতীয় একটি আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠেছিলেন। তার মৃত্যু শুধু তার পরিবারের জন্যই নয়, সমগ্র দেশের জন্য একটি বড় ক্ষতি। তার মৃত্যু আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মানুষ কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

মোঃ মিলনের মৃত্যু একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছে, একটি সাধারণ মানুষের জীবন কি এত সহজে নেওয়া যায়? তার মৃত্যু আমাদের সকলকে ভাবিয়ে তোলে, একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে হলে আরও কতখানি পথ পাড়ি দিতে হবে?

শহীদ মো: মিলনের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। তার মৃত্যু ব্যর্থ হবে না। তার আত্মত্যাগ অবশ্যই আগামীদিনের সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে প্রেরণা যোগাবে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

কোটা সংস্কার আন্দোলন বৈষম্যবিরোধী গণআন্দোলনের রূপ নেয় যখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ স্বতস্ফূর্ত অংশ নেয় এই আন্দোলনে। কিন্তু মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করে দীর্ঘ প্রায় দেড় যুগে ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার আওয়ামী সরকারকে করে তোলে আরেক ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন। আওয়ামী ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন তখন নিজেকে অপ্রতিরোধ্য ভাবতে শুরু করেছে। এদেশের মাটি তার পৈতৃক সম্পদ, জনগণকে হলো তার প্রজা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর

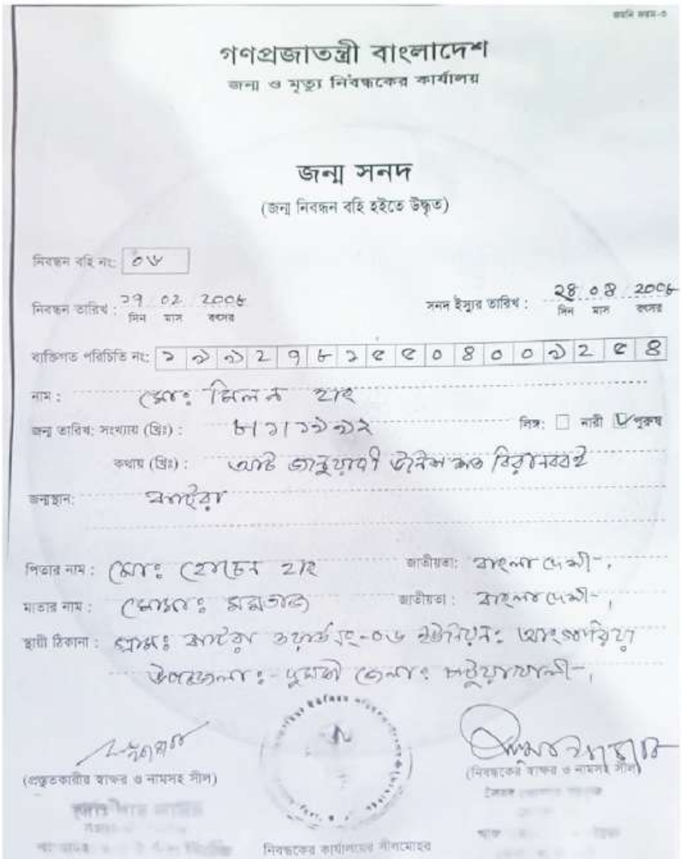
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং: ০৬

নিবন্ধন তারিখ: 27 02 2006 (দিন মাস বৎসর)

সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৪ ০৪ 2006 (দিন মাস বৎসর)

ব্যক্তিগত পরিচিতি নং: ১৯৯২৭৮১৫৫০৪০০৯২৫৪

নাম: মোঃ মিলন হাং

জন্ম তারিখ: সংখ্যায় (খ্রিঃ): ৮/১/১৯৯২ লিঙ্গ: নারী ☐ পুরুষ ☑

কথায় (খ্রিঃ): আট জানুয়ারী উনিশ শত বিরানব্বই

জন্মস্থান:

পিতার নাম: জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা:

(প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর

নাগরিক। শেখ হাসিনার ভাষায়- 'এই দেশ আমার বাপের'।

সরকার আন্দোলকারীদের প্রতি ঠিক সেই ব্যবহারই করতে আরম্ভ করল যা তারা করেছিল ২০০৯ সালের পিলখানায় ও ২০১৩ সালের ৫ মে রাতের অন্ধকারে শাপলা চত্বরে। আন্দোলনকারীদের দমাতে খুনি হাসিনা লেলিয়ে দেয় ১৫ বছর ধরে গড়ে তোলা একনিষ্ঠ লাঠিয়াল বাহিনী পুলিশ ও চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুনি, ধর্ষক ও রাত দুপুরে পিটিয়ে মানুষ হত্যাকারী ছাত্রলীগের কুকুরদের। সরকার ডিজিটাল ক্র্যাকডাউন ও সারা দেশে কারফিউ জারি করে। আন্দোলন হয়ে উঠে সহিংস ও সারাদেশ অগ্নিগর্ভে পরিনত হয়।

নারায়নগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জেও ছাত্র জনতা আন্দোলনে নামে। গত ২১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে পণ্ড করতে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের সমর্থিত নেতা-কর্মীরা একজোট হয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, পিস্তল, শটগান, ককটেল, লাঠিসোঁটাসহ নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং জনমনে আতঙ্ক তৈরি করেন। শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের ও আসাদুজ্জামান খান ছাত্র-জনতার উদ্দেশে এলোপাতাড়ি গুলি ও আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। গনধিকৃত ওবায়েদুল কাদের সংবাদ সম্মেলনে বলেন- আন্দোলন দমাতে ছাত্রলীগই যথেষ্ঠ। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা রাস্তায় অবস্থানরত ছাত্র-জনতার ওপর ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভীতির সৃষ্টি করে তাঁদের হাতে থাকা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ও মারধর করেন। শহীদ মিলন তখন মাছের আড়তে মাছ না পেয়ে খালি হাতে বাসায় ফিরছিলেন। ফেরার পথে দুপুর ১২টার দিকে পুলিশের ছোড়া গুলি তার বুকে বিদ্ধ হয়, বুলেট তার হৃদয়কে বিদ্ধ করে মেরুদন্ডের বা পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন মিলন। তাঁকে উদ্ধার করে সাইনবোর্ড এলাকায় অবস্থিত প্রো-অ্যাকটিভ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবে সন্ত্রাসীরা দুইটি অবুঝ শিশুকে করে পিতৃস্নেহ বঞ্চিত ও এতিম, তার স্ত্রীকে করে বিধবা, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে করে সন্তানহারা।

ওই দিনই তার আত্মীয়স্বজন তাকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং রাত দশটার দিকে জানাজা শেষে নিজ জেলা পটুয়াখালীর দুমকি থানার ঝাটারা গ্রামে দাফন দেওয়া হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ মিলনের স্ত্রী বলেন , মিলন সবসময় তার সন্তানদের বলতেন "সবসময় সত্য কথা বলবে, কখনো কাউকে কষ্ট দেবে না। আল্লাহ সব সময় তোমাকে সাহায্য করবে।"

১৬ তারিখ রংপুরে আবু সাইদের মৃত্যুর পর অস্থিরতা প্রকাশ করছিলেন তিনি বারবার বলছিলেন, "ছেলেগুলোকে মারার তো কোন দরকার ছিল না, ছেলেগুলোকে মারার তো কোন দরকার ছিল না"।

সোহাগ হাওলাদার, সম্পর্কে মিলনের চাচা। তিনি বলেন- মিলন ভালো লোক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন নারায়ণগঞ্জ থাকতেন এবং ব্যবসা করতেন।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

মিলন সংসারের একমাত্র উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তার পরিবার নিয়ে নারায়নগঞ্জ বিজেসি চত্তর এলাকায় বসবাস করতেন। নারায়নগঞ্জে তিনি ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী ও ছোট ভাইসহ ভাড়া বাসায় থাকতেন। বৃদ্ধ মা বাবা পটুয়াখালী দুমকীতে নীজের বাড়িতে থাকতেন। মা-বাবার সকল খরচ এবং অনার্স পড়ুয়া ছোট ভাইয়ের সকল খরচ তিনি বহন করতেন। বসতবাড়ি ছাড়া তাদের কোন জমি নেই। একমাত্র আয়ের উৎস মিলন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মারা যাওয়ায় পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়ে এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

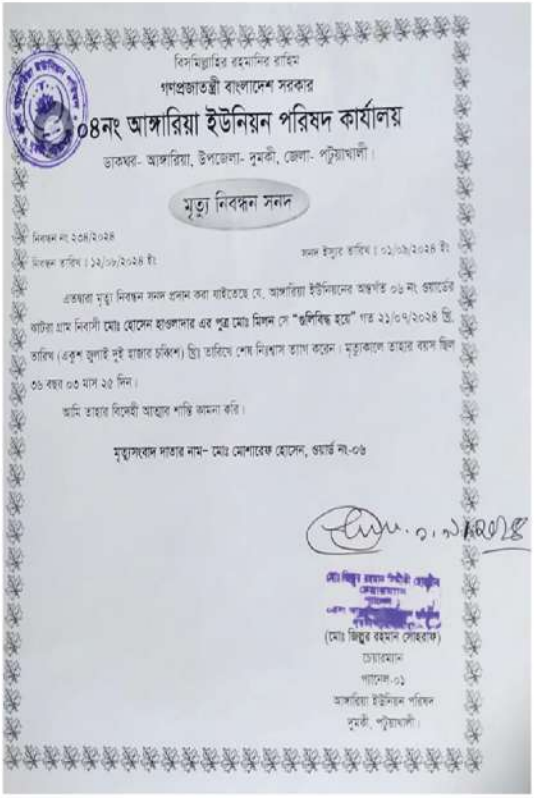

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৪নং আঙ্গারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

ডাকঘর- আঙ্গারিয়া, উপজেলা- দুমকী, জেলা- পটুয়াখালী।

মৃত্যু নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন নং ২০৪/২০২৪
নিবন্ধন তারিখ : ১২/০৯/২০২৪ ইং
সনদ ইস্যুর তারিখ : ০১/০৯/২০২৪ ইং

এতদ্বারা মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদান করা যাইতেছে যে, আঙ্গারিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত ০৬ নং ওয়ার্ডের ঝাটরা গ্রাম নিবাসী মোঃ হোসেন হাওলাদার এর পুত্র মোঃ মিলন সে "গুলিবিদ্ধ হয়ে" গত ২১/০৭/২০২৪ খ্রি. তারিখ (একুশ জুলাই দুই হাজার চব্বিশ) খ্রি তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ছিল ৩৬ বছর ০৩ মাস ২৫ দিন।

আমি তাহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

মৃত্যুসংবাদ দাতার নাম- মোঃ মোশারেফ হোসেন, ওয়ার্ড নং-০৬

(মোঃ জিল্লুর রহমান সোহরাব)
চেয়ারম্যান
প্যানেল-০১
আঙ্গারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
দুমকী, পটুয়াখালী।

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: মিলন
জন্ম তারিখ	: ২৬-০৩-১৯৮৮
পিতা	: মো: হোসেন হাওলাদার
মাতা	: মমতাজ বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ঝাটরা, ইউনিয়ন: আঙ্গারিয়া, থানা: দুমকি, জেলা: পটুয়াখালী
সন্তান	: ২ জন ১. দ্বীন ইসলাম (৯ বছর) ২. সুমাইয়া ইসলাম (১ বছর ৬ মাস)
পেশা	: মাছ ব্যবসায়ী
ঘটনার স্থান	: চিটাগাং রোড
আহত হওয়ার সময়কাল	: দুপুর ১২টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ১২টা
আঘাতের ধরন	: বুকের বামপাশে গুলির আঘাত
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: 22°28'46.2"N 90°22'39.8"E

প্রস্তাবনা

১. বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২. এতিম দুই সন্তানের ভরন পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব নেওয়া
৩. অনার্স পড়ুয়া ভাইয়ের পড়াশনার খরচ বহন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৪. স্ত্রী ও পরিবারের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা

শহীদ মো. জসিম উদ্দিন

ক্রমিক : ৩৪৯
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩৭

আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর
থাকি সেথা সবে মিলে কেহ নাহি পর।
পাড়ার সকল ছেলে মোরা ভাই ভাই
একসাথে খেলি আর পাঠশালে যাই।
হিংসা ও মারামারি কভু নাহি করি,
পিতা-মাতা গুরুজনে সদা মোরা ডরি।
- বন্দে আলী মিঞা

শহীদ পরিচিতি

ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় আমাদের এই গ্রাম বাংলা। ৬৮ হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে ওঠেছেন অপরুপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এই বাংলাদেশ। হাজার ও গ্রামের ভিতর পটুয়াখালির দুমকি থানার পাঙ্গাশিয়া তেমনি একটি গ্রাম। শত শত বছর ধরে গ্রামের সহজ সরল মানুষেরা সেখানে মিলেমিশে বসাবস করে যাচ্ছে। এই গ্রামের তেমনি একটি পরিবার হলো হাওলাদার পরিবার, যার কর্ণধার মো: সোবহান হাওলাদার। এই পরিবারের মুখ আলোকিত করে ১৯৮৫ সালের ১০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন একজন নবজাতক। মাতা পিতা ভালোবেসে নাম রাখেন মো: জসিম উদ্দিন। তিন সন্তানদের নিয়ে সুখে শান্তিতে চলছিল মো: সোবহান হাওলাদার এবং তার স্ত্রী রাবেয়া বেগমের সংসার।

প্রবাহমান জীবনের শৈশব, কৈশোর কাটিয়ে তাগড়া যুবক জসীম উদ্দিন অবশেষে সরলা নারী রুমা বেগমকে বিয়ে করেন। ইতিমধ্যে জসীম উন্নত জীবনের আশায় শহরে পাড়ি জমান। তাদের সংসার আলোকিত করতে জন্ম নেয় দুই মেয়ে এবং এক সন্তান। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তিনি রাজধানীর আদাবর থানার অন্তর্গত সেখেরটেক, শ্যামলী হাউজিং সোসাইটিতে বসবাস করতেন। তিন সন্তান ও স্ত্রী সহ তার মধ্যবিত্ত পরিবার ছিলো যেন এক টুকরো সুখের নীড়। তার দুচোখ জুড়ে খেলা করতো সন্তানগুলোকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন। সেজন্য তিনি দিনরাত এক করে ড্রাইভিং পেশাকে বেছে নিয়ে হাল ধরেছিল পরিবারের।

পারিবারিক অবস্থা

মূলত মো. জসিম উদ্দিন পরিবার নিয়ে ঢাকায় এবং তার বৃদ্ধ মা-বাবা গ্রামের বাড়িতে থাকতেন। পরিবার ও মা-বাবার সকল খরচ জসিম উদ্দিনের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলো। বাড়িতে বসতভিটা ছাড়া বাহিরে কোন জমি বা সম্পদ ছিল না। এদিকে হঠাৎ করে একদিন তার পূর্বের বাড়ি ও জমি ভেঙে পায়রা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, তার বাবার দেওয়া কিছু অর্থ এবং নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে জমি ক্রয় করে একটি বসতভিটা তৈরি করেন। সেখানে তার মা-বাবা বসবাস করতেন তবে সেটার অবস্থাও জীর্ণ শীর্ণ। এই করুণ অবস্থার ভিতর দিয়ে দিনাতিপাত করছিল জসিম উদ্দিনের মাতা-পিতা। অন্যদিকে ড্রাইভিং করে নুন আনতে পানতা ফুরানোর মতো করে চলছিল জসীম উদ্দিনের শহরের সংসার। সামান্য রোজগার দিয়ে তিনি না পারতেন স্ত্রী,সন্তানদের চাহিদা মেটাতে বা গ্রামে বসাবসরত পিতামাতার।

ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই '২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হচ্ছিলো ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক, পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু আর হাতের মেহেদীর রঙ শুকাবার আগে অনেকেই হয়েছিলো বিধবা। এসব দেখে দেশের সাধারণ মানুষও চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তাদের মধ্যে একজন হলেন ড্রাইভার জসীম উদ্দিন, যিনি মজলুম ছাত্র-জনতার মুখে নিজের সন্তানদের ছাপ দেখতে পেতেন। তাই বিবেকের কাছে হার মেনে ড্রাইভিং বাদ দিয়ে প্রতিদিনই শামিল হতেন আন্দোলনে। সে সময় চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। এক পর্যায়ে এই আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সারাদেশে ঢল নামে ছাত্র-জনতার। মুখে মুখে আন্দোলিত হতে থাকে হাসিনার পতনধ্বনি।

এই ঘটনার পরিক্রমায় ১৯ জুলাই ২০২৪, জুমাবার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড যান জসীম উদ্দিন। সেখানে দিনভর ছিল গোলাগুলি। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও খুনী আওয়ামী লীগের বিতর্কিত সংস্থা রাস্তায় ছিল তৎপর। ছাত্ররা তারপরেও রাস্তায় অবস্থান ধরে রেখেছিল। সরকারী দলের তাণ্ডবে রাজপথ রক্তাক্ত হচ্ছিল। হাসপাতাল গুলো আহত ও লাশে ভরছিল। সন্ধা ৬ টার সময় পুলিশের গুলিতে আল্লাহ করিম মসজিদের সামনে আহত হন জসীম উদ্দিন । একটি গুলি ফুসফুসে এবং আঙ্গুলে লেগে সেখান থেকে দুইটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে জসীম উদ্দিন, অবশেষে ছাত্ররা ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায় তাকে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের

MD. JASIM UDDIN
10 Oct 1986
508 069 3202

বক্ষব্যাধি বিভাগে ৯ দিন চিকিৎসারত অবস্থায় ২৯ জুলাই ২০২৪, রাত ৯ টায় মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে শহীদি কাফেলায় একটি নাম সংযুক্ত হয় শহীদ মো. জসীম উদ্দীন।

সর্বোপরি, ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র-জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে পরের দিন। এরই মধ্যে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়। কিন্তু সেই মুক্ত দেশের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ মোঃ জসীম উদ্দিন। তারই জন্য কবি হয়তো লিখেছিল-

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি

কথায় আছে, "A man does not live in years but in deeds" এটিই যথার্থ জসীম উদ্দিনের বেলায়। জসিম উদ্দিনের প্রতিবেশি মিজানুর রহমান বলেন, জসিম উদ্দিন ছেলে হিসেবে খুবই ভালো। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতো। কারো সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো না। তাছাড়া এলাকার সকল মানুষ একই কথা বলেছে জসীম উদ্দিন সম্পর্কে ।

জসিম উদ্দিনের স্ত্রী মোসা. রুমা বেগম বলেন, আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিলো। কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে নাই। গ্রামের সবার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো তার। এমনকি সে টাকা পয়সা জমা করে নাই সব সময় বলতো আল্লাহ আমাদের খাওয়াবে চিন্তা করবা না।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar, Birth and Death Registration
Pangashia
Dumki, Patuakhali
(Rule 11, 12)
মৃত্যু নিবন্ধন সনদ / Death Registration Certificate

Date of Registration 19/08/2024 | Death Registration Number 19857815588106569 | Date of Issuance 21/08/2024

Date of Birth	: 10/10/1985	Sex : Male	
Date of Death	: 29/07/2024		
In Word	: Twenty Ninth of July Two Thousand Twenty Four		
নাম	: মোঃ জসিম হাওলাদার	Name	: Md Jasim Howlader
মাতা	: রাবেয়া বেগম	Mother	: Rabeya Begum
মাতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
পিতা	: মোঃ সোবাহান হাওলাদার	Father	: Md Sobahan Howlader
পিতার জাতীয়তা	: বাংলাদেশী	Nationality	: Bangladeshi
মৃত্যুস্থান	: পটুয়াখালী, বাংলাদেশ	Place of Death	: Patuakhali, Bangladesh
মৃত্যুর কারণ	: হত্যা	Cause of Death	: Murder

Seal & Signature
Assistant to Registrar
(Preparation, Verification)
Md. Rubel Mridha

Seal & Signature
Registrar
MD. NAZRUL ISLAM
Chairman
1No. Pangashia Union Parishad

This certificate is generated from bdris.gov.bd, and to verify this certificate, please scan the above QR Code & Bar Code.

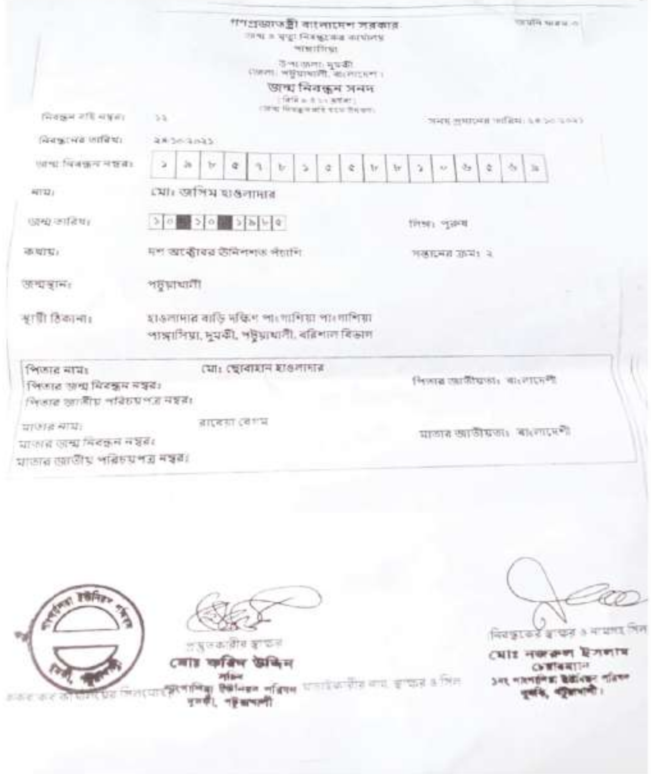
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
পাঙ্গাশিয়া
উপজেলা: দুমকী
জেলা: পটুয়াখালী, বাংলাদেশ।
জন্ম নিবন্ধন সনদ

জন্ম নিবন্ধন নম্বর: ১ ৯ ৮ ৫ ৭ ৮ ১ ৫ ৫ ৮ ৮ ১ ০ ৬ ৫ ৬ ৯
নাম: মোঃ জসিম হাওলাদার
জন্ম তারিখ: ১০ ১০ ১৯৮৫ — লিঙ্গ: পুরুষ
কথায়: দশ অক্টোবর উনিশশত পঁচাশি — সন্তানের ক্রম: ২
জন্মস্থান: পটুয়াখালী
স্থায়ী ঠিকানা: হাওলাদার বাড়ি দক্ষিণ পাংগাশিয়া পাংগাশিয়া পাঙ্গাসিয়া, দুমকী, পটুয়াখালী, বরিশাল বিভাগ
পিতার নাম: মোঃ ছোবাহান হাওলাদার — পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
পিতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:
মাতার নাম: রাবেয়া বেগম — মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার জন্ম নিবন্ধন নম্বর:
মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

মোঃ ফরিদ উদ্দিন
সচিব
মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: জসিম উদ্দিন, জন্ম: ১০-১০-১৯৮৫
পেশা	: ড্রাইভার
পিতা	: মো: সোবহান হাওলাদার
মাতা	: রাবেয়া বেগম
ঠিকানা	: গ্রাম: পাঙ্গাশিয়া, ইউনিয়ন: পাঙ্গাশিয়া, থানা: দুমকি, জেলা: পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: মহল্লা: সেথেরটেক, শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি, থানা: আদাবর, জেলা: ঢাকা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন ১. স্ত্রী: মোসা. রুমা বেগম ২. মেয়ে: মোসা. লামিয়া (বয়স: ১৭, একাদশ) ৩. মেয়ে: রিয়ামণি (বয়স- ১১, হিফজ) ৪. ছেলে: জুবায়ের ইসলাম তানজিম (বয়স-৮ মাস)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: মোহাম্মদপুর আল্লাহ করিম মসজিদ, ২৯ জুন রাত ৯ টা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
নিহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, ১৯/০৭/২০২৪
সমাধি	: পাঙ্গাশিয়া, দুমড়ি,পটুয়াখালী

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মারা যাওয়ায় তার পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎসটি বন্ধ হয়ে গেছে। মো. জসিমের স্ত্রী দুকন্যা ও আট মাসের একমাত্র ছেলে নিয়ে অসহয় অবস্থায় দিনযাপন করছে, যাদের বুক জুড়ে রয়েছে শুধু হাহাকার।

১. স্ত্রীকে শিক্ষকতার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়া
২. সন্তানদের শিক্ষার খরচের ব্যবস্থা করা
৩. স্ত্রী সন্তানদের জন্য বাসস্থানের ব্যাবস্থা করা

শহীদ মোঃ নবীন তালুকদার

ক্রমিক : ৩৫০

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৩৮

জন্ম-পরিচয়

১৯৭৯ সালের এক অজপাড়াগাঁ, পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ইন্দ্রকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মোঃ নবীন তালুকদার। তার জীবন শুরু হয় এক কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে। মাত্র তিন বছর বয়সেই হারান বাবাকে, যিনি ছিলেন তার জীবনের প্রথম ছায়া। বাবার মৃত্যু পরিবারকে নিক্ষেপ করে গভীর এক অনিশ্চয়তার মধ্যে। অথচ ছোট্ট নবীন বুঝতেও পারেনি তখন, কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তার শৈশব।

মায়ের কোলে থেকেও নবীন বেড়ে ওঠেন নানা বাড়ির মায়াময় পরিবেশে। তার মেজো মামা সৈয়দ খলিলুর রহমান হন তার জীবনের প্রধান অভিভাবক। মামার তত্ত্বাবধানে ছোটবেলার দিনগুলো কাটতে থাকে। গ্রামের মেঠোপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে শৈশবের সরলতা এবং কষ্টের ভার বহন করতেন নবীন। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বেড়ে ওঠা এই তরুণের শৈশব ছিল অভাবের সাথে এক অন্তহীন সংগ্রাম।

পড়াশোনা শেষ করার পর নবীন তার জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে ব্যবসায় নামেন। তিনি ধীরে ধীরে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেন, পরিবারকেও স্থিতিশীল এক অবস্থায় নিয়ে যান। ঢাকার শ্যামপুরে পরিবার নিয়ে নতুন জীবনের সূচনা করেন নবীন। সেখানে তিনি তার কর্মের পাশাপাশি রাজনীতিতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। বাউফলের মেঠোপথে হাঁটা সেই গ্রামীণ যুবক হয়ে ওঠেন শহরের এক সংগ্রামী নেতা। ঢাকায় বসবাস করার সুবাদে নবীন নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। বিশেষ করে যুবদলের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দেশের প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে নবীন ছিলেন সামনের কাতারে। গ্রামের সরল জীবন থেকে উঠে আসা এই সংগ্রামী তরুণ, যিনি শৈশবের দারির্দ্য আর বাবার শূন্যতাকে জীবনের শক্তি বানিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, পরিণত হন একজন অদম্য যোদ্ধায়। নবীনের জীবনের গল্প কেবল একজন ব্যক্তির নয়; এটি একটি প্রজন্মের প্রতীক, যারা দারিদ্র্যকে জয় করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস রাখে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

নবীন তালুকদার ছিলেন পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করে একটি ছোট মুদি দোকান পরিচালনা করতেন। পাশাপাশি গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ছিল তার একটি নার্সারি। তাঁর অদম্য পরিশ্রমে সংসারের চাকা ঘুরছিল। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুর পর যেন সবকিছু থমকে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে দোকান, নিশ্চুপ হয়ে আছে নার্সারির সবুজ প্রান্তর। পরিবারটি যেন এক গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। তার মৃত্যুর পর পরিবারটির দুর্দশা অসীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতে রয়েছে দুই শিশু–এক ছেলে ও এক মেয়ে; যারা এখনও শিক্ষার পথে এগিয়ে চলেছে। তাদের স্বপ্ন যেন মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতে বসেছে। ঘরে রয়েছেন এক বৃদ্ধা মা, যিনি নানাবিধ রোগের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য নেই কোনো অর্থের সংস্থান, নেই কোনো অবলম্বন। নবীন তালুকদারের অনুপস্থিতি যেন একটি বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে, যা কোনোভাবে পূরণ হওয়ার নয়।

শাহাদাতের ঘটনা

২০২৪ সালের ৫ জুন থেকে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই সারাদেশের ছাত্রসমাজ ও সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করে। শিক্ষার্থীরা সরকারের নিয়োগে কোটা ব্যবস্থা বাতিলের দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে, আর এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তে। ১৪ জুলাই, আওয়ামী লীগের সভাপতি স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা এক উসকানি মূলক বক্তব্যে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের "রাজাকার" আখ্যা দিলে বিক্ষোভ আরো উত্তাল হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু এর বিপরীতে সরকার ও তার মদদপুষ্ট সন্ত্রাসী বাহিনী একজোট হয়ে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করতে উঠে পড়ে লাগে। ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার দুপুরে পল্টন মডেল থানার অধীনে কালভার্ট রোডে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে পুলিশের নেতৃত্বে র‍্যাব, বিজিবি এবং আওয়ামী লীগ ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের সন্ত্রাসীরা বর্বরোচিত হামলা চালায়। গুলি, টিয়ার সেল, রাবার বুলেট, এবং গ্রেনেডের আঘাতে হতাহত হয় অসংখ্য মানুষ। এই রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্যে মো: নবীন তালুকদার মাথা ও শরীরে গুলিবিদ্ধ হন। তাকে দ্রুত ইসলামী ব্যাংক কাকরাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে সেলাইন দিতে ব্যর্থ হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা মেডিকেলের কর্তব্যরত ডাক্তাররা নবীনকে মৃত ঘোষণা করেন। নবীন তালুকদারের মৃত্যুর পর শুরু হয় আরেকটি প্রহসন। তার মৃতদেহকে অজ্ঞাতনামা হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলে, এমনকি তার লাশ গুম করার ষড়যন্ত্রও শুরু হয়। পুলিশের সহায়তায় ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করার চাপ দেয়া হয়। পল্টন, রমনা, এবং শাহবাগ থানায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ২০ জুলাই রাত ৮ টায় তার লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়। নবীনের পরিবারের সদস্যরা তার লাশ শ্যামপুরের ঢাকার বাসায় নিয়ে আসে, যেখানে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে নবীনের লাশ নিয়ে তার পরিবার পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ইন্দ্রকুল গ্রামে রওয়ানা দেয়। ২১ জুলাই সকাল ১০টায় নবীন তালুকদারকে তার নিজ গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। ছাত্র আন্দোলনের এই শহীদ রেখে গেলেন একটি অন্তহীন বেদনা, যে বেদনা আজো নবীনের পরিবার ও আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে।

আশিকুর রহমান ভাতিজা

"আমার চাচা ছিলেন সত্যিই এক মহান মানুষ। এলাকায় যারই কোনো বিপদ-আপদ আসত, তিনি সবার আগে পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর হৃদয় ছিল দরদে ভরা। তিনি শুধু নিজের পরিবারের জন্য নয়, পুরো এলাকাবাসীর জন্য নিবেদিত ছিলেন। এলাকার যুব সমাজকে ভুল পথে যেতে না দেওয়ার জন্য তিনি নানা ধরণের খেলাধুলা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতেন। তাঁর উদ্যোগে সবাই যেন ভালো কিছু করতে উৎসাহিত হতো। তাঁর অনুপস্থিতি আমাদের সবার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।"

সৈয়দ খলিলুর রহমানের মামা

"নবীন তালুকদার আমার প্রিয় ভাগিনা। তার বাবা যখন মারা যান, তখন ওর বয়স মাত্র তিন বছর। সেই থেকে আমি তাকে আগলে রেখেছি। পড়াশোনার যাবতীয় খরচ দিয়েছি, যাতে সে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে। সে আমার বাসায় থেকে এইচএসসি পাস করেছে। অত্যন্ত মেধাবী ছিল নবীন। ডিগ্রি পাস করার পর জগন্নাথ কলেজে মাস্টার্সে ভর্তি হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা শেষ করতে পারেনি। সে ছিল সবার প্রিয়, মানুষের সাথে মিশে চলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। রাজনৈতিকভাবে সে বিএনপির সক্রিয় কর্মী ও নেতা ছিল। তার আকস্মিক মৃত্যু আমাদের সবার জন্য এক অমোচনীয় শূন্যতা রেখে গেছে।" এভাবে এই কথাগুলোকে সাহিত্যিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হলো, যেখানে আবেগ এবং মানুষের ভালোবাসা তুলে ধরা হয়েছে

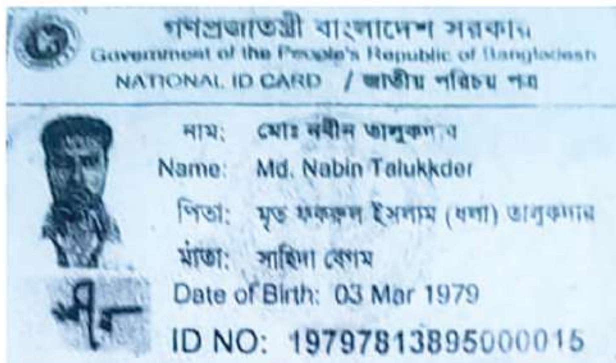

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: মো: নবীন তালুকদার
জন্ম সাল	: ০৩/০৩/১৯৭৯
পেশা	: ব্যবসা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ইন্দ্রকুল, ইউনিয়ন: সূর্যমনি, থানা, উপজেলা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
পিতা	: মৃত ফকরুল ইসলাম (ধলা) তালুকদার
মাতা	: মোছা. সাহিদা বেগম, বয়স: ৭০
শহীদের সন্তান সংখ্যা	: ২ জন
	১. মো: নূরনবী তালুকদার রুহান, ছাত্র: শ্যামপুর গভ: মডেল হাই স্কুল, নবম শ্রেনী, সম্পর্ক: ছেলে
	২. হাজেরা তালুকদার রুহানা, ১৪ বছর, শ্যামপুর গভ: মডেল হাই স্কুল, নবম শ্রেনী, সম্পর্ক: মেয়ে
আক্রমণকারী	: পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসী বাহিনী
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪
শাহাদাত স্থান	: পল্টন থানার সামনে
দাফন করা হয়	: পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনাসমূহ

১: সন্তানের পড়া লেখার দায়িত্ব নিলে ভালো হবে

২: পরিবারের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করলে ভালো হবে

শহীদ সাংবাদিক মোঃ মেহেদী হাসান

ক্রমিক : ৩৫১

আইডি : বরিশাল বিভাগ ৩৯

শহীদ পরিচিত

পেশাগত সাংবাদিক ও শহীদ মেহেদী হাসান ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ সালে হোসনাবা গ্রামে ধুলিয়া ইউনিয়নে বাউফল থানায় পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অসুস্থ বাবা-মার সেবায় কখনো অবহেলা করেনি শহীদ মেহেদী হাসান। এলাকাবাসীরা জানান মেহেদী হাসান একজন শিক্ষিত ও ভালো মানুষ ছিলেন। খুবই নম্র ও ভদ্রভাবে চলাফেরা করতেন। কখনো কারো সাথে খারাপ আচরণ করতেন না। মিশুক ও সদা হাসিখুশি ছিলেন তিনি। মেহেদী হাসান ঢাকা টাইমসের হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিটে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করতেন। এর আগে তিনি বেসরকারি টেলিভিশন নিউজ ২৪, দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দৈনিক বাংলাদেশের আলোয় কাজ করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী ও ঘাতক পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হন সোহরাওয়ার্দী কলেজের সাবেক মেধাবী শিক্ষার্থী সাংবাদিক মেহেদী হাসান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার গুলোর কষ্ট ও বেদনা আজ পুরো দেশের জনগণের কষ্টে পরিণত হয়েছে। তাদের স্ত্রী'রা পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তিকে দেশের জন্য

উৎসর্গ করেছেন। আগামীর বাংলাদেশ যেন এই শহীদদের স্বপ্নের আলোকে গড়ে তোলা হয় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদের ছোট ছোট সন্তানেরা পিতাকে হারিয়েছে, অসংখ্য স্বজন তার প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে আজ পাগল প্রায়। পরিবার গুলো আজ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম উদ্বিগ্ন। বর্তমান সরকার অবশ্যই এসব শহীদদের পাশে দাঁড়াবে।

নতুন দেশ গঠনে গণ অভ্যুত্থানের শহীদেরা আগামী প্রজন্মের তরুণদের প্রেরণার উৎস। হত্যাকারীদের বিচারের ব্যাপারে প্রতিটি পরিবার জোর দাবি তুলছে। দেশ ও জাতির অগ্রগতির স্বার্থে অবশ্যই প্রতিটি হত্যাকান্ডের বিচার হতে হবে। ন্যায়বিচার পাওয়া প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার উপায় নতুন প্রজন্ম জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। জাতির যেকোনো প্রয়োজনে ও ক্রান্তিকালে তারা সবসময় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তারা হাসিমুখে শাহাদাত বরণ করে শিখিয়ে গেলেন অন্যায় ও অসত্য কখনো চিরস্থায়ী হয়না স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সকলকে সবসময় প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে যেকোনো অসাধ্য সাধন করা সম্ভব, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তা আবারও প্রমাণ করেছে। মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার এই বিজয়ে কালিমা লেপন করার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। দেশ বিরোধী ফ্যাসিবাদ এবং আধিপত্য বিস্তারকারী অপশক্তি থেমে নেই। তাই গৌরবের বিজয়কে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সচেতন দেশবাসীকে সবসময় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে তা বিপ্লবী কলমযোদ্ধা শহীদ সাংবাদিক মো: মেহেদী হাসান বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে দেশে বসবাসরত নাগরিকদের বার্তা দিয়েছেন।

শহীদের পরিচয়

পেশাগত সাংবাদিক ও শহীদ মেহেদী হাসান ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ সালে হোসনাবা গ্রামে ধুলিয়া ইউনিয়নে বাউফল থানায় পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলেন তিনি। অসুস্থ বাবা-মার সেবায় কখনো অবহেলা করেনি শহীদ মেদহদী হাসান। এলাকাবাসীরা জানান মেহেদী হাসান একজন শিক্ষিত ও ভালো মানুষ ছিলেন। খুবই নম্র ও ভদ্রভাবে চলাফেরা করতেন। কখনো কারো সাথে খারাপ আচরণ করতেন না। মিশুক ও সদা হাসিখুশি ছিলেন তিনি। মেহেদী হাসান ঢাকা টাইমসের হয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) বিটে নিয়মিত দায়িত্ব পালন করতেন। এর আগে তিনি বেসরকারি টেলিভিশন নিউজ ২৪, দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দৈনিক বাংলাদেশের আলোয় কাজ করেছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী ও ঘাতক পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় নিহত হন সোহরাওয়ার্দী কলেজের সাবেক মেধাবী শিক্ষার্থী সাংবাদিক হাসান মেহেদী। তার অকাল মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা সোহরাওয়ার্দী কলেজ। তার এই আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতেই বদলে দেওয়া হয়েছে সোহরাওয়ার্দী কলেজের অডিটরিয়ামের নাম। শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষর করা আবেদনপত্রটি উপাধ্যক্ষের নিকট জমা দেওয়া হয়। যার ফলে সোহরাওয়ার্দী

কলেজে অডিটোরিয়ামের বর্তমান নাম শহীদ সাংবাদিক হাসান মেহেদী অডিটোরিয়াম। মেহেদী সোহরাওয়ার্দী কলেজের ডিগ্রির ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। অডিটোরিয়ামের নামকরণের বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকবর চৌধুরী বলেন, সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাংবাদিক সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পাশে ছিলেন সাংবাদিক মেহেদী হাসান। প্রথমে আহ্বায়ক কমিটি, প্রথম কার্যকরী পরিষদ এবং

বর্তমান কার্যকরী পরিষদেরও উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। আমাদের যেকোন ধরনের সুবিধা অসুবিধায় সবসময় পাশে পেয়েছিলাম তাকে। সাংবাদিকতায় তার পথচলা আমাদের অনুপ্রেরণা ও সাহস

জুগিয়েছে। আশা করি তার দেখানো পথ অনুসরণ করেই এগিয়ে যাবে সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাংবাদিক সমিতি।

এ বিষয়ে বাংলা বিভাগের আমিরুল ইসলাম নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, সোহরাওয়ার্দী কলেজের অডিটোরিয়াম নামকরণের মাধ্যমে অমর হয়ে থাকবে মেহেদীর নাম। সাধারণ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি নবাগত যেসব শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে আসবে তারাও জানবে শহীদ মেহেদীর আত্মত্যাগের কথা। এটা আসলে শিক্ষার্থীদের আবেগের জায়গা। তরুণ প্রজন্ম চায় তার এই আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক। তার সম্মানার্থে এ স্মৃতিকে ধরে রাখতে হবে। এমনকি বর্তমান শিক্ষার্থীদেরও অনুপ্রাণিত করবে ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে তার এই মহান আত্মত্যাগ।

প্রসঙ্গত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে গত ১৮ জুলাই বিকেলের দিকে রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে অবস্থিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের কাছে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ঘাতক পুলিশের গুলিতে আহত হন তিনি। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার শরীরে ৯৮ টি বুলেট ও ৪ টি গুলি পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এভাবেই কোটা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে একজন জাতির বিবেকখ্যাত সাংবাদিক মেহেদী শাহাদাত বরণ করেন।

পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার ধুলিয়া ইউনিয়নের হোসনাবাদ গ্রামের বাড়িতে কথা হয় তার বাবা মোশারেফ হোসেন হাওলাদারের সঙ্গে। তিনি বলেন আমি অসুস্থ ও অসহায়। আমার কোনো আয় রোজগার নেই। আমি চারবার স্ট্রোক করছি, মেহদী আমাকে ডাক্তার দেখিয়েছে। ছেলের স্বপ্ন ছিল বাবা-মারে ওমরা হজ করাইয়া ঘরের কাজ ধরবে। আস্তে আস্তে সব দেনা পরিশোধ করবে। এগুলোই ওর স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন তো ভেঙে গেল। বুকে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ছেলেকে হারিয়ে নির্বাক বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবা। বিলাপ করছেন মা-বোন।

বাড়ির উঠানেই মেহেদী হাসানের মরদেহ দাফন করা হয়েছে। পাকা সড়কের পাশেই দোচালা টিনের ঘর ভেঙে কিছুদিন আগে মেহেদী তৈরি করেছেন আধা পাকা টিনশেড বাড়ি। তবে এজন্য মেহেদীকে স্থানীয় একটি এনজিও থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। প্রতি মাসে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই অভাব অনটনে বেড়ে ওঠা মেহেদী ছিলেন পরিবারের সবার প্রিয়। তিন ভাইয়ের মধ্যে মেহেদী সবার বড়। তাই তার প্রতি সবার যেমন বাড়তি ভালোবাসা তেমনি মেহেদীও ছিলেন পরিবারের প্রতি আন্তরিক। মেহেদীর বেড়ে ওঠা এবং তার বিভিন্ন স্মৃতি এখনো কাঁদাচ্ছে স্বজন ও এলাকাবাসীদের। মেহেদীর খালা শাহানুর বেগম বলেন মেহেদী হাসানের ছয় মাস ও তিন বছর বয়সী দুই কন্যা রয়েছে। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ঢাকার কেরাণীগঞ্জ এলাকায় বসবাস করতেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য

মেহেদী খুব ভালো ছেলে ছিলো। তার বাবা মার দায়িত্বশীল ছিলো। সর্বশেষ ৮ বছর তার বাবার চিকিৎসার ভার বহন করে। মারা যাবার আগের দিনও তার বাবার চিকিৎসার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল শহীদের মামাতো ভাই মোঃ হাসান।

স্ট্রোকের রোগী আমি, তিনটা ব্লক আছে আমার হার্টে। মেহেদীর স্বপ্ন ছিল আমার হার্টের অপারেশন করাবে। আমার মেহেদীর সব স্বপ্ন ভেঙে গেছে। প্রতি মাসেই আমার ওষুধ লাগে। আমার ছেলেটাও নেই আমার ওষুধও নেই। কে আমারে ওষুধ কিনে দেবে? কে আমারে দেখবে? কে আমার সংসার চালাবে? এখন আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি।

এক নজরে শহীদ সাংবাদিক মেহেদী হাসান

নাম	: মেহেদী হাসান
পেশা	: সাংবাদিক
পেশাগত পরিচয় ও কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: ঢাকা ট্রিবিউট
জন্ম	: ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: হোসনাবাদ, ইউনিয়ন: ধুলিয়া, থানা : বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
পিতা	: মোশাররফ হোসেন
পেশা ও বয়স	: অবসরপ্রাপ্ত ও ৬০
মাতা	: মাহমুদা বেগম
পেশা ও বয়স	: গৃহিণী ও ৪৫
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৭
আহত হওয়ার স্থান, তারিখ ও সময়	: মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, যাত্রাবাড়ী; ১৮ জুলাই ২০২৪, বিকাল
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
শাহাদাতের স্থান, তারিখ ও সময়	: মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভার, যাত্রাবাড়ী; ১৮ জুলাই ২০২৪, বিকাল

প্রস্তাবনা

১। শহীদ পিতা মোশাররফ হোসেনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

২। শহীদ সাংবাদিক মেহেদী হাসানের আদরের দুই মেয়ের দায়িত্বভার ও দেখাশোনা করা

শহীদ মো: সাইদুর রহমান ইমরান

ক্রমিক : ৩৫২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪০

শহীদ পরিচিতি

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম শহীদ সাইদুর রহমান ইমরান পটুয়াখালীর জেলার বাউফল উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের উত্তর বড় ডালিমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইমরানের বাবা জনাব কবির হোসেন পেশায় শ্রমজীবী। বিভিন্ন দোকানে কাজ করে উপার্জন করেন। মা লাভলী বেগম পেশায় গৃহিণী। ভাইদের মধ্যে শহীদ সাইদুর রহমান দ্বিতীয়। বড় ভাই তৌফিকুর রহমান লিমন গুলবাগ মাদ্রাসায় আলিম পরিক্ষার্থী। ছোট ভাই মাহমুদুর রহমান মাহিম ধোলাইপাড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। শহীদ সাইদুর রহমান এর বাবা প্রতিদিন যে আয় করেন তা দিয়ে তার সংসার চালানো কষ্টকর হয়ে পড়ে। সংসার চালানোর পাশাপাশি তিন ছেলের লেখাপড়া করানো প্রায় অসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে মেজো ছেলে শহীদ সাইদুর রহমান ইমরান দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করে তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। সংসারের অভাবের কারণে তার লেখাপড়ার এখানেই ইতি ঘটে। একদিকে সংসার এবং অন্যদিকে ছোট ভাই ও বড় ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ চালানোর জন্য তিনি ঢাকায় বাইতুল মোকাররম মার্কেটে একটি কার্পেটের দোকানে কর্মচারী হিসেবে যোগ দেয়। মা-বাবা ও ভাইসহ তার পরিবার মীর হাজিরবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাদের গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে নিজস্ব কোন জমি জমা নেই।

যেভাবে ঝরে গেল একটা তাজা প্রান

জুলাই-আগস্ট '২৪ সরকারের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

অতীতের যেকোনো ন্যায্য আন্দোলনেই এই ফ্যাসিস্ট সরকার বাধা প্রদান করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে কিছু ছাত্র বেশি সুবিধাভোগী হয় এবং অধিকাংশই সুবিধা বঞ্চিত থেকে যায়। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ন্যায্য আন্দোলনের দাবি নিয়ে ২০১৮ সালে ছাত্র অধিকার পরিষদ গঠিত হয়। প্রচণ্ড আন্দোলনের দাবির মুখে সরকার কোটা ব্যবস্থার সংস্কার না করে কোটা পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। মূলত, ২০২৪ সালে এসে একটি রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোটা পুনর্বহাল ঘোষিত হলে ছাত্ররা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ছাত্রদের দাবি ছিল কোটা ব্যবস্থা ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী যৌক্তিক সমাধান দেওয়া। সরকার এই যৌক্তিক আন্দোলনে ভ্রুক্ষেপ না করায় আন্দোলনের গতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ছাত্ররা জুলাইয়ের শুরু থেকে খুবই শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ন্যায্য দাবি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। ফ্যাসিস্ট সরকার যেকোনো আন্দোলনকেই ধামাচাপা দিতে তাদের উপর স্বৈরাচারী পুলিশবাহিনী, সন্ত্রাসী আওয়ামী যুবলীগ ও ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দিত। ১৭ জুলাই ছাত্রদের কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারে জমা হতে শুরু করে। বিকেল গড়াতেই স্বৈরাচারী সরকার ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে দেশি-বিদেশী অস্ত্র হাতে সন্ত্রাসী যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও গুণ্ডালীগকে ভাড়া করে নিয়ে আসে ছাত্রদেরকে দমন করার জন্য। ছাত্ররা মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আসলে সন্ত্রাসীরা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে। নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর সেদিন গুণ্ডাবাহিনী রামদা, হকিস্টিক এবং দেশীয় অস্ত্র হাতে নিয়ে হেলমেট পড়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপরে উপর্যুপরি নির্যাতন করতে থাকে। সেদিন হাজার হাজার শিক্ষার্থীর রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। আহত শিক্ষার্থীদের ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেলে সেখানেও চলে ছাত্রলীগের তাণ্ডবলীলা। সেদিন শিক্ষার্থীরা কোথাও নিরাপদ ছিল না। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার সেদিন ছাত্রদেরকে দমাতে পারেনি বরং ছাত্ররা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে মাঠে নেমে পড়ে। রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় যাত্রাবাড়ী হানিফ ফ্লাইওভারের নিচেও ছাত্র-জনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনে প্রতিদিনই শহীদের সংখ্যা বেড়ে চলে। শহীদ সাইদুর রহমান সেই শহীদদের একজন। কে জানতো! বিজয়ের দিনেই সকলের মায়া ত্যাগ করে চলে যাবেন রবের দরবারে। ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তপ্ত হয় পুরো ঢাকা শহর। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হওয়ার প্রস্তুতি নেন শহীদ ইমরান। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে মা নাজনীন বেগমকে বলেছিলেন, 'মা দেশ কিন্তু স্বাধীন হবেই, প্রয়োজনে ছাত্রসমাজের জন্য শহীদ হব।' এই কথা শোনার পর ইমরানের মা তার হাত ধরে বলেছিলেন, 'আজকে বাসা থেকে বের হইস নাহ বাবা।' মায়ের কোনো কথা না শুনেই বাসা থেকে বের হয়ে যায় ইমরান। শহীদ ইমরান যাত্রাবাড়ী এলাকায় আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার সাথে শামিল হয়ে যান। বেলা বাড়ার সাথে সাথেই ছাত্র-জনতার ঢল নেমে আসে। মুক্তিকামী জনতার ন্যায্য আন্দোলন কে নস্যাৎ করার জন্য পুলিশ এবং সন্ত্রাসী যুবলীগ এলোপাথাড়িভাবে রাবার বুলেট, টিয়ারশেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়তে থাকে। ইমরান মিছিলের সামনে থাকায় কয়েকটা গুলি তার মাথায় এবং গলায় বিদ্ধ করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। সাথে সাথেই রাস্তায় ঢলে পড়ে শহীদ ইমরান। ছাত্র-জনতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইমরানকে উদ্ধার করে ইউনিকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যায়। ততক্ষণে তার জীবনের প্রদীপ নিভে গিয়েছিলো। ৫ আগস্ট রাত ১১ টার দিকে ইমরানের মরদেহ গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে নিয়ে আসা হয়। পরের দিন ৬ আগস্ট সকাল ১০ টার দিকে জানাজা শেষে জোমাদ্দার বাড়ি মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

"ছেলে হিসেবে সাইদুর রহমান ইমরান খুবই ভালো ছিলো। নিয়মিত নামাজ পড়তো। কারো সাথে ঝগড়া করতো না। বিপদে জড়াতো না, সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বলতো।"

শহীদের চাচাতো ভাই, মো: বেলাল হোসেন জোমাদ্দার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়েছেন মো: ইমরান হোসেন (১৮)। বাসা থেকে বের হওয়ার আগে মা নাজনীন বেগমকে বলেছিল, 'মা দেশ কিন্তু স্বাধীন হবেই, প্রয়োজনে ছাত্রসমাজের জন্য শহীদ হব।' এই কথা শোনার পর ইমরানের মা হাত ধরে বলেছিলেন, 'আজকে বাসা থেকে বের হইস নাহ বাবা। 'মায়ের কোনো কথা না শুনেই বাসা থেকে বের হয়ে যায় ইমরান। তবে আর বাসায় ফেরা হয়নি তার। শহীদ হয়েছেন তিনি।

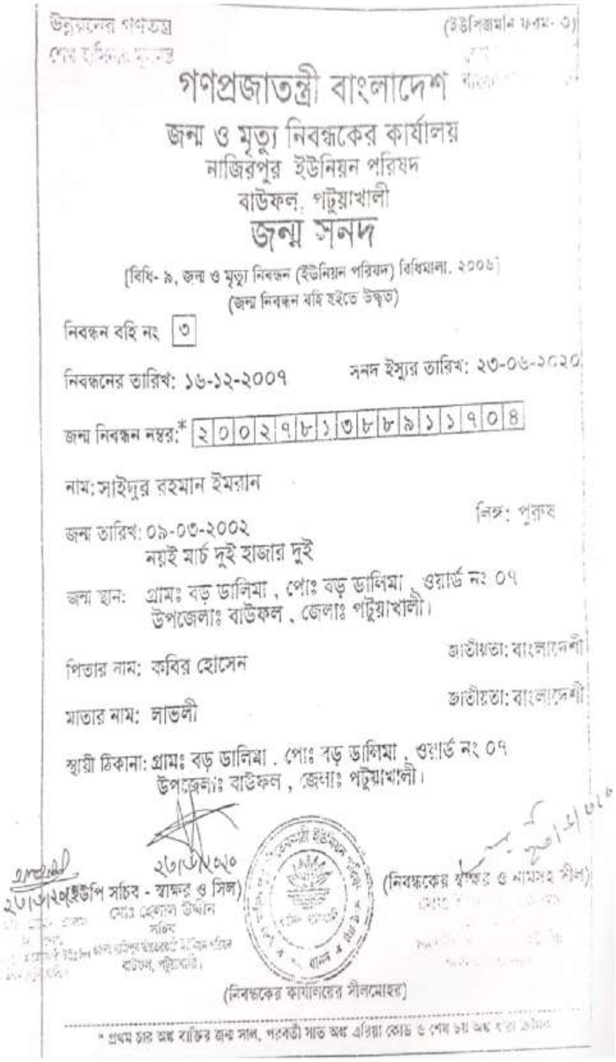

(ইউপিজন্মম ফরম- ৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

নাজিরপুর ইউনিয়ন পরিষদ

বাউফল, পটুয়াখালী

জন্ম সনদ

[বিধি- ৯, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০০৬]

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্বৃত)

নিবন্ধন বহি নং ৩

নিবন্ধনের তারিখ: ১৬-১২-২০০৭ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৩-০৬-২০২০

জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ২০০২৭৮১৩৮৮৯১১৭০৪

নাম: সাইদুর রহমান ইমরান

লিঙ্গ: পুরুষ

জন্ম তারিখ: ০৯-০৩-২০০২

নয়ই মার্চ দুই হাজার দুই

জন্ম স্থান: গ্রামঃ বড় ডালিমা, পোঃ বড় ডালিমা, ওয়ার্ড নং ০৭

উপজেলাঃ বাউফল, জেলাঃ পটুয়াখালী।

পিতার নাম: কবির হোসেন জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: লাভলী জাতীয়তা: বাংলাদেশী

স্থায়ী ঠিকানা: গ্রামঃ বড় ডালিমা, পোঃ বড় ডালিমা, ওয়ার্ড নং ০৭

উপজেলাঃ বাউফল, জেলাঃ পটুয়াখালী।

(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সিল)

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সীল)

(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

* প্রথম চার অঙ্ক ব্যক্তির জন্ম সাল, পরবর্তী সাত অঙ্ক এরিয়া কোড ও শেষ ছয় অঙ্ক ক্রমিক

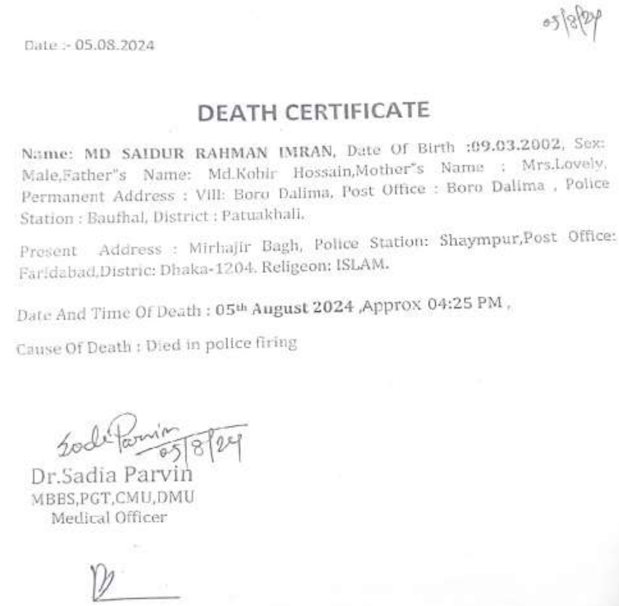

Date :- 05.08.2024

DEATH CERTIFICATE

Name: MD SAIDUR RAHMAN IMRAN, Date Of Birth :09.03.2002, Sex: Male,Father"s Name: Md.Kobir Hossain,Mother"s Name : Mrs.Lovely, Permanent Address : Vill: Boro Dalima, Post Office : Boro Dalima , Police Station : Baufhal, District : Patuakhali.

Present Address : Mirhajir Bagh, Police Station: Shaympur,Post Office: Faridabad,Distric: Dhaka-1204. Religeon: ISLAM.

Date And Time Of Death : 05th August 2024 ,Approx 04:25 PM ,

Cause Of Death : Died in police firing

Dr.Sadia Parvin

MBBS,PGT,CMU,DMU

Medical Officer

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: সাইদুর রহমান ইমরান, জন্ম: ০৯-০৩-২০০২
পেশা	: কার্পেট দোকানের কর্মচারী
পিতা	: কবির হোসেন, পেশা: শ্রমজীবী
মাতা	: লাভলী বেগম, পেশা: গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বড় ডালিমা, ইউনিয়ন: নাজরিপুর, থানা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: মীর হাজিরবাগ, শ্যামপুর, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার এর নিচে
শহীদ হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন

পারিবারিক সহোযোগিতা প্রস্তাবনা

১. ইমরানের দুই ভাইয়ের পড়াশুনার ব্যাবস্থা করা

২. পরিবারটির পাশে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া

শহীদ জিহাদ হোসেন

ক্রমিক : ৩৫৩

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ জিহাদ হোসেন পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা সদরের মোল্লা পট্টি এলাকার নুরুল আমিন মোল্লা ও শাহিনুর বেগমের ছেলে। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার ছোট। তাঁর জন্ম ২০০০ সালের ১৪ মার্চ। শহীদ দশমিনা সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০১৬ সালে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পাশ করেন। এরপর রাজধানীর ওয়ারী এলাকায় স্যার সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে ২০১৮ সালে এইচএসসি শেষে করেন। সরকারি কবি নজরুল কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক শেষ করে একই বিভাগে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নরত ছিলেন শহীদ জিহাদ হোসেন।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

প্রত্যক্ষদর্শী সহপাঠী, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার বিকাল ৩.৩০ টায় কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে যাত্রাবাড়ী এলাকায় দনিয়া কলেজ ও কাজলা ফুটওভার

দৈনিক ইত্তেফাক

আহত এক জনকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হচ্ছে —ইত্তেফাক

রাজধানীর বাইরে ২৪ জেলায়

ব্রিজের মাঝামাঝি রাস্তায় বুকের ডান পাঁজরে গুলিবিদ্ধ হন জিহাদ। গুরুতর আহত অবস্থায় সহপাঠী ও বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করে ওই এলাকার সালমান হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠান। সেখানে ভর্তির কিছুক্ষণ পর বিকেল ৪.৪৫ এর দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢামেক মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে ২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় আবৃত কফিনে শহীদ জিহাদের মরদেহ বাড়িতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ২১ জুলাই রবিবার ভোরে দশমিনা সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় চত্বরে শহীদের জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। মেধাবী এই ছাত্রের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কান্নার রোল যেন থামছেই না। ছেলের ছবি বুকে চেপে রেখেছেন মা। বাবা শোকে বাকরুদ্ধ। বড় এক ভাই ও দুই বোনও যেন শোকে পাথর। মা শাহিনুর বেগম (৫০) আদরের ছোট ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায়। তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে আক্ষেপ করে বলেন 'বাবা জিহাদ, মৃত্যুর সময় তুমি কেমন করছিলা! আমাকে মা মা করে ডাকছিলা! বাবাগো আমিতো বাড়িতে ছিলাম। তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারি নাই।' জিহাদকে হারিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন তাঁর বাবা নুরুল আমিন (৫৭)। শোকে বাকরুদ্ধ বড় ভাই জিন্নাত হোসেন (২৮) এবং দুই বোন জান্নাতুল ফিরদাউস (৩৩) ও জয়নব (৩০)। তাঁকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন ছিল পরিবারের। এমন মৃত্যু কিছুতেই মানতে পারছেন না।

অনুভূতি প্রকাশ

কান্না জড়িত কণ্ঠে জিহাদের বাবা নুরুল আমিন মোল্লা বলেন, 'আমার ছেলে জিহাদ মেধাবী ছাত্র ছিল। কেমনে কি হয়ে গেল জানি না। আমার ছেলেকে যারা খুন করেছে আমি তাদের বিচারের দাবি জানাই।'

মা শাহিনুর বেগম বলেন, 'আমার মতো আর কোনো মায়ের বুক যেন এভাবে খালি না হয়। আপনারা আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন।'

বড় বোন জান্নাতুল বলেন, 'দেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় করতে গিয়ে আমার ছোট ভাই জীবন উৎসর্গ করেছে।'

বড় ভাই জিন্নাত হোসেন বলেন, '১৯ জুলাই বিকেল ফোন করে বলে আমার বুকে গুলি লেগেছে বাবা-মাকে বলিস না। ওই ছিল ছোট ভাই জিহাদের সঙ্গে শেষ কথা। জিহাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছে। দেশে বিদ্যমান স্বৈর সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, আন্দোলন করেছে। আগামীর বাংলাদেশ যেন সুন্দর হয়, দুর্নীতিমুক্ত হয়। যুগ যুগ ধরে আগামী প্রজন্ম যেন আমার ভাইয়ের এ অবদান মনে রাখে। যে স্বৈরতন্ত্র শেখ হাসিনা কায়েম করেছিল অন্য কোনো দল ভবিষ্যতে এ ধরনের চেষ্টা যেন না করে। তাহলেই আমার ভাই ভালো থাকবে। আমার ভাইয়ের আত্মাও শান্তি পাবে।'

এক নজরে শহীদ জিহাদ হোসেন

নাম	: শহীদ জিহাদ হোসেন
জন্ম	: ২০০০ সালের ১৪ মার্চ
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা সদরের মোল্লা পট্টি এলাকা
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার, বিকাল ৩.৩০টা, যাত্রাবাড়ী কাজলা ফুটওভার ব্রিজ
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই, ২০২৪ শুক্রবার, বিকাল ৪.৪৫, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
দাফন ও কবরস্থান	: ২১ জুলাই, ২০২৪ রবিবার, দশমিনা সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় চত্বরে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়
পিতা	: নুরুল আমিন মোল্লা (৫৭), অবসরপ্রাপ্ত
মাতা	: শাহিনুর বেগম (৫০), গৃহিণী
	১. মো: জিন্নাত হোসেন (২৮), সম্পর্ক: ভাই, পেশা: চাকুরি
	২. মোছা: জান্নাতুল ফিরদাউস (৩৩), সম্পর্ক: বোন, বিবাহিতা
	৩. মোছা: জয়নব (৩০), সম্পর্ক: বোন, বিবাহিতা

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন

২. শহীদের বড় ভাইকে স্থায়ী কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

শহীদ মোঃ আতিকুল ইসলাম

ক্রমিক : ৩৫৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪২

শহিদ পরিচিতি

পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রূপনগর এলাকার বাসিন্দা শাহ আলম মাস্টারের চার ছেলের মধ্যে সবার ছোট শহীদ মোঃ আতিকুল ইসলাম রুবেল। তাঁর ডাক নাম রুবেল। রুবেল জন্মগ্রহণ করেন ১৯৯১ সালে। ২০০৭ সালে গলাচিপা সরকারি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট থেকে গোল্ডেন এ+ নিয়ে এসএসসি শেষ করে, বরিশাল সরকারি টেক্সটাইল কলেজ থেকে ২০১১ সালে টেক্সাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন। পরে ঢাকা সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে ২০১৪ সালে একই বিষয়ে বিএসসি সম্পন্ন করে ঢাকার বারিধারা এলাকায় জাস্টেক্স বায়িং হাউজে চাকরিতে যোগদান করেন। সর্বশেষ সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার পদে কর্মরত ছিলেন। ২০১৭ সালের ২৯ জুন পাশের রাঙ্গাবালী উপজেলার জসিম উদ্দিনের মেয়ে মোসাঃ তামান্না (২৬) এর সাথে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় রুবেলের। তাদের ঘরে আলিসবা ইসলাম ফারিস্তা নামের ১৭ মাস বয়সী একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

পারিবারিক অবস্থা বাবা শাহ আলম মাস্টার জানান, তখনকার সময় ৫০০ টাকা বেতনে রেজিস্ট্রি স্কুলে চাকরি করতাম। অল্প বেতনে ছয় সদস্যের সংসার চালানো খুবই কষ্ট ছিল। তখন গ্রামে থাকতাম। আমার ছেলে রুবেল মেধাবী হওয়ায় আমার বোন খাইরুন নাহার লিপি তাকে গলাচিপা এনে লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়। তার কাছে থেকেই এসএসসি শেষ করে রুবেল। পাশাপাশি লিপির ভাই শামীমও সহযোগিতা করেছে। আমার ছেলে খুবই ভালো ছিল। কোনো রাজনীতিও করতো না। সমাজিক কাজে জড়িত ছিল। পরিবারের চার ভাইয়ের মধ্যে রুবেল ছিল বেশি স্বাবলম্বী। সব ভাইকে সহযোগিতা করত। তাঁর আয় দিয়ে তার পরিবার চলত। ভাই বোনদের পরিবারও তাঁর থেকে উপকৃত হতো। আতিকুলের একজন ভাই রয়েছে বাক প্রতিবন্ধি। তার ১৮ মাস বয়সী ১ জন কন্যা সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী তামান্না (২৭) একজন সাধারন গৃহিণী । শহীদের স্ত্রী ও সন্তানের জীবন পরিচালনার জন্য আর কোন আয়ের উৎস নেই।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

২০২৪ সালের জুলাই মাস জুড়ে চলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আন্দোলন শুরুতে শান্তিপূর্ণ থাকলেও পরবর্তিতে সহিংস রূপ লাভ করে। আন্দোলন দমনে সরকার অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। সারাদেশে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় শতাধিক এবং আহত হয় হাজার হাজার মানুষ।

১৯ জুলাই, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার প্রয়াসে, জনসমাবেশ ও মিছিল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, সরকারের উর্ধ্বতনদের নির্দেশে, ঢাকা এবং দেশের বাকি অংশের মধ্যে ট্রেন পরিসেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। যাতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ভ্রমণ বা সমাবেশের জন্য ট্রেন ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা হয় । ১৮ জুলাই থেকে শুরু হওয়া ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ এবং দেশব্যাপী শাটডাউন, ১৯ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়।

সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের ডাক ব্যাপকভাবে সারা ফেলে। এদিন সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মুখে কালো কাপড় পরে প্রতিবাদ জানান। আনুমানিক ১২:৪৫ টায়, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানায় বিক্ষোভকারীরা থানা ঘেরাও করার পর, পুলিশ স্টেশনের ভিতর থেকে জনতার উপর গুলি চালায়, এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়।

এদিন রাজধানী ঢাকা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ঢাকার প্রত্যেকটি পয়েন্টে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব,আনসার ও বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভারী অস্ত্র-সস্ত্র, সাজোয়াজান, পিস্তল, রাইফেল, টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, গ্রেনেড ও বোমা নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। এ সময় পুলিশের গুলিতে শতাধিক নিহত ও হাজারের অধিক মানুষ আহত হয়। শত শত পরিবারের স্বপ্ন বিলীন হয়ে যায় সরকারের পেটোয়া বাহিনীর গুলিতে। তাদেরই একজন ছিলেন শহীদ আতিকুল ইসলাম রুবেল। ১৯ জুলাই শুক্রবার বেলা ৩টায় অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন রুবেল। এসময় তিনি পুলিশের গুলির মুখে পড়েন। তিনি যখন মিরপুর-১০ গোলচত্বর এলাকায় প্রবেশ করেন তখন ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলছিল। পুলিশের ছুড়া টিয়ারশেল, রাবার বুলেট, গ্রেনেড আর ছররা গুলিতে পুরো এলাকা মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়ে যায়। এলোপাতাড়ি গুলি রুবেলের মাথায় এসে লাগে। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শহীদ রুবেল। রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। স্থানীয়রা প্রথমে আল-হেলাল স্পেশালাইজড হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকে দ্রুত সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শেষ হয়ে গেল রুবেলের স্বপ্ন। মৃত্যুর খবর শোনে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর পরিবার।

দাফন-কাফন

পরদিন শনিবার রুবেলের লাশ গলাচিপায় নিয়ে আনা হয়। পরে গলাচিপা জৈনপুরী খানকায় প্রথম ও তার গ্রামের বাড়ি উপজেলার পানপট্টি ইউনিয়নের গ্রামমর্দ্দন এলাকায় দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের বক্তব্য

বাবা শাহ আলম মাস্টার জানান, তখনকার সময় ৫০০ টাকা বেতনে রেজিস্ট্রি স্কুলে চাকরি করতাম। অল্প বেতনে ছয় সদস্যের সংসার চালানো খুবই কষ্ট ছিল। তখন গ্রামে থাকতাম। আমার ছেলে রুবেল মেধাবী হওয়ায় আমার বোন খাইরুন নাহার লিপি তাকে গলাচিপা এনে লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়। তার কাছেই থেকেই এসএসসি শেষ করে রুবেল। পাশাপাশি লিপির ভাই শামীম ও সহযোগিতা করেছে। আমার ছেলে খুবই ভালো ছিল। কোনো রাজনীতিও করত না। সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। পরিবারের চার ভাইয়ের মধ্যে রুবেল ছিল বেশি স্বাবলম্বী। সব ভাইকে সহযোগিতা করত। আমাদেরকে এখন কে ডাক্তার দেখাবে ও খোঁজ নেবে। রুবেলের মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান,আমার বাবা ছিল আমার চাঁদ, আমার বাবা আমাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে রাইখা চলে গেছে।'এ সময় তার ছেলে রুবেলের জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। আগের দিন বৃহস্পতিবার রাতে বাবা-মায়ের সাথে শেষ কথা হয় রুবেলের। এ সময় রুবেলকে সাবধানে থাকতে বলেন তারা।

রুবেলের স্ত্রী তামান্না জানান, ঘটনার দিন দুপুর ১২টায় রুবেল আমাকে ফোন দিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যে বাইরে যেতে নিষেধ করে। সেটিই ছিল তার সাথে আমার শেষ কথা। বেলা ৩টা ৫২ মিনিটের সময় জানতে পারি রুবেলের গায়ে গুলি লেগেছে। তাৎক্ষণিক সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ছুটে যাই; কিন্তু ততক্ষণে আমার স্বপ্ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ সময় কান্নাজড়িত কণ্ঠে জানান, আমার স্বামী তো কোনো দোষী না। তাহলে সে কেন মরল। এর দায় কে নেবে? তার ছোট একটা মেয়ে আছে। তাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে গেলাম।

নিহতের ফুপু মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক খাইরুন নাহার লিপি জানান, রুবেলের লেখাপড়ায় বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করেছি। ঘটনা শুনে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ছুটে যাই; কিন্তু ততক্ষণে রুবেল আর বেঁচে নেই।

শহীদের চাচী তাহমিনা বেগম বলেন, আমি শহীদ আতিকুল ইসলামের চাচী। সে খুব ভালো ও সুদর্শন ছিলো। ও আমাদের সকল পরিবারকে কম বেশী আর্থিক সহযোগিতা করতো। সবার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিলো। তার ১৮ মাসের মেয়েটির জন্য সাহায্য দরকার। আল্লাহ তাকে জান্নাত বাসী করুন। আমীন।

Government of the People's Republic of Bangladesh

Death Registration Certificate

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Government of the People's Republic of Bangladesh

জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card

নাম

মোঃ আতিকুল ইসলাম

Name

MD. ATIKUL ISLAM

পিতা

মোঃ শাহ আলম হাওলাদার

মাতা

মোসাম্মাৎ মমতাজ বেগম

Date of Birth 12 Sep 1991

NID No. 327 547 1880

এক নজরে শহীদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

নাম	: মো: আতিকুল ইসলাম
জন্ম	: ১২-০৯-১৯৯১
জন্ম স্থান	: পটুয়াখালী
পেশা	: মার্চেনডাইজার
পিতা	: মো: শাহ আলম হাওলাদার
মাতা	: মোছা: মমতাজ বেগম
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুন ২০২৪, বিকাল ৪টা, মিরপুর ১০
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুন ২০২৪, সন্ধায়, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে
কবরের স্থান জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/UuJbEG8D1PSdxZ2EA
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: গ্রামার্দন, ইউনিয়ন: পানপট্টি, থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান

২. সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা যেতে পারে

শহীদ রাসেল

ক্রমিক : ৩৫৫

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৩

শহীদ পরিচিতি

দেশমাতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে ইতিহাস গড়েছেন শহীদ রাসেল। স্বৈরাচারের কাল হাত ভেঙ্গে দিতে সদা সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এই মুক্তিকামী মহাবীর। ১৯৯৫ সালের প্রথম প্রভাতে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তেজস্বী রাসেল। শহীদ পিতা মৃত আবু কালাম ও মাতা সফুরা বেগমের ছয় সন্তানদের মধ্যে রাসেল ছিলেন অনন্য। সমাজে অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিপক্ষে সবসময় সরব ছেলেন তিনি।

অল্প বয়সে জনয়িতার আদর থেকে বঞ্চিত হয় শাহাদতের অমিয় পানকারী রাসেল। একপর্যায়ে আর্থিক সংকুলান না থাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থামে তাঁর শিক্ষা জীবন। সহোদরদের দায়িত্ব এসে বর্তায় শহীদের উপর। কিছুদিন পর নিরুপায় হয়ে সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়তে নিজেকে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন শহীদ জননী সফুরা বেগম। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বে উপার্জনের পথ খুঁজতে হয় রাসেলকে। বাধ্য হয়ে সামান্য অর্থ পুঁজি করে গ্রাহকদের ক্রয় করা মাছ কাটা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরিশ্রম এবং নিষ্ঠতার ছোঁয়ায় ধীরে ধীরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। কিছুদিন পর স্বল্প পরিসরে নিজেই মৎস ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা প্রস্ফুটিত হতে থাকে। নিজের কষ্ট হলেও একোদরদের দায়িত্ব পালনে কোন কমতি রাখতেন না শহীদ রাসেল।

শাহাদত বরণের বছর তিনেক পূর্বে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী ময়না আক্তার বর্ষা (২০) চিরাচরিত একজন বাঙ্গালী বধূ। সংসারের দায়দায়িত্ব পালনে আর্থিক অসঙ্গতি থাকার পরও নিজ স্ত্রীকে দেখে বেঁচে থাকার স্বপ্ন সুবিশাল করতেন রাসেল। সদা হাস্যোজ্বল শহীদ পত্নী সংসারকে তাঁর নিজ গুনে গুণান্বিত করতে পছন্দ করেন। যে কারণে বুভুক্ষিত জীবনও প্রাণবন্ত করে রাখতেন তিনি। ২০২৩ সালের মে মাসে এই দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় একমাত্র পুত্র সন্তান জুনাইদ। যাকে কেন্দ্র করে সকল সাজসজ্জা, সৌন্দর্যতা এবং আনন্দঘন মুহূর্ত গড়ে ওঠে শহীদ দম্পতির। হঠাৎ একদিন এই সুখ চরম বিয়োগান্ত অধ্যায়ে রূপ নেয়। রাসেলের বর্ণীল জীবনকে তমসায় আচ্ছাদিত করে বুনো উল্লাসে ফেটে পড়ে খুনি হাসিনা ও তাঁর দোসররা।

ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ ও দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ

২০২৪ সালের ০৫ জুন যখন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ কোটা বাতিল করে ২০১৮ সালের সরকারের জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করে দেয়, তখন কারও ধারণাই ছিলো না যে পরের দুই মাসের মধ্যে

সেটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নজিরবিহীন ঘটনা ঘটবে। শেষ পর্যন্ত এটি ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের ১৫ বছরের শাসন অবসানের দিকে নিয়ে যায়। সেদিন হাইকোর্টের সেই আদেশটি অনেক পত্রিকায় তেমন গুরুত্বও পায়নি। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ সপ্তাহের মাথায় সেই বিক্ষোভের জেরে একটানা ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনাকে গোপনে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়। আন্দোলনটি শুরুতে শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে এর সাথে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার, নানা বয়সের অসংখ্য মানুষ অংশ নিতে শুরু করে। অনেকের মতে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাস গণবিদ্রোহ'র মাস। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের মধ্যে নানা কারণে ক্ষোভ তৈরি হয়। সেই ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলার জন্য দেশের ছাত্র-জনতা একটা সুযোগ খুঁজছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলন সেই সুযোগ এনে দেয়। আন্দোলনকে ঘিরে নিজেদের ক্ষোভ, জমে রাখা চাপা বেদনা জনতাকে রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য করে।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্ব-পরিবারে হত্যার পর বিতর্কিত দল আওয়ামীলীগ যে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েছিল, প্রায় ৫০ বছরের মাথায় আবারও দলটি সে অবস্থায় পতিত হয়েছে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে আওয়ামীলীগ সরকার গঠন করে। এরপর থেকে আর সন্ত্রাসী দলটি ক্ষমতা থেকে বের হতে চায়নি। একতরফা বা জালিয়াতির নির্বাচন, বিরোধীদের ও বিরুদ্ধ মত দমন, অনিয়ম আর দুর্নীতি, আমলা আর প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে দলটির টিকে থাকা, মতপ্রকাশের অধিকার ও মানবাধিকার হরণ পতনের পেছনে মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

শাহাদতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪, হিংস্রতার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছায় খুনি হাসিনার পালিত ঘাতক পুলিশ বাহিনী। একদিকে চলে বিজয় মিছিল অন্যদিকে রক্তের স্রোতে ভেসে যায় যাত্রাবাড়ী ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তর। সে মিছিলে যোগদান করতে সকাল দশটার দিকে বাসা থেকে বের হন রাসেল। যাওয়ার সময় স্ত্রী'কে বলে যায়- 'শোন, আমি বাইরে যাচ্ছি। অতঃপর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া ও কাজলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন তিনি। স্লোগানে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে পুলিশ। হটাৎ কয়েকটি গুলি রাসেলের শরীরে এসে বিদ্ধ হয়। মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে থাকেন তিনি। উপস্থিত ছাত্র-জনতা দ্রুত অনাবিল

হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকেরা অবস্থা বেগতিক দেখে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। ঢামেকের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানায় মোঃ রাসেল আহমেদ আর নেই। তিনি ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। দুপুর ১২:৩০ এর সময় শহীদের লাশ পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয়।

পরম প্রিয় স্বামীকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে থাকেন শহীদ পত্নী বর্ষা। প্রতিবেশীদের সহায়তায় লাশ বাড়ীতে এসে পৌছায়। শেষবারের মত বাবাকে ছুঁয়ে দেখে মাসুম শিশু জুনাইদ। সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী রাসেল আহমেদের মৃত্যুতে বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তাঁর স্ত্রী। পরবর্তীতে ঘাতক পুলিশের জোরাজুরিতে শহীদের লাশ গ্রামে পোঁছাতে না পেরে বাধ্য হয়ে দুপুর ৩.০০ টার দিকে জানাজা শেষে করে শহীদের মাতুয়াইল কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয়।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। সামান্য কিছু আবাদি জমি রয়েছে। যার ভাগাভাগি এখনও হয়নি। এমতাবস্থায় একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে শহীদ পরিবারটি ভীষণ কষ্টে দিনাতিপাত করছে। শহীদের সতের মাস বয়সী সন্তান জুনাইদ জগতের নিয়মকানুন বুঝে ওঠার আগেই ঘাতক স্বৈরাচারী হাসিনা তাঁর পিতাকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়েছে।

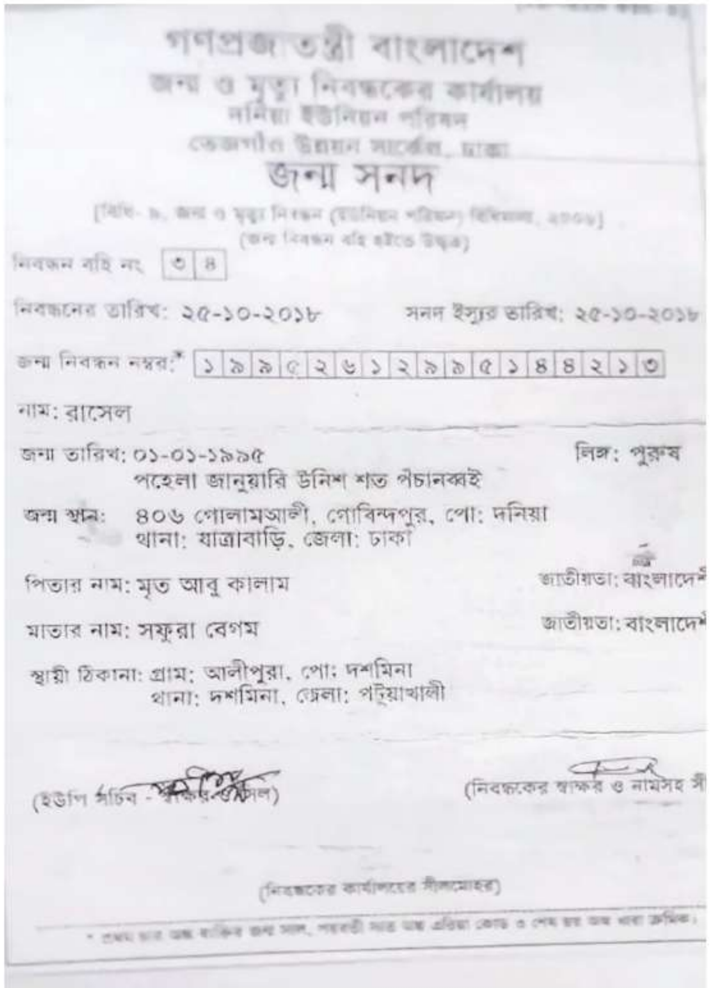
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
দনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ
জন্ম সনদ
(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)
নিবন্ধন বহি নং ৩৪
নিবন্ধনের তারিখ: ২৫-১০-২০১৮ সনদ ইস্যুর তারিখ: ২৫-১০-২০১৮
জন্ম নিবন্ধন নম্বর:* ১৯৯৫২৬১২৯৯৫১৪৪২১৩
নাম: রাসেল
জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৯৫ লিঙ্গ: পুরুষ
পহেলা জানুয়ারি উনিশ শত পঁচানব্বই
জন্ম স্থান: ৪০৬ গোলামআলী, গোবিন্দপুর, পো: দনিয়া
থানা: যাত্রাবাড়ি, জেলা: ঢাকা
পিতার নাম: মৃত আবু কালাম জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: সফুরা বেগম জাতীয়তা: বাংলাদেশী
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: আলীপুরা, পো: দশমিনা
থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী
(ইউপি সচিব - স্বাক্ষর ও সীলমোহর)
(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও নামসহ সী...)
(নিবন্ধকের কার্যালয়ের সীলমোহর)

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম	: রাসেল, জন্ম : ০১-০১-১৯৯৫, বয়স : ২৯, পেশাঃ মাছ ব্যবসায়ী
পিতা	: মৃত মোঃ আবু কালাম
মাতা	: সফুরা বেগম, বয়সঃ ৫৫ বছর, পেশাঃ গৃহিণী (অন্যত্র বিয়ে করেছেন)
স্থায়ী ঠিকানা	: আলিপুর, দশমিনা, পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: শনির আখরা, আনন্দবাজার, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান	: সকাল ১০:৩০টা, ০৫ আগস্ট ২০২৪, শনির আখড়া, কাজলা, যাত্রাবাড়ী
যাদের আঘাতে শহীদ	: পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান	: মাতুয়াইল কবরস্থান
সম্পদের পরিমাণ	: স্থায়ী বাসস্থান নেই, সামান্য আবাদি জমি রয়েছে
পরিবার	: ১. স্ত্রীঃ মোসাঃ ময়না আক্তার বর্ষা, বয়সঃ ২০, পেশাঃ গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি
	: ২. ছেলেঃ মোঃ জুনাইদ, বয়সঃ ১৭ মাস

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক সহায়তা করা যেতে পারে

২. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে

৩. শহীদের সদ্য এতিম হওয়া সতের মাস বয়সী সন্তানকে এতিম প্রতিপানের আওতাধীন করা যেতে পারে

শহীদ মো: সাগর গাজী

ক্রমিক: ৩৫৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৪

পরিচিতি

শহীদ মো: সাগর গাজী এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি ২০০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম স্থান নিজ জেলা পটুয়াখালীতে। তার পিতার নাম সিরাজুল গাজী এবং মাতার নাম মোছা: সাহিদা বেগম। শহীদ মো: সাগর গাজী ছিলেন পরিবারের একমাত্র ভরসা। বাবার বয়স ৬৫ বছর। রাজমিস্ত্রির কাজ করে পরিবার পরিচালনা করতেন। অসুস্থতার জন্য তিনি আর এখন তেমন কাজ করতে পারেননা।

শহীদ মো: সাগর গাজী ছিলেন অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও মিশুক একজন ছেলে। এলাকার বন্ধুদের সাথে সবসময় সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারনে অল্প বয়সেই পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাজে নেমে পড়তে হয়। দারিদ্রতার যাতাকলে পৃষ্ঠ হয়ে কিশোর সাগরের স্বপ্নগুলো মলিন হয়ে যায়। স্বপ্ন গুলো যখন অন্ধকার হতাশার সাগরে ডুবে যায় মৃত্যুই যেন তখন হয়ে উঠে কঠিন সত্য। নির্মম অন্ধকারকে আড়াল করে নিজের বুক চিতিয়ে উদ্ধত চিত্তে সাগর দেখিয়ে দেয় স্বপ্ন দেখার সাহস। ৫ আগস্ট আন্দোলন পরবর্তি বিজয় মিছিলে গিয়ে র‍্যাবের গুলিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

পরিবারের অবস্থা ভালো না। বাবা একজন রাজমিস্ত্রি বর্তমান সময়ে এই ধরনের শ্রমিকদের কাজ ও কমে গেছে। তাদের বাড়ির অবস্থা ও বেশি ভালো না। সাগর গাজী ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাকে হারিয়ে পরিবার এখন দিশেহারা।

সাগরের স্বপ্ন নিভে গেল মাত্র ২০ বছর বয়সে। গলাচিপা উপজেলার ডাকুয়া ইউনিয়নের পূর্বপাড় ডাকুয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে সাগর। বড় প্রত্যাশা নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। গত ৫ আগস্ট ঢাকার উত্তরায় জসিম উদ্দিন ফ্লাইওভার এলাকায় মাথায় গুলি লাগে সাগরের। নিভে গেল পরিবারের স্বপ্ন। বাবা সিরাজুল ইসলাম জানান, গ্রামে মাত্র ৬০ শতাংশ জমি আছে তাদের। এখন তিনি কীভাবে সংসার চালাবেন?'

শহীদ হওয়ার ঘটনা

প্রিয় মাতৃভূমি বিদেশী শক্তি কর্তৃক শোষিত নির্যাতিত হলেও দেশীয়দের দ্বারা কখনো শোষিত হয়নি। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় এসে অতীতের সকল ইতিহাস মাড়িয়ে এ দেশের মানুষকে শোষণ করা শুরু করে। বাঙালির রক্তে পাওয়া স্বাধীনতা ধূলিস্যাৎ করে দেয় নিমিষেই। তাদের ১৬ বছরের শাসনামলে বৈষম্যের মাত্রা পূর্বের সকল ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়। গুম, খুন,গণহত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, মাদক চালান,অর্থ পাচার, উন্নতির নামে হরি লুট, চাদাবাজি, দুর্নীতি সহ মানবতাবিরোধী সকল অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায় আওয়ামী সরকার।

স্বৈরাচার শেখ হাসিনার কাছে মানুষ খুন করা ছিল ছেলে-খেলা। বিরোধী দলকে দমন করতে গুম-খুন, হত্যা, গ্রেফতার,দমন -নিপীড়ন চালায়। বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা কর্মীকে নির্বিচারে হত্যা করে। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও মিথ্যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে আল্লামা মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদীকে দিনের পর দিন কারাগারে আটকে রাখে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে জামাতের অসংখ্য নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আয়না ঘরে বন্দী করে রেখে অমানুষিক নির্যাতন চালায় অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। পরপর দুইটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার সকল আয়োজন সম্পন্ন করে।

একগুঁয়ে কর্তৃত্বের কড়ার আঘাত থেকে রেহাই পায়নি সাধারণ কর্মচারী, দিনমজুর, সাংবাদিক, গাড়িচলক, কিশোর-কিশোরী। এমনকি ঘাতকের নির্মম আঘাত দেয়নি ১২ বছরের শিশু যোবায়িত হোসেন ইমনকেও। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। রিকশায় ঝুলে থাকা গোলাম নাফিজের নিথর দেহের ছবি আজও আমাদের পিড়ন দেয়। বিমর্ষ চিত্তে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় যখন মিস্টের (MIST) ছাত্র ইয়ামিনকে সাজোয়া যান থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়। জীবনকে আঁকড়ে ধরার শেষ চেষ্টায় তাদের প্রকম্পিত দেহ উত্তাল করে দেয় গোটা জাতিকে। চার বছরের শিশু আবদুল আহাদ, হকার মো: শাহজাহান, গাড়ি চালক দুলাল মতিবর, শিক্ষার্থী রাকিব হাসান, নির্মাণ শ্রমিক নুর আলম, নিরাপত্তাকর্মী ইমরান খলিফা, চিকিৎসক সজীব সরকার, মাদ্রাসা ছাত্র আব্দুল্লাহ আল মামুন সহ আরও অনেকে শহীদ হন। সব শ্রেণির, সব পেশার, সব বয়সের মানুষকে দিতে হয়েছে জীবন। নারী, পুরুষ, শিশু কেউই বাদ যায়নি মৃত্যু তালিকা থেকে। ক্ষমতালিপ্সু কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখতে নির্মম বলির শিকার হতে হয় অসংখ্য পুলিশ সদস্যকেও।

চিরুনি অভিযান চালিয়ে ঢাকার বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে নিরপরাধ ছাত্রদেরকে ধরে এনে অমানবিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। এসব দৃশ্য দেখে সাধারণ মানুষের বিবেক কেঁদে উঠে। কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না। সবাই যার যার জায়গা থেকে আন্দোলনে যুক্ত হয়। কেউ পানি দিয়ে, খাবার দিয়ে কেউ আবার আশ্রয় দিয়ে ছাত্রদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। বৈষম্য চরম আকার ধারণ করলে শুরু হয় আন্দোলন। শুরু হয় ২য় মুক্তিযুদ্ধ।

এই আন্দোলনে ঘাতকের আঘাত রেহাই দেয়নি ২০ বছরের কিশোর সাগর গাজী আহমেদকও। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শেষ হওয়ার পর স্বাধীনতা মিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে মাথায় আঘাত পান তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। গত ৫ আগস্ট বিকাল ৩ টায় ঢাকার উত্তরায় জসিম উদ্দিন ফ্লাইওভার এলাকায় মাথায় গুলি লাগে সাগরের। নিভে গেল পরিবারের স্বপ্ন। নিমিষেই শেষ হয়ে যায় একটি সম্ভাবনাময় দেশের সূর্যসন্তান। যারা নিঃস্বার্থভাবে অকাতরে তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মানুষের স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন আমরা তাদের ভুলবনা। জাতি আমাদের এই বীর সৈনিকদের সারাজীবন মনে রাখবে।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

মোহাম্মদ গাজী সাহেব উদ্দিন (চাচা) বলেন, সাগর আমার ভাতিজা পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল। সে খুব ভদ্র ছিল, সে খুবই উদ্যমী ছেলে ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের ভালো সম্পর্ক ছিল তার।

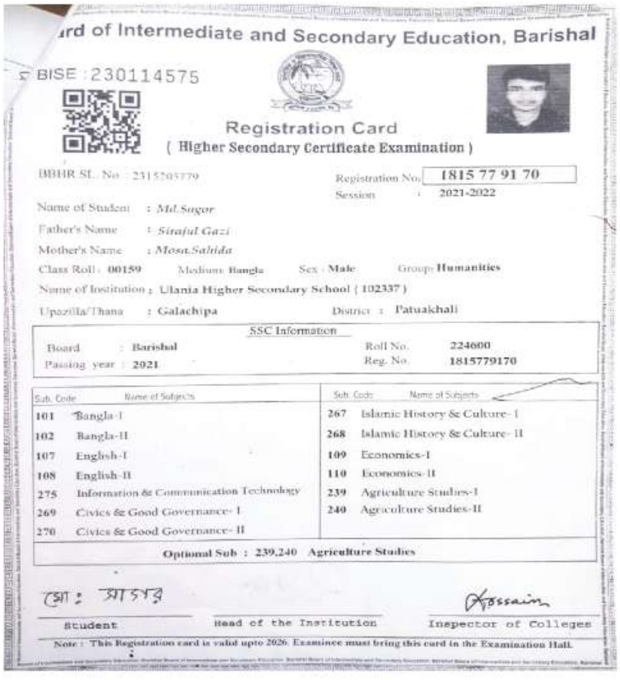
...rd of Intermediate and Secondary Education, Barishal

BISE : 230114575

Registration Card
(Higher Secondary Certificate Examination)

BBHR SL. No : 2315205779
Registration No: 1815 77 91 70
Session : 2021-2022

Name of Student : Md.Sagor
Father's Name : Siraful Gazi
Mother's Name : Mosa.Sahida
Class Roll : 00159 Medium: Bangla Sex : Male Group: Humanities
Name of Institution : Ulania Higher Secondary School (102337)
Upazilla/Thana : Galachipa District : Patuakhali

SSC Information

Board : Barishal Roll No. 224600
Passing year : 2021 Reg. No. 1815779170

Sub. Code	Name of Subjects	Sub. Code	Name of Subjects
101	Bangla-I	267	Islamic History & Culture- I
102	Bangla-II	268	Islamic History & Culture- II
107	English-I	109	Economics-I
108	English-II	110	Economics- II
275	Information & Communication Technology	239	Agriculture Studies-I
269	Civics & Good Governance- I	240	Agriculture Studies-II
270	Civics & Good Governance- II		

Optional Sub : 239,240 Agriculture Studies

মো: সাগর
Student Head of the Institution Inspector of Colleges

Note : This Registration card is valid upto 2026. Examinee must bring this card in the Examination Hall.

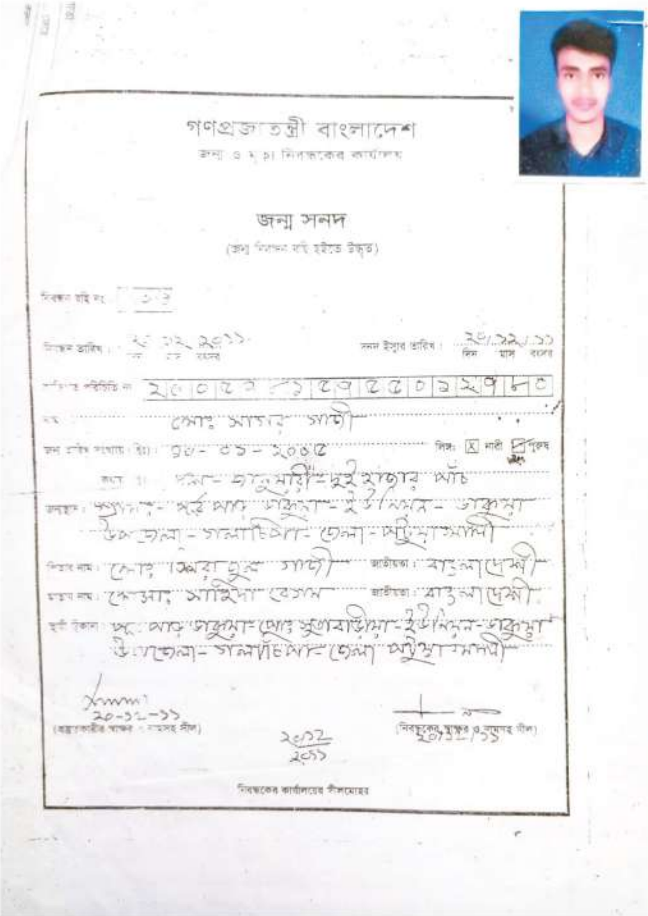

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

জন্ম সনদ

(জন্ম নিবন্ধন বহি হইতে উদ্ধৃত)

নাম: মোঃ সাগর গাজী

জন্ম তারিখ (অংকে): ১০-০১-২০০৫

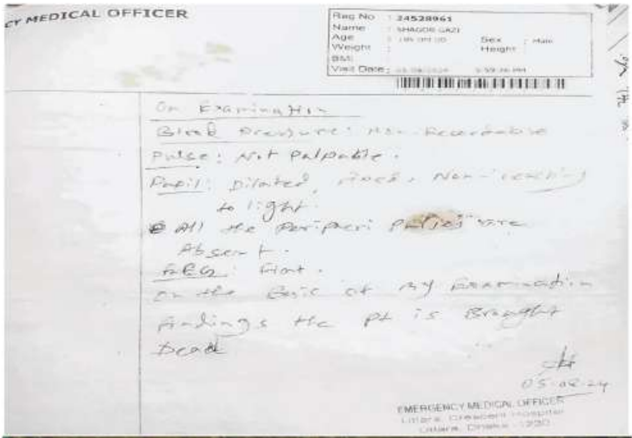

EMERGENCY MEDICAL OFFICER

Reg No: 24528961

Name: SHAGOR GAZI

On Examination

Blood Pressure: Non-Recordable

Pulse: Not Palpable.

Pupil: Dilated, fixed, Non-reacting to light.

All the Peripheri Pulses were Absent.

ECG: Flat.

On the basis of my Examination findings the pt is Brought Dead.

05-08-24

EMERGENCY MEDICAL OFFICER

Uttara Crescent Hospital

Uttara, Dhaka-1230

এক নজরে শহীদ সাগর গাজী

নাম	: শহীদ মো: সাগর গাজী
পেশা	: ছাত্র
প্রতিষ্ঠান	: উলানিয়া উচ্চবিদ্যালয় এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ	: ১০-০১-২০০৫
বয়স	: ২০ বছর
পিতা	: মো: সিরাজুল গাজী
মাতা	: মোসা: সাহিদা বেগম
শাহাদাতের তারিখ	: ০৫/০৮/২০২৪ বিকেল ৩টা
শাহাদাতের স্থান	: উত্তরা, জসিম উদ্দিন রোড
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব ডাকুয়া, ইউনিয়ন: ৬নং ডাকুয়া, থানা: গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী

প্রস্তাবনা

১. তার পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা দরকার

২. বা ও মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করা দরকার

শহীদ মোঃ মামুন

ক্রমিক : ৩৫৭

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৫

পরিচিতি

শহীদ মো: মামুন ১৯৮৩ সালে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোজাফফর হাওলাদার এবং তাঁর মাতার নাম মোছা: হেলেনা বেগম। তিনি নারায়নগঞ্জের পাগলা তালতলা বালুর ঘাটের একটা কোম্পানীর সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। তার ছেলে জাকারিয়া ইসলাম জয় ৮ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করে এবং মেয়ে জিদনীর বয়স ৪ বছর। তাঁর স্বপ্ন ছিল ছেলে-মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে মানুষের মত মানুষ করবেন। কিন্তু তা আর হল না। জালিমের রোষানলে পড়ে প্রাণ দিতে হল তাঁকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সময় তিনি পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। ২০২৪ সালের ২২ জুলাই সরকারের ঘাতকরা তাঁকে গুম করে। ৬ আগস্ট তাঁর মৃত দেহ ফেরত দেয়।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ মোঃ মামুন একজন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না। দারিদ্রতার দায়ে নিজ জেলা পটুয়াখালী ছেড়ে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে এসে বাবা-মার সাথে বসবাস করতেন। ছোট থেকেই নারয়নগঞ্জে থাকতেন। ১০ বছর আগে তার বাবা মারা যান। মা এখন গ্রামে থাকেন। তার ১৮ বছরের দাম্পত্য জীবনে এক ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন। তিনি নারায়নগঞ্জের পাগলা তালতলা বালুর ঘাটের একটা কোম্পানীর সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন। তার একমাত্র ছেলে জয় ৮ম শ্রেনীর ছাত্র। ৪ বছরের মেয়ে জিদনী এখনো সব কিছু বুঝার মত হয়ে উঠেনি। পিতার মৃত্যুতে সন্তানেরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা দীর্ঘ ১৬ বছরের এদেশের মানুষের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। তাঁর শাসন-শোষণ আর নির্যাতনের মাত্রা অতীতের সকল সকল ইতিহাসকে ছাড়িয়ে যায়। প্রতিটি সেক্টরে বৈষম্যের মাত্রা চরম আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে ছাত্র-জনতা কোটা বৈষম্য নিরসনের জন্য আন্দোলনের ডাক দেয়। শুরুতে এই আন্দোলন ছাত্র-জনতার আন্দোলন থাকলেও ক্রমেই গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকার ছাত্র-জনতার নায্য মেনে ত নেয় না উল্টো দমন করতে থাকে। আন্দোলনে পুলিশ বাঁধা প্রদান করলে সংঘর্ষ তৈরি হয়। সারা দেশের মানুষ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করে।

আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। সরকার তার দলীয় লাঠিয়াল এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগের হেলমেট বাহিনীর মাধ্যমে সাধারণ নিরস্ত্র মানুষের উপর হামলা চালায়। তাতেও সাধারণ মানুষ পিছু হটেনি। দাবি আদায়ে অনড়। রাজপথে থেকে লড়াই করে। এরপর সকোর ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। গুম, খুন, গ্রেফতার ও হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলন দমানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। সরকার জনগনের মানবাধিকার লজ্ঘন করে।

আওয়ামী সরকারের পৈশাচিকতার অন্যতম একটি ছিল বিরোধী মতের মানুষকে রাতের আধারে বাড়ি থেকে তুলে এনে নির্যাতন করা। অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে ডিবি হেফাজতে এনে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। এমনকি তাদেরকে আটকের কথা শিকার ও করত না। নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেন তাদের কোন হদিস ও মেলে না। তাদেরি একজন ছিলেন শহীদ মোঃ মামুন।

শহীদ মোঃ মামুনকে তার কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানাধীন পাগলা তালতলা কুদ্দুস এন্ড সন্স বালুর ঘাট থেকে ২২ জুলাই দিবাগত রাত আইন শৃখলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে থানায় গেলেও পরিবারকে মামুনের সাথে দেখা করতে দেয়নি। এরপর প্রতিদিনই পরিবারের সদস্যরা মামুনের সাথে দেখা করার জন্য যেত, কিন্তু পুলিশ দেখা করতে দেয়নি। পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তাঁকে অমানবিক নির্যাতন করা হয়। তাঁকে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয়। এদিকে তাঁর পরিবার দেখা করতে আসলে পরিবারের কাছে মুক্তিপন হিসেবে ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। বলা হয় ৩০ হাজার টাকা দিলে তাঁকে সাধারণ কোন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে সহজেই ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যথায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। বরং কঠিন মামলা দিয়ে তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর কোনদির বের হতে পারবে না। কিন্তু তাঁর পরিবারের পক্ষে ৩০ হাজার টাকা দেওয়া ওই মুহূর্তে অসম্ভব ছিল। পরিবারের লোকজন থানায় এসে অনেক আকুতি-মিনতি করে। কিন্তু নিষ্ঠুর পুলিশ তাদের কোন আকুতি-মিনতি শুনে না। বরং নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মামুন অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবস্থা যখন বেগতিক আর বাচার কোন সম্ভাবনা নেই তখন পুলিশ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে। প্রতিদিনের মতো গত ৬ আগস্ট তাঁর পরিবারের লোকজন দেখা করতে গেলে পুলিশ জানায়, মামুন হাসপাতালে ভর্তি। হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায় মামুনের নিথর দেহটা পড়ে আছে; অথচ পরিবারকে মৃত্যুর খবরটাও জানানো হয়নি। এভাবেই পুলিশ মামুনকে হত্যা করে। এমন অমানবিক মৃত্যু তাঁর পরিবার কোনভাবেই মেনে নিতে পারে না। বাবার এমন মৃত্যুতে ছেলে মেয়ে দুজনিই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

দাফন-কাফন

৬ আগষ্ট মঙ্গলবার মধ্য রাতে মামুনের লাশ নিয়ে আসা হয় গ্রামের বাড়ি গলাচিপা উপজেলার পানখালী গ্রামে। নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় লাশ।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনভূতি

শহীদের মামা সিরাজুল গাজী বলেন, সে খুব ভালো ছিলো, সবার প্রতি সে সম্মান প্রদর্শন করতো। তার মার প্রতি সে খুব খেয়াল করতো। তাঁর আয়েই সংসার চলত। নিজে কিছু করতে না পারলেও স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ বানাবেন। কিন্তু তা আর হল না।

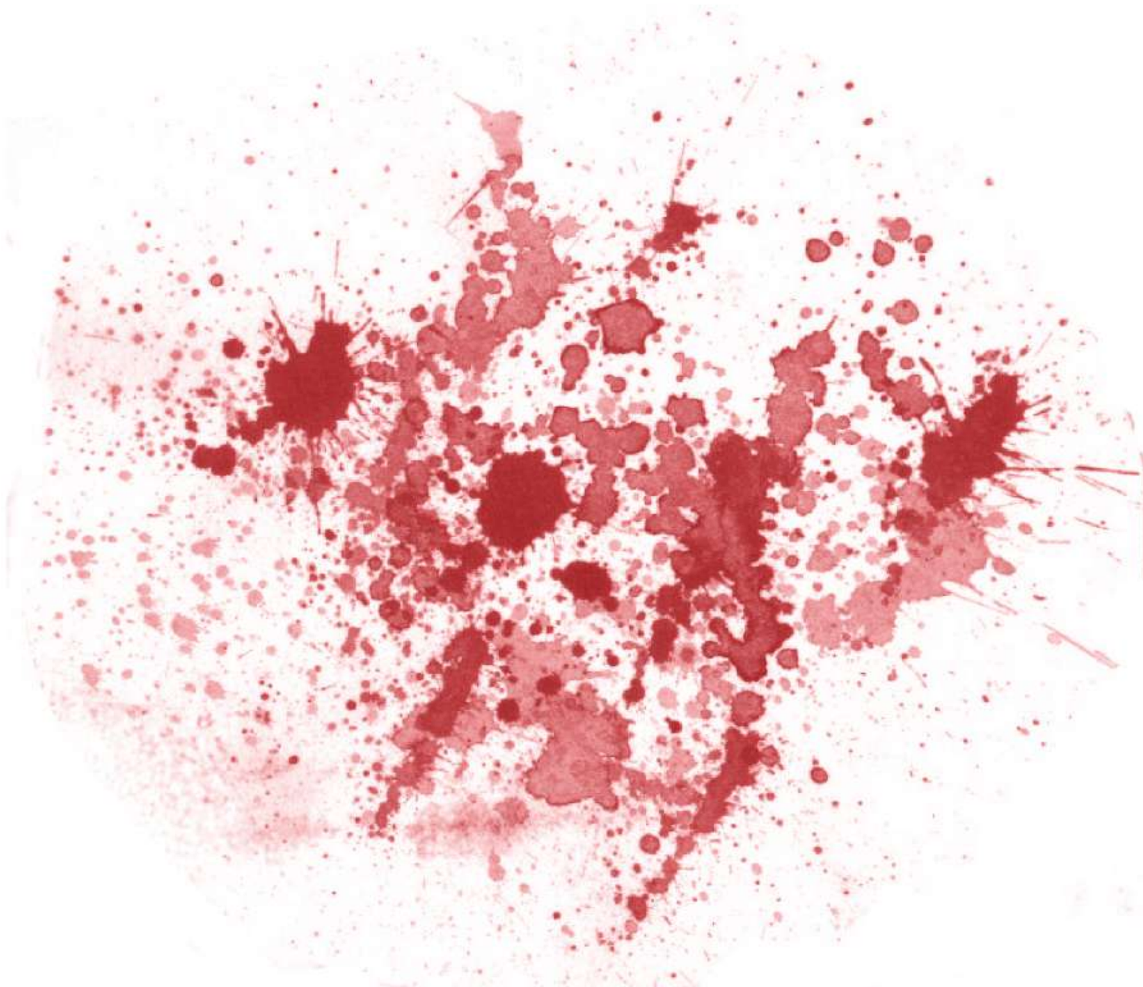

এক নজরে শহীদ মোঃ মামুন

নাম	: শহীদ মোঃ মামুন
জন্ম	: ২০-০১-১৯৮৩
জন্ম স্থান	: পটুয়াখালী
পেশা	: সিকিউরিটি গার্ড
পিতা	: জনাব মোজাফফর হাওলাদার
মাতা	: মোছাঃ হেলেনা বেগম
শহীদ হওয়ার তারিখ	: ৬ আগস্ট ২০২৪, পুলিশি হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্যাতনের শিকার হয়ে
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পানখিলা, ইউনিয়ন: চিকনিকান্দি, থানা:গলাচিপা, জেলা: পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: ৬৪ পাগলা পূর্ব পাড়া, ইসলামিয়া বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান।

শহীদের সন্তানদের পড়াশুনা সহ যাবতীয় খরচ বহন করা।

শহীদের মা-বাবার খরচ বহন করা।

ছেলের ছবিটা আর দেখা হল না

শহীদ মো: শাহ জামাল ভূঁইয়া (জামাল)

ক্রমিক : ৩৫৮

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৬

পরিচিতি

শহীদ মো: শাহ জামাল ভূঁইয়া (জামাল) ১৯৯৭ সালে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মো: হারুন্ল এবং মাতার নাম মোছা: মেহেরজান বিবি। জামাল পেশায় একজন মুরগী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ছোট একটি মুরগীর দোকান ছিল। মুরগীর ব্যাবসা করেই পরিবার চালাতেন। ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন চলাকালে স্বৈরাচার সরকারের পুলিশ বাহিনীর গুলিতে তিনি শাহাদাত বরন করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ জামালের যৌথ পরিবার। আর্থিক অভাব অনটনের কারণে তার বড় ভাই ঢাকার নারায়নগঞ্জে আসেন। কিছুদিন পর মেঝো ভাই ইমরান ও জামাল নারায়নগঞ্জে আসেন এবং তারা একটি মুরগির দোকান দেন যা তিন ভাই মিলে পরিচালনা করতেন। হঠাৎ ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে তার বাবা মারা যান। তার মা পটুয়খালী রাঙাবালির গ্রামের বাড়িতে থাকেন। তিন বোনের বিবাহ হয়েছে। মো: জামালের বড় ভাইয়ের (৩৪) এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং মেঝো ভাই ইমরানের(৩০) দুই মেয়ে এবং মো: জামালের ৭ মাস বয়সী এক ছেলে রয়েছে। মুরগির দোকানের মাধ্যমে পুরো পরিবারের খরচ বহন করা হয়। জামালেরা তিন ভাই মিলে গ্রামে একটি আধাপাকা টিনের ঘর তৈরি করেন। বসত ভিটা ছাড়া তাদের আর কোন জমিজমা বা সম্পদ নেই। তিনি মারা যাওয়ায় ছেলে আব্দুল্লাহ ও বিধবা স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়েছে। অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

১৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের উপর অন্যায়ভাবে পুলিশ, র‌্যাব, বিজিবি ও ছাত্রলীগ মিলে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। একইভাবে নারায়নগঞ্জ চাষাড়ায় ন্যাক্কারজনকভাবে গুলি করে ছাত্র-জনতা ও সাধারণ মানুষদের হত্যা করে। ঘটনার কিছুদিন আগে জামাল স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যান বেড়াতে। স্ত্রীকে রেখে জীবিকার টানে আবারও ঢাকায় চলে আসেন। ১৯ জুলাই বিকাল ৪টার দিকে মুরগীর দোকানে আসেন। মুরগির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর সাথে মোবাইলে কথা বলছিলেন। তখন তার স্ত্রীকে বলে তার ছেলেকে দেখতে মন চায়, একটা ছবি পাঠানোর জন্য। কথা শেষ না হতেই স্ত্রী মোবাইলে জামালের চিৎকার শুনতে পায়। স্ত্রী অনেক চেষ্টা করলেও জামালের সাথে আর কথা বলতে পারেননি। স্ত্রী সাথে সাথে জামালের বড় ভাই আলমাসকে (৩৪) এ ঘটনা জানান। মোঃ জামালের কোমরের নীচে গুলি লেগে ছিদ্র হয়ে অন্য পাশ হয়ে বের হয়ে যায়। চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে যান জামাল। মুহূর্তেই রক্তে ভেসে যায় দোকানের সামনের অংশটা। মো: জামালের বড় ভাই ও এলাকার লোকজন মিলে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসেন। হাসপাতালেও সেদিন প্রচণ্ড ভিড়। পুলিশের ছোড়া গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালের বারান্দায় কাতরাচ্ছে অসংখ্য মানুষ। কোথাও জায়গা নেই। অবশেষে খুব কষ্টে তাঁকে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ হয়। সন্ধ্যা ৭.৩০ টার দিকে হাসপাতাল থেকে তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। লাশের ময়না তদন্ত শেষে ২০ জুলাই বিকাল ৫টায় হাসপাতাল কতৃপক্ষ পরিবারকে বুঝিয়ে দেয়। পরের দিন অর্থাৎ ২১ তারিখ দুপুরের পর বাড়িতে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। স্বামীর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। ছোট ছেলেটা আর কোনদিন বাবা বলে ডাকতে পারবে না। বাবা ডাক ফুটার আগেই চিরতরে বাবাকে হারিয়ে ফেলল।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীদের অনুভূতি

জামালের মেঝো ভাই ইমরান (৩০) বলেন, আমরা তিন ভাই একই সাথে ব্যাবসা করি। কখনও কোন বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়নি। ও আমাদের আদরের ছোট ভাই ছিলো। শাহজামানের বাড়ির পাশের চাচা বলেন, ওরা তিন ভাই খুবই ভালো। কারও সাথে কখনও কোন ঝামেলা বা লেনদেনে সমস্যা হয়নি। ওদের বাবা মারা যাওয়ার পরও একত্রেই থাকে। আল্লাহ জামালকে জান্নাত নিসিব করুক। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

এক নজরে শহীদ মো: শাহ জামাল ভূঁইয়া (জামাল)

নাম	: শহীদ মো: শাহ জামাল ভূঁইয়া (জামাল)
জন্ম	: ২২-০৩-১৯৯৭
জন্ম স্থান	: পটুয়াখালী
পেশা	: ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
পিতা	: জনাব মো: হারুন্ল
মাতা	: মোছা: মেহেরজান বিবি
আহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই বিকাল ৪টা
শাহাদাতের তারিখ ও স্থান	: ১৯ জুলাই সন্ধ্যা ৭.৩০টা
কবরের স্থান জিপিএস লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/FxaHNAhsYJDCuuek9
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খাসমহল, ইউনিয়ন: মৌডুবী, থানা: রাঙ্গাবালী, জেলা: পটুয়াখালী
বর্তমান ঠিকানা	: জালকুঁড়ি, জালকুঁড়ি, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ

প্রস্তাবনা

শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান

শহীদের সন্তানের সমস্ত খরচ বহন করা

শহীদ মো: আখতারুজ্জামান নাঈম

ক্রমিক : ৩৫৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৭

পরিচিতি

জুলাই বিপ্লবের একজন গর্বিত শহীদ মো: আখতারুজ্জামান নাঈম এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি ১৯৮১ সালের ০১ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান নিজ জেলা পটুয়াখালীতে। তার পিতার নাম মরহুম আব্দুর রব মিয়া এবং মাতার নাম মোছা: নাজনিন নাহার। শহীদ মো: আখতারুজ্জামান নাঈম ছিলেন পরিবারের একমাত্র ভরসা। তিনি এসি আই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করতেন।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

পটুয়াখালীর বাউফলের জামালকাটী গ্রামের মৃত আব্দুল রব মাস্টারের ছেলে আখতারুজ্জামান নাঈম। চাকরির সুবাদে মিরপুর শাহ আলীর 'এ' ব্লক গরিবে নেওয়াজ এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। তার ৬ বছর বয়সী একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। বাবা না থাকায় সংসারের

সকল দায়-দায়িত্ব তার উপরেই ছিল। একার উপার্জনেই পুরো সংসার চালাতেন। তাদের নিজস্ব কোন জায়গা জমি নেই বললেই চলে। তাঁর মা মিনারা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে প্রায় সবসময় অসুস্থ থাকেন। সংসারে অভাব-অনটন লেগেই থাকত সবসময়।

জুলাই বিপ্লবের দিনগুলি

কোটা সংস্কার আন্দোলনে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে দেশের সকল ছাত্র-জনতা এক হয়ে আন্দোলনে নামে। কিন্তু সরকার এতে বাঁধা প্রদান করে। এরপর থেকে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। প্রয়োজন বোধ হয় একটি একক প্লাট ফর্মের। যার মাধ্যমে আন্দোলনকে বেগবান করা যাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-জনতা বৈষর্ম বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে একটি একক প্লাটফর্ম তৈরি করে। যা ২০২৪ সালের ১ জুলাই সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে চার দফা দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা লাগাতার কর্মসূচি দেয়। ২ থেকে ৬ জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ, মানববন্ধন, মহাসড়ক অবরোধ ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করে। ৭ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঢাকায় গণপরিবহন বন্ধ এবং রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি চালায় এবং পরবর্তীতে সারাদেশে অবরোধ কর্মসূচি দেওয়া হয় যা "বাংলা ব্লকেড" কর্মসূচি নামে পরিচিত। বাংলা ব্লকেড চলাকালীন রাজধানীতে শুধু মেট্রো রেল চালু ছিল। পরবর্তী দিনগুলিতেও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে একই কর্মসূচি পালিত হয়। এইসব কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগ ও পুলিশি হামলার শিকার হয়। ১৪ জুলাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকায় গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।এদিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের "রাজাকারের নাতি-পুতি" হিসেবে অভিহিত করেন, প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার" এবং "চাইতে গেলাম অধিকার; হয়ে গেলাম রাজাকার" স্লোগান দেয়। এর পরেরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ ও তৎকালীন সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন।১৫ জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, "গত রাতে বিক্ষোভ করে আমরা সোমবার ১২টার প্রধানমন্ত্রীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলাম। প্রত্যাহার না হওয়ায় আমরা রাস্তায় নেমেছি"। ১৫ তারিখ ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। যা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রিকেও হার মানায়। লাঠি, হকিস্টিক, লোহার রড, চাপাতি, রামদা ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। এর আগেরদিন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের ছাত্রলীগকে হামলা করতে উস্কিয়ে দেয়। তার উস্কানি পেয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ইনান সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার সর্বাত্ম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাতে ট্রাকে করে অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি শয়ন ও সেক্রেটারি তানভীর হাসান সৈকত, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহীম ফরায়েজী এবং সেক্রেটারি এস এম আক্তার হোসেন এই হামলার পরিকল্পনার অন্যতম মূল হোতা। তাদের সাথে ঢাকার আশেপাশের ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের ক্যাডাররা যুক্ত হয়। সাথে সহযোগিতা করেছে যুবলীগের সদস্যরা। হামলার লোমহর্ষক ঘটনা দেখে শিহরিত হয়ে যায় পুরো দেশের মানুষ। আহত রক্তাক্ত হয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীরা হাসপাতালে ভর্তি হলে ছাত্রলীগ সেখানে গিয়েও হামলা চালায়। ঢাকা মেডিকেল হসপিটাল সেদিন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই দৃশ্য সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলাকারী ছাত্রলীগের ক্যাডারদের উদ্ধ্যতপূর্ণ আচরণ জাতিকে হতাশ করেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি ইব্রাহীম ফরায়েজীর অনুসারী নাট্যকলা বিভাগের ১৫ তম ব্যাচের রাসেল আহমেদ শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করতে গিয়ে নিজেই আহত হন। এসময় তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বলেন, "১১ জনকে পিটিয়েছি সুস্থ হয়ে ১২ তম জনকে পিটাব।" তার মত আরও অনেকে এমন উদ্ধ্যতপূর্ণ আচরণ করে। সাধারণদের হামলা করতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও

অনেকে যুক্ত হয়। এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম পরিচয় জানা গেছে তারা হল, সাধারণ সম্পাদক এস এম আক্তার হোসেনের সহচর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ১১তম ব্যাচের মেরাজ, ইব্রাহীম সানিম, শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের ১২ তম ব্যাচের সাইদুল ইসলাম সাইদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের

১২ তম ব্যাচের আকাশ, ১২ তম ব্যাচের মোঃ ইউনুস, ১৩ তম ব্যাচের হাবিব, সমাজকর্ম বিভাগের ১৪ তম ব্যাচের নজরুল ইসলাম সাগর, সাজেদুল ইসলাম সৈকত, আইন অনুষদের ১৪ তম ব্যাচের আব্দুর রহমান, ওবায়দুল্লাহ হাসিব, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেদী, ইসলামিক স্টাডিজ ১৫ তম ব্যাচের সাজবুল ইসলাম সহ আরও অনেকে সম্মুখ সারিতে থেকে সাধারণদের উপর হামলার নেতৃত্ব প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন ও সাধারণ সম্পাদক তানভীরুল ইসলাম সৈকতের নেতৃত্বে বিভিন্ন হল কমিটির ক্যাডাররা এ হামলায় নেতৃত্ব প্রদান করে।

পরবর্তী দিনগুলিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন চলে। এরপর আন্দোলন দমাতে বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রশাসন শিক্ষার্থীদেরকে জরুরী নোটিশে হল ছেড়ে যেতে বলে। হল প্রশাসন শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে বল প্রয়োগ করে। ১৭ জুলাই রাতে তারা সমন্বয়করা ১৮ জুলাইয়ের জন্য 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচির ঘোষণা করে।

১৯ জুলাইতেও সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা সর্বাত্মক অবরোধ চলে। এদিন মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে আটক করা হয়। যেসময়ে নাহিদ ইসলামকে আটক করা তার কাছাকাছি সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনজন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন প্রতিনিধির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে তারা সরকারের কাছে 'আট দফা দাবি' জানান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং সহ-সমন্বয়ক তানভীর আহমেদ। ২০ জুলাই সরকারের তিনজন মন্ত্রীর যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠক ও বৈঠকে উত্থাপিত দাবি নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরিফ সোহেল অভিযোগ করে বলেন, "তারা গতকাল রাতে মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করা তিন প্রতিনিধি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটা পোর্শনও [অংশ] না। তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথেই নাই। তারা যদি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নামে প্রচার করেন, তবে তারা মিথ্যাচার করছেন।" অন্য আরেক সমন্বয়ক আবদুল কাদের বলেন, "কয়েকজন সমন্বয়ক ও সহ-সমন্বয়ককে দিয়ে জোরপূর্বক গণমাধ্যমে ভুল সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে।"

২১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি পক্ষ '৯ দফা' দাবি জানিয়ে শাটডাউন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। ২২ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম চার দফা দাবি জানিয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি স্থগিত করেন, তিনি জানান "আমাদের চার দফার মধ্যে রয়েছে - ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারনেট চালু, ক্যাম্পাসগুলো থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যাহার করে ক্যাম্পাস চালু, সমন্বয়ক ও আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং কারফিউ প্রত্যাহার করা। যারা নয় দফা দাবি ও শাটডাউন অব্যাহত রেখেছে তাদের সাথে আমাদের নীতিগত কোন বিরোধ নেই। নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকায় আমরা তাদের সাথে কথা বলতে পারছি না"। ১৯ জুলাই থেকে নিখোঁজ থাকার পর ২৪ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া যায়। ২৫ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আটটি বার্তা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে হতাহতদের তালিকা তৈরি, হত্যা ও হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল খুলে দেওয়ার চাপ তৈরি করা।

২৬ জুলাই নাহিদ ইসলামসহ কোটা সংস্কার আন্দোলনের তিন সমন্বয়ককে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যায় সাদাপোশাকের এক দল ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়েছেন বলে সেখানে উপস্থিত এক সমন্বয়কের স্বজন ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান। ২৭ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের আরও দুই সমন্বয়ককে হেফাজতে নেয় গোয়েন্দা শাখা। তারা হলেন সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ।পরে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে ২৮ তারিখের (রোববারের) মধ্যে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামসহ, আসিফ মাহমুদসহ আটক সকল শিক্ষার্থীদের মুক্তি, মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষার্থী গণহত্যার সাথে জড়িত মন্ত্রী পর্যায় থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সকল দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আল্টিমেটাম দেয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

একই সাথে রোববার সারা দেশের দেয়ালগুলোতে গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। ২৮ জুলাই রাত ১০টার দিকে পুলিশি হেফাজতে থাকা ৬ সমন্বয়ক আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। কিন্তু পুলিশে আটক হওয়া অবস্থায় পুলিশের অফিসে বসেই বাকি সমন্বয়কারীদের সাথে যোগাযোগ না করে এমন ঘোষণা দেয়ায় এই ঘোষণাকে সরকার ও পুলিশের চাপে দেয়া হয়েছে বলে আখ্যায়িত করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাকিরা।

৩১ জুলাই হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা ও গুমের প্রতিবাদে ৩১ জুলাই বুধবার সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন 'মার্চ ফর জাস্টিস' (ন্যায়বিচারের জন্য পদযাত্রা) কর্মসূচি পালন করে।১ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে বেলা দেড়টার একটু পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২ আগস্ট শুক্রবার 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি ঘোষণা করে।২ আগস্ট গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেন যে, আন্দোলন প্রত্যাহার করে ডিবি অফিস থেকে প্রচারিত ছয় সমন্বয়ককের ভিডিও বিবৃতিটি তারা স্বেচ্ছায় দেননি। তাদেরকে জোর পূর্বক অস্ত্র ঠেকিয়ে এই বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। পরবর্তীতে আবার নতুন করে কর্মসূচি প্রদান করে। সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

শহীদ আখতারুজ্জামান নাঈম যেভাবে শহীদ হলেন

শহীদ আখতারুজ্জামান নাঈম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন অকুতোভয় সৈনিক। আন্দোলনের শুরু থেকেই তিনি সক্রিয় ভুমিকা পালন করেছেন। ২৭ জুলাই ২০২৪ তিনি সাধারণ ছাত্রদের সাথে মিরপুর ১ এ অবস্থান নিয়েছিলেন। সেখানে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশের টিয়ারশেলের ধোঁয়ায় পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে যায়। এর মধ্যেই সাধারণদের টার্গেট করে গুলি নিক্ষেপ করতে শুরু করে। এদিক ওদিক কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছিল না। আখতারুজ্জামান নাঈম এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যান। তার সামনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেকে। পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব একত্রি হয়ে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। হঠাৎ একটি গুলি এসে নাঈমের মাথায় বিদ্ধ হয়। মাথার পিছন দিক থেকে লেগে সামনের দিক থেকে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নাঈম। রক্তক্ষরণ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি। এভাবেই শহীদের খাতায় নাম লেখান শহীদ আখতারুজ্জামান নাঈম।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের প্রতিবেশী জনাব সোগির, নাঈমের শহীদ হওয়ার ঘটনায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। তিনি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন।

শহীদের বন্ধু মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেছেন, আমার বন্ধু জনাব আখতারুজ্জামান নাঈম একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। পরিবারের জন্য তিনি ছিলেন বটবৃক্ষ। সকলকে আগলে রাখতে রাখতেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং একটি ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। সকলেই তাঁর জন্য দোআ করবেন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন এবং তার পরিবারকে শোক সহ্য করার তৌফিক দান করেন। আমিন।

This is a police case

Medical Certificate of Cause of Death

Name: DMCH | Hospital Code No.: 10000033 | Admission Reg. No.: 16382/62 | Ward No.: OSEC
Patient Name: MD. AKTARUZZAMAN NAYEEM
Father's/Mother's Name: ABDUR ROB MIA
Address: House/Road (Name/No.): | Village/Area/Town: JAMOLKATI | Union/Ward:
Post Office: GHURCHAKATI | Post Code: 8623 | Upazila/Thana: BAOFOL | District: PATUAKHALI
Sex: ☐ Female ☑ Male ☐ Third gender | Religion: ☑ Islam ☐ Hindu ☐ Buddha ☐ Christian ☐ Other
Occupation: ☑ Service ☐ Business ☐ Govt. Service ☐ Student ☐ Housewife ☐ Retired ☐ Other
Date of Birth of Deceased: 01 01 1981 | Age if DoB is not available: | Date of admission: 27 07 2024
Time of Admission: 10 00 P.M | Date of Death: 27 07 2024 | Time of Death: 11 42 P.M
NID of Deceased/Spouse/Parents NID (< 18 years): 19817813841000005 | ☑ Deceased ☐ Spouse ☐ Parents
Family Cell Phone number (If available): 01648464648

Frame A: Medical data: Part 1 and 2

1		Cause of death	Time interval from onset to death
Report disease or condition directly leading to death on line a	a	Primary Brain Injury	2½ hour
Report chain of events in due to order (if applicable)	b	Fall From height	2½ hour
State the underlying cause on the lowest used line	c		
	d		
2 Other significant conditions contributing to death (time intervals can be included in brackets after the condition)			

Frame B: Other medical data

Was surgery performed within the last 4 weeks? ☐ Yes ☑ No ☐ Unknown | If yes please specify date of surgery
If yes please specify reason for surgery (disease or condition)
Was an autopsy requested? ☑ Yes ☐ No ☐ Unknown | If yes were the findings used in the certification? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown

Manner of death

☐ Disease ☐ Assault ☐ Could not be determined ☑ Accident ☐ Legal intervention ☐ Pending investigation ☐ Intentional self harm
☐ War ☐ Unknown | If external cause or poisoning: | Date of Injury
Please describe how external cause occurred (If poisoning please specify poisoning agent)

Place of Occurrence of the external cause

☐ At home ☐ Residencial ☐ School, other institution, public administrative area ☐ Sports and athletics area ☐ Street and highway ☑ Trade and service area
☐ Indutrial and construction area ☐ Farm ☐ Other place (please specify): ☐ Unknown

Fetal or Infant Death

Multiple pregnancy ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown | Stillborn? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
If death within 24h specify number of hours survived | Birth weight (in grams)
Number of completed weeks of pregnancy | Age of mother (years)
If death was perinatal, please state conditions of mother that affected the fetus and newborn

For women of reproductive age

Was the deceased pregnant within past year? ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
If yes, was she pregnant ☐ When she died ☐ Within the 42 days preceding her death ☐ Within 43 days up to 1 year preceding her death ☐ Exact pregnancy timing unknown
Did the pregnancy contribute to the death ☐ Yes ☐ No ☐ Unknown
Name: DR. MD. JHODATR AHANAD | Position: Resident | BMDC Reg. No.: A78830
Bangladesh Form No:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
NATIONAL ID CARD / জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম: মোঃ আখতারউজ্জামান নাঈম
Name: Md. Aktaruzzaman Nayeem
পিতা: মৃত আব্দুর রব মিয়া
মাতা: নাজনিন নাহার
Date of Birth: 01 Jan 1981
ID NO: 19817813841000005

এক নজরে শহীদ মো: আখতারুজ্জামান নাঈম

নাম	: শহীদ মো: আখতারুজ্জামান নাঈম
পেশা	: চাকরিজীবি
প্রতিষ্ঠান	: এসি আই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি
জন্ম তারিখ	: ০১-০১-১৯৮১
বয়স	: ৪০ বছর
পিতা	: মরহুম আব্দুর রব মিয়া
মাতা	: মোছা: নাজনিন নাহার
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: জামালকাটি, ইউনিয়ন: ৩ নং ধনুয়া, থানা: বাউফল, জেলা: পটুয়াখালী
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক বাহিনীর সম্মিলিত গুলিবর্ষণ
শাহাদাতের তারিখ	: ২৭/০৭/২০২৪, বিকাল ৩টা
শাহাদাতের স্থান	: মিরপুর-১

শহীদ পরিবারের জন্য প্রস্তাবনা

১. তার পরিবারের আর্থিক সহযোগিতা দরকার

২. শহীদের ছেলের দায়িত্ব নেওয়া প্রয়োজন

শহীদ মো: জাকির হোসেন

ক্রমিক : ৩৬০

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৮

পরিচিতি

শহীদ মো: জাকির হোসেন দশমিনা উপজেলার বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের মাছুয়াখালী গ্রামের আ: মন্নান হাং ও আম্বিয়া বেগম দম্পতির ছেলে। প্রায় ১৫ বছর আগে বাবাকে হারান তিনি। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে জাকির ছিলেন তৃতীয়। উপজেলা সদরের উত্তর লক্ষ্মীপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার নতুন বাড়িতে স্ত্রী, সন্তান ও মাকে রেখে রাজধানীর কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ থানায় একটি বোরকা কারখানায় কাজ করতেন।

শহীদ মোঃ জাকির হোসেন ১৯৯০ সালে পটুয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকেই দরিদ্রতার সাথে লড়াই করতে হয়েছে তাঁকে। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় পড়াশোনা করার তেমন সুযোগ পাননি। অল্প বয়সেই বাবাকে হারিয়ে অভিভাবকহীন হয়ে যান তিনি। সংসারের হাল ধরতে দর্জির কাজ শিখেন। নিজে পড়াশোনা না করতে পারলেও সন্তানের পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন যত্নশীল। স্বপ্ন দেখতেন মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে উচ্চ শিক্ষিত বানাবেন। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। জালিমের গুলিতে আহত হয়ে মুহুর্তেই বিলীন হয়ে গেল সকল স্বপ্ন। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হন তিনি এবং ২৪ জুলাই শাহাদাত বরন করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ জাকির হোসেনের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর আয়েই সংসার চলত। মেয়ের লেখা-পড়া, মায়ের ঔষধের খরচ, পরিবারের ভরণপোষণ সবই চলত তাঁর একক আয়ে। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারে শোকের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পরিবারে অচল অবস্থা। তাদের তেমন কোন জায়গা জমি নেই যা দিয়ে সংসার চলতে পারে। এই পরিবারটিকে সহযোগিতা করার মত তেমন কেউ নেই।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

মো. জাকিরে হোসেনের পরিবার বলেন, ১৯ জুলাই (শুক্রবার) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনে সংঘর্ষ চলাকালে শনির আখড়া রায়েরবাগ ওভার ব্রিজ এলাকায় রাস্তায় পেটে গুলিবিদ্ধ হন জাকির। খবর পেয়ে জাকিরের ভগ্নিপতি তৌহিদুল ইসলাম গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৪ জুলাই (বুধবার) রাত ১২টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। জাকিরকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ পরিবারের সদস্যরা। স্বামীর ছবি বুকে চেপে অনবরত কাঁদছেন স্ত্রী। বাবার জন্য আর্তনাদ ১৩ বছরের শিশু জিদনী জেবিনের। ছেলে হারানোর শোকে পাগলপ্রায় মা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে জাকিরের মরদেহ বাড়িতে নেওয়া হয়। এ সময় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। ওই রাতেই উত্তর লক্ষ্মীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাজা হয়। পরে তাঁকে উপজেলার বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের মাছুয়াখালী গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে আত্মীয় স্বজনদের অনুভূতি

পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার যুবক জাকির হোসেন (৩৫) গত ১৯ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনে রাজধানীর শনির আখড়ায় গুলিবিদ্ধ হন। পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মারা যান তিনি।

একনজরে শহীদ মোঃ জাকির হোসেন

নাম	: শহীদ মোঃ জাকির হোসেন
জন্ম	: ০১/০৩/১৯৯০
জন্ম স্থান	: পটুয়াখালী পেশা: দর্জি
পিতা	: মরহুম আ: মন্নান হাং
মাতা	: মোছা: আম্বিয়া বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, বিকাল ৩টা
শাহাদাতের তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪ রাত ১২টা
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: পশ্চিম লক্ষীপুর
	: ইউনিয়ন: সদর
	: থানা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী

প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারকে মাসিক ও এককালীন আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে
২. শহীদের কন্যার লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে
৩. শহীদের মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করা যেতে পারে

জাকিরের বাড়িতে গিয়ে জানা যায়, মা আম্বিয়া বেগম ছেলেকে হারিয়ে পাগলপ্রায়। স্বামীর ছবি বুকে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে অবিরত বিলাপ করছেন স্ত্রী সালমা বেগম। বাবাকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জন্ম নিবন্ধন সনদ
নাম: মো: জাকির হোসেন
লিঙ্গ: পুরুষ
সন্তানের ক্রম: ২
জন্মস্থান: পটুয়াখালী
পিতার নাম: আ: মন্নান হাং
পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী
মাতার নাম: মোসা: আম্বিয়া বেগম
মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

পড়ছে একমাত্র মেয়ে জিদনী জেবিন। তাঁর মৃত্যুতে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে পরিবারটির।

জাকিরের স্ত্রী সালমা বেগম বলেন, আমার স্বামী ঢাকায় একটি বোরকা কারখানায় কাজ করত। একমাত্র তার উপার্জনেই চলত আমাদের সংসার। মায়ের ওষুধ ও সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে অভাব অনটনের মধ্যে কোনো রকমে দিন চলত। এখন আমাদের কী হবে, একমাত্র সন্তানের লেখাপড়ার খরচ কীভাবে চালাব, বুঝতেছি না। আমার স্বামীর জন্য দোয়া করবেন।

শহীদ মো. জাকির হোসেনের একমাত্র মেয়ে দশমিনা সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী জিদনী জেবিন বলে, আমার বাবা অনেক ভালো ছিল। আমি যা চাইতাম তাই দিত। এখন আমার লেখাপড়ার খরচ কে চালাবে? আমার বাবার হত্যাকারীদের বিচার চাই। সে আরো বলে, বাবা কয়েক দিনের ছুটিতে বাড়িতে এসে গত ১৫ জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় কর্মস্থল ঢাকার কালীগঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেন। যাওয়ার সময় আমাকে বলেন, পরের বার তোমার জন্য সুন্দর থ্রী-পিস ও স্কুলব্যাগ নিয়ে আসব। শহীদ জাকিরের মা, আম্বিয়া বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আপনারা কী শুনতে আসছেন। আপনারা আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন। আমার ছেলেকে যারা গুলি করে মেরেছে, আমি তাদের বিচার চাই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
মোঃ জাকির হোসেন
MD. JAKIR HOSSEN
আঃ মন্নান হাং
মোসাঃ আম্বিয়া বেগম
Date of Birth 01 Mar 1990
NID No. 508 267 0703

শহীদ মোঃ আরিফ

ক্রমিক: ৩৬১

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৪৯

পরিচিতি

শহীদ মোঃ আরিফ। তিনি পটুয়াখালী জেলার গোবিন্দপুর এলাকায় ২ মে ১৯৯০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম প্রয়াত সবুজ আলী। মাতা সূর্য বানু। মূলত আরিফ এই বাবা মায়ের পালিত ছেলে। আরিফ দিনমজুরি ও রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার আয়েই তাদের সংসার চলত। স্ত্রী ও ৩৪ দিনের একটি কন্যা সন্তান নিয়েই তার পরিবার। ২০ জুলাই ২০২৪, বেলা ১২.৩০ মিনিটে যাত্রাবাড়ি এলাকার শনির আখড়ায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

জুলাই ২০২৪ এর আন্দোলন ছিল ইতিহাস তৈরির আন্দোলন। ফ্যাসিবাদের জুলুমের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠার আন্দোলন। যৌক্তিক দাবীর প্রেক্ষিতে মেধার স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন। তরুণ শিক্ষার্থীদের একটাই চাওয়া কোটা নয় মেধা। কিন্তু জালিম ফ্যাসিবাদী হাসিনা তরুণদের যৌক্তিক চাওয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে

জাতির সাথে করেছে উপহাস। স্বৈরশাসক হাসিনা শত হাজার তরুণ শিশু বৃদ্ধকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে সোচ্চার ভূমিকায় ছিল অবতীর্ণ। তার গঠিত সর্বোচ্চ আইনের অপব্যবহার করে তিনি মানুষকে করেছে পদদলিত। ক্ষমতার লিপ্সায় অন্ধ হাসিনা ভুলে গেছে ক্ষমতার দৌড় যত দীর্ঘই হোক না কেন তার একদিন বিনাশ হবেই। আল্লাহ তাআলা তরুণদের মাধ্যমে দেখিয়েছেন ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। মাত্র একটি কোটা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে। অধিকারের লড়াইয়ে যুক্ত হয় অগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। কোটা থেকে এক দফায় জ্বলে ওঠে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের পাশপাশি সুশীল সমাজও। দেশকে দ্বিতীয়বার স্বাধীন করার দৃঢ় প্রত্যয়ে মানুষ মাঠে নামে। বাঁচলে গাজী মরলে শহীদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুনদের সাথে একাত্ম হয়ে মাঠে নেমে আসে হাজারো স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে খেটে খাওয়া মানুষ। জড়িয়ে পড়েছিলেন অভিভাবকেরাও। নারী অভিভাবকেরা তাদের শিশু সন্তানকে সাথে নিয়েও যুক্ত হয়েছিলেন অধিকার আদায়ের এ সংগ্রামে। দেশকে বাঁচাতে হাজারো মানুষের রক্তে বদলে যায় বাংলাদেশ। ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

জীবনের কঠিন বাস্তবতায় নিষ্পেষিত বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকারের নির্মম নিষ্ঠুরতার স্বীকার হাজারো শহীদ। যাদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আজকের এই দ্বিতীয় স্বাধীনতা ২০২৪। এই আন্দোলন চলাকালীন স্বৈরশাসক হাসিরা সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও র‍্যাব বাহিনী মানুষের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। রাজপথে নিরস্ত্র জনগণের উপর টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এতেও যখন আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে ব্যর্থ তখন হাসিনা তার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চরম বর্বর আচরণ প্রকাশ করে। তার নির্দেশে হেলিকপ্টার থেকে পুলিশ ও র‍্যাব বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্র জনতা ও সাধারণ জনগণের উপর গুলি বর্ষন করে। মুহূর্তে ঢাকার রাজপথে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। ওই সময়ে আরিফ যাত্রাবাড়ি এলাকার শনির আখরায় রিকশা চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন হেলিকপ্টার থেকে পুলিশ ক্রমাগত গুলিবর্ষণ চলছিল। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলিতে ছাত্রজনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রায়েরবাগ এলাকায় রিকশা চালানো

অবস্থায় বেলা ১২ টার দিকে হেলিকপ্টার থেকে গুলিবিদ্ধ হয় আরিফ। সেখানেই তিনি আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আশেপাশের পরিচিত রিকশাওয়ালারা তাকে বাসায় নিয়ে আসে। বাসায় আনার অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

পোস্টমর্টেমের জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে দুদিন পর তাকে মাতুয়াইল কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়র বক্তব্য

পালিত বাব-মায়ের কাছে বড় হন আরিফ। কিন্তু তিনি তাদেরকেই বাব মা হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি মাকে নিজের কাছেই রাখতেন। তার একার উপার্জনে সংসার চলত। মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ ছিলেন। তাকে হারিয়ে তার পরিবার এখন দিশেহারা।

আর্থিক সহযোগিতার বিষয়

শহীদ আরিফ ছিলেন এতিম। তিনিই তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বর্তমানে তার পালক মা, স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে। তাদের ভরণপাষণের ব্যবস্থা করে শহীদ পরিবারকে মাসিক আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন। যেন তার পালক মা যতদিন বেঁচে থাকে তার থাকা থাওয়ার কষ্ট না হয়। পাশপাশি তার স্ত্রী যেন তার মেয়েকে পড়াশুনা করিয়ে মানুষ করতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
মোঃ আরিফ
Name
MD. ARIF
পিতা
মোঃ সবুজ আলী
Date of Birth 02 May 1996
NID No. 508 789 8333

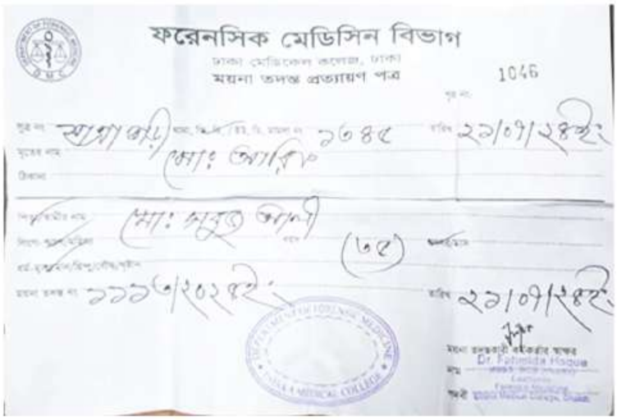

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ
ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ময়না তদন্ত প্রত্যায়ণ পত্র
1046

এক নজরে শহীদ মোঃ আরিফ

নাম	: মোঃ আরিফ
পেশা	: দিনমজুর, রিকশা চালক
পিতা	: মৃত সবুজ আলী
মাতা	: সূর্য বানু, পেশাঃ গৃহিনী, বয়সঃ ৬০ বছর
জন্ম তারিখ ও বয়স	: ০২-০৫-১৯৯০, বয়সঃ ৩৪ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: পটুয়াখালী জেলার গোবিন্দপুর এলাকা
আহত হওয়ার সময়	: আনুমানিক দুপুর ১২টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ২০ জুলাই ২০২৪, সময়ঃ আনুমানিক বেলা ১২.৩০মি.
শহীদের কবরের অবস্থান	: মাতুয়াইল কবরস্থান
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ২ জন, স্ত্রী ও একটি মেয়ে
মেয়ের নাম ও বয়স	: আব্দুল্লাহ স্বাধীন, বয়সঃ ৩৪ দিন

আর্থিক সমস্যা নিরসনে প্রস্তাবনা

১. শহীদের স্ত্রীর জন্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২. নিয়মিত মাসিক ভাতার মাধ্যমে পরিবারটিকে সহায়তা করা
৩. এতিম মেয়েটির ভরণ-পোষণ ও পড়াশোনার দায়িত্বভার গ্রহণ করা

শহীদ বাবলু মৃধা

ক্রমিক : ৩৬২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫০

পরিচিতি

শহীদ বাবলু মৃধার জন্ম ১৯৭৭ সালে পটুয়াখালীর এক দরিদ্র পরিবারে। তাঁর পিতা জনাব মফেজ আলী মৃধা (৭৫) পেশায় একজন দর্জি। তাঁর মায়ের নাম মোছা: হনুফা বেগম। শহীদ বাবলু মৃধা পেশায় একজন দিনমজুর। নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। শহীদ বাবলু মৃধা ২ সন্তানের জনক। জুলাই বিপ্লবে পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরন করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ বাবলুর পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। দিন আনে দিন খায়। তাঁর পিতা মাতা দুজনেই বয়স্ক। পিতা জনাব মফেজ আলী মৃধা দর্জির কাজ করেন। শহীদ বাবলু মৃধা তাঁর দুই সন্তান

নিয়ে আলাদা থাকেন। তিনিই পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তাঁর আয়েই সংসার চলে। তাঁর বড় ছেলে আবু তালেব সজীব দনিয়া সরকারি কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে অধ্যয়নরত আর ছোট ছেলে মোঃ মাহিমের বয়স মাত্র ২ বছর ৬ মাস। বাবার মৃত্যুতে বড় ছেলে অত্যন্ত ভেঙে পড়েছে। তাদের দেখাশোনা করার জন্য আর কেউ নেই। দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী খুব বিপাকে পড়েছেন। বড় ছেলের পড়াশো, ছোট ছেলের খাবারের জোগান এবং চিকিৎসার যোগান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা

জুলাইয়ের শুরু থেকেই কোট্ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশ এবং সরকারের পেটুয়া বাহিনী হামলা করে। সারাদেশে পুলিশের গুলিতে শতাধিক আহত হয় এবং নিহত হয় আরও অনেকে। শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৯ জুলাই ২০২৪ শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ঢাকার যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, রামপুরা-বাড্ডা, সায়েন্সল্যাব, মিরপুর ১ ও ১০, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, সাভার ছিল আন্দোলনের মূল হটস্পট। দেশের বিভিনন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়।

১৯ জুলাই রাজধানীর শনির আখরাতে পুলিশের গুলিতে আহত হন শহীদ বাবুল মৃধা। সেখানেই পড়ে থাকেন শহীদ বাবুল মৃধা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয় দুই জন লোক এসে তাঁকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। কর্তব্যরত চিকৎসকরা জানান দ্রুত তাঁর অপারেশন করতে হবে। কিন্তু তাঁর স্বজনরা কেউ না থাকায় অপারেশন শুরু করতে দেরি করেন ডাক্তাররা। রাত ৩ টায় খবর পেয়ে শহীদ বাবুল মৃধার স্ত্রী এবং তার স্বজনরা দ্রুত হসপিটালে আসেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ধার-দেনা করে দেড় লক্ষ টাকা ম্যানেজ করেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর অপারেশন শুরু হয়। অপারেশন করে ডাক্তাররা গুলি বের করে আনেন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকায় তাঁর শরীরর থেকে প্রচণ্ড পরিমাণ রক্ত ক্ষরণ হয়। তাকে ১৯ ব্যাগ রক্ত দিতে হয়। তাঁর পেটে বড় আঁকারের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। রক্ত দেওয়ার পর তাঁর শরীরে রক্ত থাকত না। রক্ত পড়ে শেষ হয়ে যেত। অপারেশন শেষ করে তাঁকে আইসিইউ তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৯ দিন ভর্তি ছিলেন। এ সময় কোন খাবার খেতে পারেননি। ১৯ দিন পর তাঁকে আইসিইউ থেকে বের করে বেডে দেওয়া হয়। তিনি কিছুটা সুস্থতা বোধ করেন। এরপর আবার অসুস্থ হয়ে যান। সেখানে তাঁর চিকিৎসার কিছুটা গাফিলতি হয়। ঠিকমত ড্রেসিং না করায় তাঁর ক্ষততে ইনফেকশন হয়ে শরীরে পচঁন ধরে। রক্ত মাংস গলে গলে পড়তে শুরু করে। অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। এরপর অন্তবর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল থেকে তাঁকে ডিজি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিন দিন রাখা হয়। অবস্থার কোন উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে সিএমএইচ হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর আরও তিনটি অপারেশন করা হয়। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয়না। পেটে ব্যথা, রক্ত ক্ষরণ কোনভাবেই থামে না। ইনফেকশনের কারনে পেটের সবকিছু পঁচে যায়। খাবার পানি খেলেও তা ধরে রাখতে পারত না। অবস্থা বেগতিক হলে ডাক্তাররা আবারও অপারেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেসময় ডাক্তাররা বলেন, এবার অপারেশ করলে আর নাও বাঁচতে পারেন। বৃহস্পতিবার তাঁর অপারেশ করা হয়। তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে সোমবার ৯ সেপ্টেম্বর তিনি শাহাদাতের অমীয় শুধা পান করেন। লাশবাহী গাড়িতে করে শহীদ বাবুল মৃধার লাশ তাঁর নিজ গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের স্ত্রী বলেন, আমার স্বামী একজন নিরপরাধ মানুষ। কিন্তু পুলিশ তাকেও ছাড়ল না। এখন কি করমু আমি। ছেলে দুইডারে নিয়ে কোথায় যামু। ওর বাপের ইচ্ছে ছিল ছেলেটাকে পড়াশোনা করিয়ে মানুষের মত মানুষ বানাবে। এজন্য ছেলেকে ঢাকা নিয়ে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু তা আর হল না। এখন ছেলেকে মানুষ করবে কে। ছোট ছেলেটার খাওন খরচ কিভাবে যোগাড় করমু। ছোট ছেলেটা ওর বাপের মুখটাও মনে রাখতে পারবে না। ওর বাবা যে কে ছিল এই কথাটাও বলতে পারবে না।

শহীদ বাবুল মৃধার বাল্য বন্ধু কাওসার আলম (সহকারী শিক্ষক) বলেন, মোঃ বাবলু মৃধা তার পিতা মফেজ মৃধা আমি তাকে চিনি ও জানি। সে ছোট বেলা হতে খুব ভাল মানুষ ছিল। তাঁর ব্যবহার অত্যান্ত চমৎকার ও বিনয়ী। সমবয়সী হওয়ায় আমরা এক সাথে খেলাধুলা করতাম। তার এমন মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত।

শহীদ পরিবারের আকুতি

শহীদের স্ত্রী মিনতি করেছনে তাদের পরিবারের পাশে দাড়ানোর জন্য। তার ছোট ছেলেটার দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। আর তাঁর বড় ছেলের যেন একটি চাকরি হয় সেজন্য অনুরোধ করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
মোঃ বাবলু মৃধা
Name
MD. BABLU MRIDHA
পিতা
মফেজ আলী মৃধা
মাতা
মোসাঃ হনুফা বেগম
Date of Birth 20 Mar 1977
ID NO 280 143 7936

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	: শহীদ বাবলু মৃধার
পেশা	: দিনমজুর, নির্মাণ শ্রমিক
জন্মতারিখ	: ২০/০৩/১৯৭৭
বয়স	: ৪৭ বছর
পিতা	: মফেজ আলী মৃধা, বয়স: ৭৫ বছর
মাতা	: মোছাঃ হনুফা বেগম
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শনির আখরা, ঢাকা
শাহাদাতের তারিখ	: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
শাহাদাতের স্থান	: সিএমএইচ হসপিটালে ভর্তিরত অবস্থায় শাহাদাত বরন করেন
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: খারিজা বেতাগী, ৩নং বেতাগী সান, দশমিনা, পটুয়াখালী

শহীদ মোঃ মনির

ক্রমিক : ৩৬৩

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫১

“বীর সেনানী শহীদ মনির”

জন্ম ও পরিচিতি

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই সংগ্রামী। সংগ্রামে, বিপ্লবে, গণঅভ্যুত্থানে বিশ্বের বিস্ময় হিসেবে বাঙালি শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসেবে আলোচিত হতে থাকবে। অর্জনের ঝুলিতে জমা হয়েছে অনেকগুলো মণিমাণিক্য। যেমন: '৫২ এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণ গণঅভ্যুত্থান, '৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সর্বশেষ ৫ আগস্টের দ্বিতীয় স্বাধীনতা। ৫ আগস্ট দ্বিতীয় স্বাধীনতা এজন্য যে এই আন্দোলন বাংলাদেশের মানুষ বিদেশি পরাশক্তির সাহায্য ছাড়াই একটি দখলদার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধের একক হকদার দাবী করা আওয়ামী লীগের সরকার বার বার বলতো তারাই বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছে। আর এই স্বাধীনতার পিছনে ছিল ভারত। এভাবে ভারতকে মহিমান্বিত করে বাংলাদেশের মানুষের অংশগ্রহণকে তারা বার বার অবজ্ঞা করেই চলতো। দীর্ঘ ১৫ বছর আওয়ামী লীগের সরকার ছিল অনির্বাচিত।

এই ফ্যাসিস্ট সরকারটিকে টিকিয়ে রাখতে মূখ্য ভূমিকা রাখে ভারত। তাই জুলাই আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা নতুন করে স্বাধীনতা অর্জন করি। দিনটি ছিল সোমবার। বাঙালি জাতির স্মরণীয় একটি দিন। টানা ১৫ বছর পর পরাজয় হলো ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের। কোটা আন্দোলনের জেরে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা। ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে গণভবন থেকে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন শেখ হাসিনা। সরকারের পদত্যাগের দাবিতে চলমান অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লং মার্চ টু ঢাকা ছিল আজ। এর আগে দুই দিনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গড়ে ওঠা এই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। পুরো জুলাই মাসজুড়ে চলে এই আন্দোলন। একপর্যায়ে সরকার কোটা সংস্কার করে। তবে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার জেরে এক দফা দাবি উঠে শেখ হাসিনার পদত্যাগ। আজ বেলা ১১টার পর থেকে ঢাকার পথে ঢল নামে মানুষের। কারফিউ উপেক্ষা বিভিন্ন স্থান থেকে আসতে শুরু করেন তারা। এক পর্যায়ে শাহবাগ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে। কিন্তু ঐদিন সকালেও পুলিশ, আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ বিভিন্ন বাহিনীকে দাঁতাল দানবের মতো মানুষ হত্যা করতে দেখা যায়। রাজধানীর বংশালে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচিতে আসা অন্দোলনকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে পুলিশ, র‍্যাব, এপিবিএন সদস্যরা। পুলিশের গুলিতে অনেকের সাথে নিহত হয় মো: মনির। শহীদ মনির বিএনপির রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিল। তিনি ১৯৯০ সালে ফেব্রুয়ারি ১ তারিখে ভোলায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জয়নাল আবেদীন একজন শ্রমিক। মাতা শাহেদা বেগম একজন গৃহিণী। শহীদ মনির ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

যেভাবে শহীদ হয়

শহীদ মোঃ মনির ছোট থেকেই পিতামাতার চক্ষু শীতলকারী সন্তান ছিলেন। ছোট থেকে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় পড়াশোনা বেশি আগাতে পারেননি। তিনি অনেক কষ্ট করে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা চালান। পরে বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য ঢাকায় এসে সবজি ব্যবসার কাজ শুরু করেন।

শহীদ মনির অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসে ছিলেন ভালো টাকা পয়সা ইনকাম করে তার পরিবার ও ছেলে সন্তান কে ভালো রাখবে ও তাদের পড়ালেখার খরচ চালাবে কিন্তু স্বপ্ন গুলো যেন স্বপ্নই রয়ে গেলো। ঘাতকের একটা গুলি এসে তার জীবনের সকল চাহিদা আর চাওয়া পাওয়া গুলো নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যায়।

স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কার আন্দোলন কে ঘিরে গড়ে ওঠে সরকার পতনের আন্দোলন। হাজার হাজার মানুষ কে নির্বিচারে গুলে করে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কবৃন্দ মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ডাক দেয়।

জুলাই মাসের ১৭ তারিখ কঠিন আন্দোলন শুরু হয়। তারপর ১৮ তারিখে দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ হাতে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ছাত্রদের উপর গুলি চালায় কিন্তু তাতেও তারা থেমে থাকেনি সেই দিন রাত থেকে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয় মিথ্যা ছলনা করে। প্রায় ৫ দিন নেটওয়ার্ক বন্ধ রেখে সরকারি পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়। অনেক লাশ গুম করা হয়। সর্বশেষ ছাত্রদের দাবি মেনে না নিয়ে আরো বেশি আঘাত হানার চেষ্টা করে তৎকালীন অবৈধ হাসিনা সরকার। ছাত্ররা রাজপথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় এবং ৫ তারিখ মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। যেখানে সাধারণ ছাত্রদের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হচ্ছে সেখানে একজন সুস্থ মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে না তাই মনির ৫ তারিখ মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি তে যোগ দেন।

৫ আগস্ট দুপুরে শহীদ মনির আন্দোলনে যোগ দেয়। বংশালে আন্দোলনে নির্বিচারে গুলি চালায় ঘাতক পুলিশ। হতাহতের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে দুপুর ১২ টায় পুলিশের গুলি এসে লাগে মনিরের পেটে। ঘাতকের বুলেটটি পেট দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। ৫ আগস্ট রাত ১১ টায় পিজি হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন এই সাহসী যোদ্ধা। শহীদ মনিরের অভাবগ্রস্থ পরিবার তার মৃত্যুতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সংসারে তার স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে রয়েছে।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

মো: কায়ছার সম্পর্কে শশুর বলেন, এমন একটি ছেলে আর আমি পাবো না। আমার মেয়ের ২টি সন্তানসহ মেয়ের একটি ঘর নেই। তার জন্য সবার সুদৃষ্টি কামনা করছি।

স্ত্রীর জানান, এক ছেলে এক মেয়ে রেখে তার বাবা মারা গেলো। বাবার লাশ পেয়ে মেয়ে বলে ভাই বাবাকে নিয়ে ঘরে চলো। ছেলে তার বাবাকে প্রথম দেখে এমনি নিয়ে আসছে পরে যখন দেখে বাবা আর কথা বলতেছেনা তখন ছেলে বুঝছে বাবা মারা গেছে । তখন বাবারে ধরে চিৎকার দিয়ে মুখে চুমু দিচ্ছে। আমার ছেলে মেয়ে এখন এতিম তাদের দেখার এখন আর কেউ নেই। আপনারা ছেলে মেয়েদের খেয়াল রাখবেন। তাদের বাবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তার বাবাকে জান্নাত নসিব করেন।

মো. লোকমান হোসেন (স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক) বলেন, শহীদ মো. মনির খুব পরিচিত ও আত্মীয়। আমরা একই ওয়ার্ডে বসবাস করি। সে আমার ভাগিনা সম্পর্কে প্রায় কথা বলতেন। তার শত সমস্যা শর্তেও ছেলেকে ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করিয়ে একজন ভালো আলেম বানানোর ইচ্ছা ছিলো। সে ঢাকা শহরে সামান্য একটা কাঁচা মালের ব্যবসা করতেন তার পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। বিধবা স্ত্রীর থাকার একটি ঘর নেই। দুইটি সন্তানের পড়ালেখার অনিশ্চয়তায় এই পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সর্বজনের ঈমানের দাবী।

মো: নওয়াব (আপন চাচা) বলেন, এরকম ভাতিজা আর ফিরে পাবো না। এরা ছোটবেলা থেকেই ঢাকায় ছিলো। কোন বাড়ী ঘর নেই। তাই আপনাদের সকলের সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

প্রিয় ভাইকে হারিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বোন স্বপ্না বলেন, আমার ভাই আর আসবে না। আমি চাই আমার ভাই পরকালে ভালো থাকুক।

Government of the People's Republic of Bangladesh
জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate
Birth Registration Number
Date of Birth
In Word
: First of February Nineteen Ninety
Name
Mother
: Saheda Begum
Nationality
: Bangladeshi
Father
Nationality
: Bangladeshi
Place of Birth
: Bhola, Bangladesh
Permanent Address
Seal & Signature
Assistant to Registrar (Preparation, Verification)
Seal & Signature
Registrar

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

শহীদের পূর্ণ নাম	: শহীদ মো. মনির (৩৪)
পেশা	: সবজি ব্যবসায়ী
স্থায়ী ঠিকানা	: আলতাফ আলী দফাদার বাড়ি, শম্ভুপুর, ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: ঢাকা
জন্ম তারিখ	: ০১/০২/১৯৯০
পিতা	: মো. জয়নাল আবদীন (৫৫)
পেশা	: শ্রমিক
মাতার নাম	: শাহেদা বেগম (৪৫)
পেশা	: গৃহিণী
শহীদের ছেলে-মেয়ে	: ১. মো: আবির (০৯)
	: ২. মোছা: জুনয়া (০৫)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৪ জন
পারিবারিক আয়	: ৬০০০ টাকা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ: ০৫/০৮/২০২৪ সময়: দুপুর ২টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ০৫/০৮/২০২৪, রাত ১১টা, বংশাল

যেভাবে সহযোগিতা করা যায়

১। শহীদ ভাতা দেয়া যেতে পারে

২। ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়

৩। স্ত্রীর কর্মসংস্থান

শহীদ মোঃ রাব্বি

ক্রমিক : ৩৬৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোঃ রাব্বি (২০) ছোট থেকেই পিতামাতার চক্ষু শীতলকারী সন্তান ছিলেন। ছোট থেকে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় পড়াশোনা বেশি আগাতে পারেননি। তিনি অনেক কষ্ট করে মাদ্রাসায় ৮ম শ্রেনি পর্যন্ত পড়ালেখা চালান। পরে বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য অভাবের তাড়নায় চট্টগ্রাম বহদ্দারহাট এলাকায় রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন।

পারিবারিক জীবন

শহীদ রাব্বি অনেক স্বপ্ন নিয়ে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। নতুন বিয়ে করেছেন মাত্র ৫ মাস হয়েছে। তার স্ত্রী কে সেভাবে সময় দিতে পারেনি তিনি। ভালো থাকার জন্য টাকা পয়সা আয় করে তার পরিবার ও মা বাবা কে ভালো রাখবে ও তাদের সকল খরচ চালাবে কিন্তু স্বপ্ন গুলো যেন অধরাই রয়ে গেলো। ঘাতকের একটা গুলিতে তার জীবনের সকল চাহিদা আর চাওয়া পাওয়া গুলো নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যায়।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আহ্বানে সরকার পতনের তীব্র আন্দোলন। হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সমন্বয়কদের ডাকা 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে জুলাই মাসের ১৭ তারিখ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শুরু হয়। তারপর ১৮ তারিখে দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন দমন করতে ঘাতক পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ হাতে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ছাত্রদের উপর গুলি চালায় কিন্তু তাতেও তারা থেমে থাকেনি সেই দিন রাত থেকে ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা ছলনা করে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা ছাত্র আন্দোলন ক্রমেই মুক্তিকামী জনতার গণ আন্দোলনে রূপ নেয়।

প্রায় ৫ দিন নেটওয়ার্ক বন্ধ রেখে সরকারি পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের উপর চালায় ইতিহাসের নৃশংস বর্বরোচিত হামলা। বীভৎস গণহত্যা চালিয়ে লাশ গুম করা হয়।

সর্বশেষ ছাত্রদের দাবি মেনে না নিয়ে আরো বেশি আঘাত হানার চেষ্টা করে অবৈধ হাসিনা সরকার। ছাত্ররা রাজপথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় এবং ৫ তারিখ 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

আন্দোলনে যোগদান ও শাহাদাত বরণ

অকুতোভয় সৈনিক মোঃ রাব্বি ৪ তারিখ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে মুক্তিকামী জনতার সাথে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে শরীক হয়। সকল ভয় দূরে সরিয়ে সক্রিয়ভাবে মিছিলের সম্মুখভাগে স্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হতে থাকে। এক পর্যায়ে ঘাতক পুলিশ ও শুরু থেকে ওঁত পেতে থাকা সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের যৌথ হামলায় মাথায় ও গলায়সহ সারা শরীরে নির্মমভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। মুহূর্তেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। কঠিন পরিস্থিতে রাস্তায় পড়ে থাকা তার রক্তাক্ত নিথর দেহ কোনোভাবেই উদ্ধার করা যাচ্ছিলো না। কোনোভাবে মিছিলে আসা তার পাশের লোকেরা রাব্বিকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করেন। চরম মরণ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মোঃ রাব্বি সন্ধ্যা ৭ টার সকল মায়া ত্যাগ করে এই দুনিয়া ছেড়ে জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ে যান। রেখে যান তরুণ প্রজন্মের জন্য বিপ্লবী অনুকরণীয় অনুস্মরণীয় গৌরবময় স্মৃতি গাঁথা।

স্বজনদের অব্যক্ত অনুভূতি

সুমাইয়া বেগম (স্ত্রী) বলেনঃ আমার স্বামী ফজলে রাব্বি। সে চট্টগ্রামে বহদ্দারহাটে ঘাতক পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়। আমার তার সাথে ৫ মাস আগে বিয়ে হয়েছে। মৃত্যুর একদিন আগে আমার সাথে কথা হয়। জীবিত থাকতে আমার জন্য প্রত্যেক মাসে ২/৩ হাজার করে টাকা পাঠাতো। সেই দিন আমি মাগরিবের নামাজ পড়তে ছিলাম। হঠাৎ শুনি আমার স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এই খবর শুনে আমার চারপাশ অন্ধকার করে আসে। মুহূর্তেই সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা হতে লাগে। এত তাড়াতাড়ি আমাকে এভাবে একা করে দিয়ে চলে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার স্বামী হত্যার বিচারের জোর দাবি জানাচ্ছি।

জয়তুন নেসা (মা)বলেনঃ আমার ছেলে ফজলে রাব্বি মাদ্রাসায় পড়ালেখা করার পর চট্টগ্রামে রাজমিস্ত্রী কাজ করতো। বড়ো ভাই রাসেলের সাথে থাকতো। রাসেল বিদেশে ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে যাওয়ার পর এখনো ৪ লক্ষ টাকা দেনা। বিভিন্ন সমিতির ৫টি কিস্তি চালায় সে। আমার ছেলে সবসময় কল দিয়ে সান্ত্বনা দিত। সে নিয়মিত নামাজ পড়তো। আমার ছেলে গুলি খাইছে এ কথা শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই।

বিবি সুরমা (মেঝো বোন) বলেনঃ আমার ভাই কে গুলি করে হত্যার পর আমরা নিস্তব্দ। পেটের টানে অভাবের সংসারের অভাব পূরণের জন্য চট্টগ্রামে যায় সে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। সেই দিন ভাই মৃত্যুর পর থেকে আমাদের সংসারে টাকা পাঠানোর মত কেউ নেই। আমার বাবা প্যারালাইসিস রোগী। খুনি হাসিনাকে যাতে দেশে এনে বিচার করা হয় আমি সেই দাবি জানাই।

প্রস্তাবনা

শহীদের স্ত্রীর ৫ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করার কথা জানান।
থাকার ঘরটি পাকা করার অনুরোধ করেন।
একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকলে নিয়মিত আয় দিয়ে সংসার চালাইতে পারতাম। স্ত্রী হিসেবে আমি আবার পড়ালেখা করে যাতে একটা চাকুরি পেতে পারি সেই আশা করি।
ছোট দুই বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানোর ব্যবস্থা করা।
প্যারালাইসিস বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৪নং জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ

চরফ্যাসন, ভোলা

জন্ম সনদ

(জন্ম নিবন্ধন বহি থেকে উদ্ধৃত)

নিবন্ধন বহি নং- ০৮

জন্ম নিবন্ধন নম্বর ঃ ২০০৪০৯১২৫৬৩১০২৭০৪

লিঙ্গঃ পুরুষ।

কথায় এক জানুয়ারী দুই হাজার আট।

জাতীয়তাঃ বাংলাদেশী।

জাতীয়তাঃ বাংলাদেশী।

(নিবন্ধকের স্বাক্ষর ও সীলমোহর)

Government of the People's Republic of Bangladesh

জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পূর্ণ নাম	: মোঃ রাব্বি
জন্ম	: ০১-০৫-২০০৪
জন্মস্থান	: ভোলা
পেশা	: রাজমিস্ত্রি
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ওয়ার্ড নং-৯, ইউনিয়ন: জাহানপুর , থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা
পিতার নাম	: মো. সেলিম, পেশা ও বয়স: জেলে-৪৯
মায়ের নাম	: জয়তুন নেসা, পেশা ও বয়স: গৃহিণী-৪৬
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ০৪/০৮/২০২৪, বদ্দারহাট, চট্টগ্রাম
আহত হওয়ার সময়	: ০৪/০৮/২০২৪, সময় : সন্ধ্যা-৭টা
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ ও সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময়, স্থান	: ০৪/০৮/২০২৪, বদ্দারহাট, চট্টগ্রাম
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: জাহানপুর, চরফ্যাশন, ভোলা

শহীদ মো: ইয়াসিন

ক্রমিক : ৩৬৫

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৩

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ইয়াসিন ৫ জুলাই ২০০৬ সালে ভোলা জেলার অন্তর্গত বোরহান উদ্দিন উপজেলার দেউলা বড়পাতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা লাল মিয়া একজন কৃষক এবং মাতা লিলুফা একজন গৃহিণী। মো: ইয়াসিনের বড় একটি পরিবার। বড় ৪ ভাই বিবাহিত দিন মজুর রাজমিস্ত্রীর কাজ করে সংসার চালান। অন্য দিকে ২ বোন বিবাহিত কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকায় শহীদ ইয়াসিনের মাঝে মাঝে বোনদের কিছু দায়িত্ব নিয়ে খরচ বহন করতে হত। বড় ভায়েরা থাকলেও তারা কোন সহযোগীতা করতো না। মা-বাবা ছোট একটি টিনের ঘরে বসবাস করেন। কিন্তু তারা বয়স্ক হওয়ায় চলাফেরা করা খুবই কষ্টকর।

শহীদ মোঃ ইয়াসিন ছোট থেকেই পিতামাতার চক্ষু শীতলকারী সন্তান ছিলেন। ছোট থেকে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় পড়াশোনা বেশি আগাতে পারেন নি। পরে বাধ্য পরিবারের জন্য ঢাকায় এসে রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ ইয়াসিনের আয়ের অর্থ দিয়ে মোটামুটি ভালোই চলছিলো তার পরিবার ও ছোট দুইবোনের জীবন। ছোট দুইটা বোন কে বিয়ে দিয়েছিলো কিন্তু বোনের শ্বশুর বাড়ীর চাহিদা ছিলো অনেক যা ইয়াসিন কিছু কিছু চাহিদা অর্থ দিয়ে সম্পূর্ণ করতেন। বোনের বিয়ের পরে আরো বড় চাহিদা ছিলো শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ থেকে যার কারণে বোনের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বোন মিষ্টি কে ঘরে তুলে নেয়নি।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হন

ইয়াসিন বলেছিলো আমি টাকা দিয়ে তাদের দাবি আদায় করে আমার বোন কে আমি সম্মানের সহিত শ্বশুর বাড়ি পাঠাবো। এই দিকে বিপ্লবী ইয়াসিনকে ঘাতক অবৈধ সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ করে পুড়িয়ে হত্যা করে ঢাকার যাত্রাবাড়ী সাইনবোর্ড এলাকায় রাস্তার উপর ফেলে চলে যায়। তার স্বপ্ন গুলো শেষ হয়ে চির বিদায় নিয়ে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে পরপারে চলে যান।

সেই দিন টা ছিলো অবৈধ সরকারের মরণ কামড়ের একটা দিন। সারা দেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের কর্মসূচী শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয়ে যায়। এক দিকে আন্দোলন অন্য দিকে ঘাতক পুলিশ ও আওয়ামী হায়েনারা ছাত্র সহ সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে শত শত মানুষ কে হত্যা করছে।

এমন কি তাদের পৈশাচিকতায় মায়ের কোলের শিশু পর্যন্ত নিরাপদ থাকতে পারেননি সেদিন। ১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার যেন ইয়াসিনের উপর এক কিয়ামত শুরু হয়ে যায়। বিকাল ৪ টায় ইয়াসিন শাহাদাতের সুধা পান করে মা-বাবা ভাই বোনদের রেখে গোটা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান আর রেখে যান বিপ্লবী স্বর্ণাজ্জ্বোল ইতিহাস। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমিন।

স্বজনদের অনুভূতি

শহীদের বাবা বলেন, আমার এই ছেলেই আমার সংসার চালাইতো। আমি এখন কিভাবে পরিবারের খরচ চালাবো। আল্লাহর কাছে আমার ছেলের হত্যার বিচার চাই।

বোন মিষ্টি বলেন, ইয়াসিন আমাদের ছোট ভাই। আমাদের সকল ভাইদের সংসার রয়েছে। তারা নিজেদের ফ্যামিলি দেখেন। ইয়াসিন ভাই আমাদের ফ্যামিলি ও দেখতেন ছোট ভাইকেও দেখতেন। প্রিয় ভাই মারা যাওয়ায় আমরা খুব কষ্টে আছি। আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ৫টা জিনিস দিতে বলে ছিলো কিন্তু আমার পরিবার দিতে পারে না। তাই আমাকে তারা শ্বশুর বাড়িতে উঠায়ে নেয় না। আমার ভাই জীবিত থাকতে বলেছেন ৫টা জিনিস দিয়েই উঠায়ে দিবেন। এখন আমার ভাই মারা গেলো আমারে কে উঠায়ে দিবে। আল্লাহ ভাইকে জান্নাত দান করুন।

মা লিলুফা বেগম বলেন, আমার ৫ টা ছেলে ২জন মেয়ে। আমার কলিজা ছিঁড়ে যায় ছেলের জন্য। ছেলে আমার সংসার দেখতো। সারা দিন রাত ছেলের জন্য কান্দি। আমার পুতেরে কারা বোম মারলো, কিভাবে আমার পুতেরে পুড়িয়ে মারলো আমি এর বিচার চাই ।

ইয়াসিনের প্রতিবেশি আবু বকর সিদ্দিক ভাই বলেন, আমার এখানে ইয়াসিন আমার বাড়ির পাশে থাকতো। সে খুব ভালো ভালো মানুষ ছিলো।

প্রস্তাবনা

বাবা মা থাকার জন্য পাকা ঘর করে দেয়া।
পরিবারকে বার্ষিক কিছু অনুদান এবং নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান করা।
বড় বোনকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

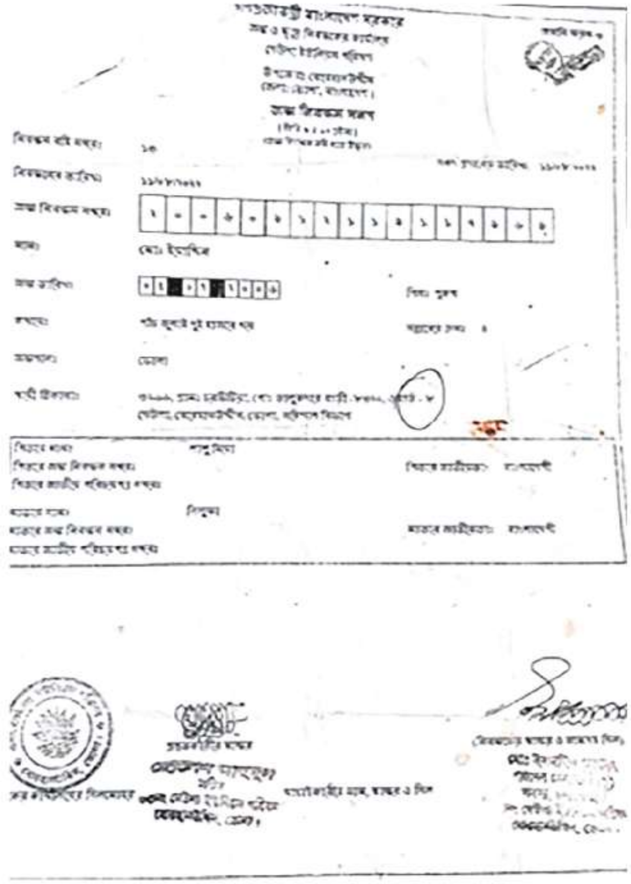

জন্ম নিবন্ধন সনদ

নাম: মো: ইয়াসিন

লিঙ্গ: পুরুষ

জন্মস্থান: ভোলা

পিতার নাম: লাল মিয়া

পিতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

মাতার নাম: লিলুফা

মাতার জাতীয়তা: বাংলাদেশী

একনজরে শহীদ মো: ইয়াসিন

পূর্ণ নাম	: মো: ইয়াসিন
জন্ম	: ০৫/০৭/২০০৬
জন্মস্থান	: বোরহান উদ্দিন দেউলা বড়পাতা
পেশা	: রাজমিস্ত্রী
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- বড়পাতা, ইউনিয়ন- দেউলা ৫ নং ওয়ার্ড, থানা- বোরহান উদ্দিন, জেলা- ভোলা
পিতার নাম	: লাল মিয়া
মায়ের নাম	: লিলুফা
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান	: ১৭ জুলাই ২০২৪
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪, শেখেরচর মাজার বাসস্ট্যান্ড
আহত হওয়ার সময়	: ১৯/০৭/২০২৪, বিকাল ৪টা
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের বিজিবি বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময়, স্থান	: ১৯/০৭/২০২৪, ১২.৪০মি, যাত্রাবাড়ি, সাইনবোর্ড
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: বাড়ির পাশে সামাজিক কবরস্থান

শহীদ মো: সজিব

ক্রমিক : ৩৬৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: সজিব ২০০৬ সালে দুলারহাটের ভোলা জেলায় বড় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদের পিতা নুরুল ইসলাম (৭০) এর ছিল ২ সংসার। ১ম সংসারের ৪ ছেলে ১ মেয়ের মধ্যে একজন ছেলে মারা যায়। ২য় সংসারে ৩ বোন এবং সজিব একমাত্র ভাই। এতো বড় সংসারে বৃদ্ধ বাবার কোন কাজকর্ম নেই, অনেক কষ্ট করে তাদের পরিবার কোনরকম দিনাতিপাত করছেন।

এমন দুরাবস্থায় পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য এবং বাবা মায়ের আশা পূরন করতে যাত্রাবাড়ী, চিটাগাংরোডের একটি গার্মেন্টস চাকুরী নেন তিনি। একমাত্র সজিবের আয়ের মাধ্যমে ২য় সংসার পরিচালনা হতো। কিন্তু সে আশা আর পূরণ হলোনা। পরিবারের প্রতি শহীদ সজিবের যেমন আন্তরিকতা ছিলো তেমনি দেশের প্রতি তার ভালোবাসার কোন অংশে ঘাটতি ছিলোনা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা ছিলেন সোচ্চার।

আন্দোলনে যোগদান

১৮ জুলাই ২০২৪ বৃহস্পতিবার 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলাবস্থায় সজিব বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রদের সাথে যাত্রবাড়ি, চিটাগাংরোডের আন্দোলনে প্রতিদিন অংশ নেয়ার চেষ্টা করেন। প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পেটুয়া পুলিশ বাহিনী সাধারণ ছাত্রদের শান্তিপ্রিয় আন্দোলনে টিয়ারশেল ও গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ বাহিনীর সাথে যুক্ত হয় যুবলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী। নৃশংসভাবে অসংখ্য শিশু,কিশোর,নারী পুরুষকে হত্যা করেই যাচ্ছে নরখেকোর দল।

শাহাদাত বরণ

সর্বশেষ ৫ আগষ্ট সরকার পতনের দিন শহীদ সজিব, বোন সালেকার (৩৪) বাসা থেকে তার ভাগনি সনিয়াকে বলে যায় আমি মিছিলে যাই। কিন্তু দু:খের বিষয় মিছিল থেকে সজিব আর ফিরে আসেনি। যাত্রাবাড়ির চিটাগাংরোডে ঘাতক পুলিশ লাশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার উপর। হায়েনার দল শুধু নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েই ক্ষান্ত ছিলো না; মেতে উঠে লাশ গুমের পৈশাচিকতায়। আন্দোলনেরে এক পর্যায়ে ঘাতক পুলিশের ছোঁড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় সজিব। মুহুর্তেই তার দুনিয়ায় আঁধার নেমে আসে। প্রচণ্ড মরণ যন্ত্রণায় রাজপথে কাতরাতে থাকে সজিব। রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়া ঘটনাস্থল থেকে কোনভাবেই তাকে উদ্ধার করার উপায় ছিলো না। ফলশ্রুতিতে রাজপথেই শাহাদাতের সুধা পান করে বিপ্লবী সজিব।

নিখোঁজ শহীদ সজিব

শহীদ সজিবের খোঁজে বৃদ্ধ বাবা মা গ্রাম থেকে ঢাকায় আসে এবং অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে সজিবকে পায়নি। এখন পর্যন্ত শহীদ সজিব নিঁখোজ।

পুলিশের কাছে সজিবের বৃদ্ধ বাবা মা অনেক অনুনয় বিনয় করেও লাশ পায়নি। এর জবাব কার কাছে পাওয়া যাবে? আদৌ কি আর পাওয়া যাবে? প্রিয় সন্তানের বিয়োগান্ত এ-অধ্যায় কিভাবে ভুলবে পরিবারটি!

শহীদ সজিব তার পরিবারের সবার কাছে ভালো,অমায়িক মানুষ ছিলেন। পরিবারের সবার ভাষ্যমতে তার মনে কোন হিংসা ছিলোনা। কোন রাগ ছিলোনা। কিন্তু সে অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দিতোনা। অবশেষে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে বৈষম্যের বিনাশ ঘটাতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে স্বৈরাচারী খুনি হাসিনার লেলিয়ে দেয়া ঘাতক পুলিশের গুলিতে তিনি শহীদ হন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদের পিতা নুরুল ইসলাম (৭০) এর ছিল দুই সংসার। প্রথম সংসারের চার ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে একজন ছেলে মারা যায়। এতো বড় সংসারে বৃদ্ধ বাবার কোন কাজকর্ম নেই, অনেক কষ্ট করে তাদের পরিবার কোনরকম দিনাতিপাত করছেন। তাই শহীদ সজিব পরিবারকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য যাত্রাবাড়ী, চিটাগাংরোডের একটি গার্মেন্টস চাকুরী নেন। ২য় সংসার একমাত্র সজিবের আয়ের মাধ্যমে পরিচালনা হতো। একদিকে সামান্য উপার্জন অন্যদিকে পরিবারে বাড়তি সদস্য সংখ্যা, যার ফলে সন্তানদের মুখে ভালোভাবে তিনবেলা খাবার যোগান দিতে পারেন না শহীদের পিতা নুরুল ইসলাম। শহীদ সজিব(১৮) এই বয়সে ভঙ্গুর পরিবারের হাল ধরতে প্রথম চাকরী নেয় একটি গার্মেন্টসে। শহীদ সজিব গার্মেন্টসে কাজ করে যা পান তা দিয়ে পরিবার কোনরকম দিন গুজরান করছেন। তার অকাল মৃত্যুতে সবকিছুই এখন পরিবারের কাছে স্মৃতিতে অম্লান।

বর্তমানে সজিবকে হারিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে তার বাবা নুরুল ইসলাম। সজিবের শাহাদাতের পরপরই তাদের সংসারের জীবন থেমে যায়, তার বৃদ্ধ বাবা মা হয়ে যায় বাকরুদ্ধ। একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে যেন সর্বস্ব হারিয়েছে পরিবারটি।

শহীদ সজিবের বৃদ্ধ পিতা মাতা তাদের ২য় সংসার নিয়ে গ্রামের যে বাড়িতে থাকে সেখানে কোনভাবে বসবাস করাও কঠিন। জীর্ণশীর্ণ বাড়ী থেকে বৃষ্টি হওয়া মাত্র পানি নির্গত হয় অবিরত।

স্বজনদের অনুভূতি

প্রিয় ছেলেকে অকালে হারিয়ে শোকাচ্ছন্ন বাবা নুরুল ইসলাম বলেন, আমার ছেলের আশা আমি ছেড়ে দিচ্ছি অনেক খোঁজাখুঁজি করছি। এই হাসপাতাল থেকে ঐ হাসপাতাল কোথাও বাকি রাখি নাই। আমি আসা ছেড়ে দিচ্ছি বাকিটা আল্লাহ জানে ।

সন্তানকে হারিয়ে পাগলপ্রায় মা রানু বিবি বলেন, বিয়ার দুই বছর পরে আমার ছেলে হইছে। ছেলে আমারে রাইখা চলে গেছে; ছেলের কামাই খাইলাম না। আমি মরলে আমার কবর জিয়ারত করতো । কিন্তু আগেই ছেলে চলে গেলো।

প্রিয় ভাই সম্পর্কে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সৎ বোন জরিনা বলেন, আমারা ভাইটাকে আপন ভাই থেকে বেশি ভালোবাসতাম। যখন যা হইতো ঘরে ফিরে এসে আমাদের বলতো। এখন কে বলবে? আমার ভাই কই গেল?

ভাতিজা রিপন বলেন, সে আমার এক সপ্তাহর বড়। সজিব আমার সাথে কখনো খারাপ আচারণ করে নাই। এখন শুধু তার কথা মনে পড়ে।

প্রস্তাবনা: বৃদ্ধ বাবা-মাকে মাসিক ও এককালীন ভাতার ব্যবস্থা করা।

একনজরে শহীদ মো: সজিব

পূর্ণ নাম	: মো: সজিব
জন্ম	: ১৫-০১-২০০৬
জন্মস্থান	: ভোলা দুলার হাট
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ফরিদাবাদ, ইউনিয়ন: নুরাবাদ, থানা: চর ফ্যাশন, জেলা: ভোলা
পিতার নাম	: মো: নুরুল ইসলাম
মায়ের নাম	: রানু বিবি
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৭ জন
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান	: ১৮ জুলাই ২০২৪
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ১৮ জুলাই ২০২৪, যাত্রাবাড়ি চিটাগাং রোড
আহত হওয়ার সময়	: ৫ আগস্ট ২০২৪
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময়, স্থান	: ৫ আগস্ট ২০২৪, যাত্রাবাড়ি চিটাগাং রোড

শহীদ সজিবের মরদেহ নিখোঁজ

শহীদ মোঃ সিয়াম

ক্রমিক : ৩৬৭

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৫

শহীদ পরিচিতি

মোঃ সিয়াম ১ জানুয়ারি ২০০৯ সালে ভোলা জেলার উসমানগঞ্জ চরফ্যাশনে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ সিয়াম ছোট থেকেই পিতা-মাতার চক্ষু শীতলকারী সন্তান ছিলেন। ছোট থেকে লেখাপড়ায় খুবই আগ্রহী ছিলে কিন্তু পরিবার নিম্নবিত্ত হওয়ায় খুব বেশি আগাতে পারেননি। তিনি অনেক কষ্ট করে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা চালান। পরে বাধ্য হয়ে পরিবারের জন্য অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে যাত্রাবাড়ী এলাকায় মোবাইলের দোকানে কাজ শুরু করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহিদ সিয়ামের পরিবারে একমাত্র তার বাবা মোঃ জিয়া ছাড়া উপার্জনের আর কেউ নেই । তার বাবা অনেক কষ্ট করে রিকশা চালিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। বাবার এই কষ্টার্জিত আয় দিয়ে তাদের জীবন চালাতে অনেক কষ্ট হয়। একবেলা খেতে পেলো তো অরেক বেলা খেতে পায়না সিয়ামের পরিবার। তার উপর আবার ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ। অর্থাভাবে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করছে তারা। ছোট ভাই ইয়ামিন (১২) উসমানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তার পড়ালেখার খরচ বহন করতো প্রিয় সহদোর সিয়াম। আল্লাহ তায়ালা তার পরিবারের উপর রহম করুন। আমিন।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কার আন্দোলন কে ঘিরে দেশ জুড়ে গড়ে ওঠে সরকার পতনের তীব্র আন্দোলন। হাজার হাজার মানুষ কে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। সর্বশেষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের সমন্বয়কদের ডাকা 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়।

কোটা সংস্কারকে কেন্দ্র করে জুলাই মাসের ১৭ তারিখ থেকে কঠিন আন্দোলন শুরু হয়। ১৮ তারিখে দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন দমন করতে ঘাতক পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হাতে ধারালো ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী নিরীহ-নিরস্ত্র মুক্তিকামি ছাত্র-জনতার উপর মুহুর্মুহু গুলিবর্ষণ করে। তাতেও ক্ষান্ত হয়নি হায়েনার দল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য সেই দিন রাত থেকে পরিকল্পিতভাবে ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করে দেওয়া হয় মিথ্যা ছলনা করে। প্রায় ৫ দিন নেটওয়ার্ক বন্ধ রেখে স্বৈরাচারী সরকারের মদদপুষ্ট তাবেদার পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের উপর নৃশংস হামলা চালায়।

সর্বশেষ ছাত্রদের দাবি মেনে না নিয়ে আরো বেশি মরণ কামর দেয়ার ঘৃণ্য চেষ্টা করে ততকালীন অবৈধ হাসিনা সরকার। ছাত্র-জনতা রাজপথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয় এবং ৫ তারিখ 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

দিনটি ছিলো ১৭ জুলাই ২৪। জুলাই মাসের শুরু থেকে দেশ ব্যাপী চলতে থাকা কোটা সংস্কার আন্দোলন আরো গুরুতর হয় ১৬ জুলাই রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার বলিষ্ঠ বজ্রকণ্ঠ আবু সাঈদ ঘাতক পিশাচ পুলিশ কর্তৃক হত্যার পর থেকে। তাই সবার উদ্দেশ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাক আসে। সেই সুবাদে সিয়াম তার খালাতো ভাই সহ একসাথে চলমান আন্দোলনে শরীক হয়।

শাহাদাত বরণ

ছাত্ররাই অজেয়-এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়। এ সফলতা যতটা না সরকার পরিবর্তন করে দেখিয়েছে তার চেয়ে বেশি পুরো রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বৈকল্যকে চলাকালীন তুলে ধরেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু দেশে ছাত্র বিক্ষোভে রাষ্ট্র ক্ষমতায় পরিবর্তন আসে। যার সর্বশেষ উদাহরণ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু করে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশীরা। এর ফলে সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ছাত্র আন্দোলন 'সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ' এর মধ্যেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিহীত। এ শ্রেষ্ঠত্ব যুগে যুগে লুফে নেয় তরুণ ছাত্র-জনতা। একজন সচেতন ছাত্র দেশ ও জাতির সক্রিয় কার্যকর প্রতিবাদী জনশক্তি। এ তরুণ ছাত্র সমাজ যখন কোনো যৌক্তিক বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে তখনই তাদের যৌক্তিক দাবিগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অনুভব করে ঝাপিয়ে পড়ে শহীদ মোঃ সিয়াম। পরিবারের অভাব অনটন মাথায় রেখে স্বপ্ন দেখা তরুণ প্রজন্মের আইডল সিয়াম অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে তা কখনো কল্পনাতীত ছিল না।

১৭ জুলাই বুধবার বন্ধু ও সহপাঠীদের কাছে খবর পেয়ে সকাল আন্দোলনে চলে যান শহীদ মোঃ সিয়াম। যাত্রাবাড়ী কাজলাব্রিজ গিয়ে সকলের সাথে আন্দোলনে একত্রিত হন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী এসে সমবেত ছাত্র-জনতার উপর মুহূর্মুহু গুলি ছুঁড়তে থাকে। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় সমবেত নিরীহ-নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা। গুলি খেয়ে রাস্তায় পরে যায় বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী। এক পর্যায়ে খুনি পুলিশ কর্তৃক ছোঁড়া গুলিবিদ্ধ হয় মোঃ সিয়াম। মুহুর্তেই নিস্তেজ হয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। স্বৈরাচারী সরকারের ঘাতক পুলিশের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো সবকিছু। ভেঙে গেলো পড়ালেখা শেষ করে একটা চাকরি নিয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন। প্রায় ৩০ মিনিট রাস্তায় পড়ে থাকেন শহীদ মো: সিয়াম। তারপর পুলিশ চলে গেলে ছাত্র-জনতা এসে তাকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে নিকটস্থ হাসপালে ভর্তি করায়। স্বৈরাচার হাসিনার ভয়ে সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা তাকে ভর্তি নিতে রাজি হয়নি। অনেক সময়-ক্ষেপণ করে তারা। তারপর ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে এক ডাক্তার এসে ভালোভাবে না দেখেই তার মৃত্যুর ঘোষণা দেয়। উপস্থিত ছাত্র-জনতা তাকে বারবার অনুরোধ করে, আরও একটু ভালো করে দেখার জন্য। সে জানায় এর চেয়ে ভালো করে দেখতে পারবে না। ছাত্র-জনতা তার কাছে শহীদের ডেট সার্টিফিকেট চাইলে সে তা দিতে অস্বীকার করে এবং রেগে গিয়ে প্রশাসন ডেকে আনার হুমকি দেয়। অতঃপর নিরুপায় ছাত্র-জনতা শহীদ সিয়ামকে বাড়িতে নিয়ে আসে। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত নসীব করুন আমিন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের মন্তব্য

জেঠাত ভাই জসিম বলেন, সিয়াম খুব ভালো ছিলো। খুব মিশুক ছিলো, কেউ কোনো কাজ দিলে সে সাথে সাথে করে দিতো, কখনো না করতো না। আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুক।

সিয়ামের জেঠা বলেন, সিয়াম আমার দোকানে থাকতো আর পড়ালেখা করতো। তাকে আমি বড় করেছি। আল্লাহ তাকে জন্নাত দান করুন।

স্কুল শিক্ষক ফরহাদ বলেন, সিয়াম ভালো ছাত্র ছিলো। অন্যায়মূলক কোন কাজ করতো না। সে স্কুলে আসতো তবে সংসারের অভাব অনটন থাকায় সে স্কুল মাঝে মাঝে গ্যাপ দিতো। আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন।

মমতাময়ী মা সুরমা বেগম প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, আমার দুইটা ছেলে দিলো। আল্লাহ কোন মেয়ে দিলো না। আল্লাহ একটা ছেলে নিয়ে গেলো। মারা যাওয়ার সময় আমার বাবা কি কষ্ট না পাইলো। মাকে ডাকছে না বাবাকে ডাকছে? আমার বাবা আমার খুব খেয়াল রাখতো। বাবা প্রতিদিন আমাকে ফোন করতো। ফোন দিয়ে সকলের অবস্থা জিজ্ঞেস করতো। নিষ্ঠুর পুলিশ আমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে। আল্লাহ ওদের বিচার করুক।

পারিবারিক অবস্থা

দুই ভাই ও বাবা-মা সহ সিয়ামের পরিবার। বাবার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় পড়ালেখার পাশাপাশি ঢাকায় মোবাইলের দোকানে চাকরি করতেন। ছোট ভাই ইয়ামিনের পড়ালেখার খরচও তিনি বহন করতেন।

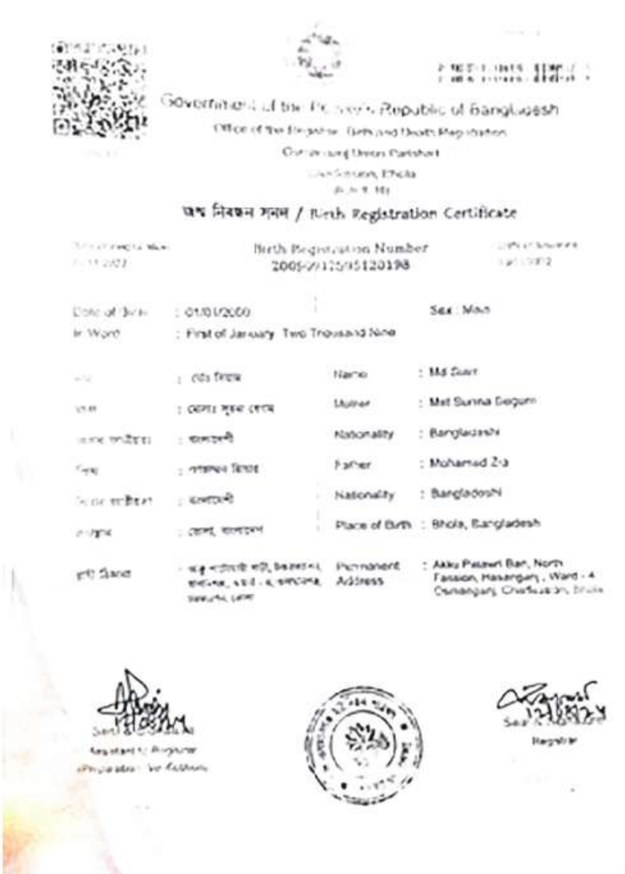
জন্ম নিবন্ধন সনদ / Birth Registration Certificate

Birth Registration Number
2009[illegible]5120198

Date of Birth : 01/01/2009 Sex : Male
In Word : First of January Two Thousand Nine

Name : Md Siam
Mother : Mst Surma Begum
Nationality : Bangladeshi
Father : Mohamad Zia
Nationality : Bangladeshi
Place of Birth : Bhola, Bangladesh
Permanent Address : Akku Patawri Bari, North Fassion, Hasanganj, Ward - 4 Osmanganj, Charfassion, Bhola

Registrar

একনজরে শহীদ মো: সিয়াম

পূর্ণ নাম	: মো: সিয়াম
জন্ম	: ০১-০১-২০০৯
জন্মস্থান	: উসমানগঞ্জ চরফ্যাশন
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: আক্কু পাটোয়ারি বাড়ী, ইউনিয়ন: হাসানগঞ্জ, থানা: চরফ্যাশন , জেলা: ভোলা
পিতার নাম	: মোহাম্মদ জিয়ার, রিক্সাচালক
মায়ের নাম	: মোসাম্মদ সুরমা, গৃহিণী
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান	: ১৭ জুলাই ২০২৪
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ১৭ জুলাই ২০২৪, যাত্রাবাড়ী কাজলাব্রিজ
আহত হওয়ার সময়	: ১২টা ৪৫ মিনিট
আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময় ও স্থান	: ১৭ জুলাই ২০২৪, যাত্রাবাড়ী কাজলাব্রিজ

প্রস্তাবনা

১. বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

২. ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার খরচ চালানোর ব্যবস্থা করা

৩. এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

শহীদ মোসা: লিজা

ক্রমিক : ৩৬৮
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৬

শহীদ পরিচিতি

মোসা: লিজা ১ জানুয়ারি ২০০৪ সালে ভোলা জেলার অন্তর্গত বোরহান উদ্দিন ইউনিয়নের সাচরার দেউলিয়া শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জয়নাল শিকদার পেশায় একজন কৃষক আর মাতা ইয়ানুর বেগম একজন গৃহিণী।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা

শহীদের পিতা জয়নাল শিকদার কৃষি কাজ করে পরিবার চালাতেন। কিন্তু বাবার বয়স হয়ে যাওয়ায় সামান্য অর্থ দিয়ে সংসার চালাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বাবা, মেয়ে লিজাকে কাজের জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। বাবা মায়ের ঔষধ সহ সংসার পরিচালনা করার জন্য লিজা (২০) খেয়ে না খেয়ে কঠোর পরিশ্রম করে ঢাকায় মানুষের বাসায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেন। লিজার সামান্য কিছু উপার্জন দিয়ে পরিবারের খরচ বহন করলেও বাবা মায়ের জন্য কিছুটা হলেও সহায়ক ছিলো কিন্তু এখন লিজার মৃত্যুর পর সহযোগিতার দ্বারও সংকুচিত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে তার পরিবারের ব্যয় ভার বহন করা তার বাবার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যপার।

একদিকে লিজার মা বাবার বয়স বেড়ে গেছে কাজ করার মত অবস্থা নেই। অন্য দিকে ভাই বোনদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সবায় আলাদা অবস্থান করেন। এই দিকে লিজার মৃত্যু যেন কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মত না।

এক দিকে সারাদেশে যোগাযোগ বন্ধ অন্য দিকে ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করে অবৈধ সরকার দেশের মধ্যে সব এলাকায় মানুষের উপর নির্বিচারে এমন গণহত্যা চালায়, সে সময় লিজার মৃত্যুর খবর পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

প্রেক্ষাপট

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ তালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঅই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসীস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

যেভাবে শহীদ হন

মানবতার চিন্তা না করে শুধু ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে শুরু করেন গুলি ও টিয়ার্শেল সহ নির্বিচার গুলিবর্ষণ। সেই গুলি এসে লাগে সাধারণ একজন বাসাবাড়িতে কাজের বুয়া হিসেবে কর্মরত লিজার শরীরে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তিনি গুলি বিদ্ধ হন।

১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার ঢাকার শান্তি নগর বাসায় অবস্থানরত ছিলেন লিজা। দুপুর ৩ টার দিকে রুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে ঘাতকের ছোঁড়া একটা গুলি এসে তার পেটে লাগে। তৎক্ষনাত তাকে কাকরাইল আরোরা স্পেশালাইজড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় ।

সেখানে তার অবস্থা বেশি খারাপ হয়। পরে ঐ হাসপাতাল থেকে গুরুতর হলে লিজা কে পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২২ জুলাই সোমবার বিকাল ৩.৫০ মিনিটে ICU থাকা অবস্থায় পৃথিবীর সকল মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেন।

পরবর্তীতে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করুন। আমিন।

জানাজা ও দাফন

শহীদের লাশ নেওয়ার মত কেও নেই। কে তাকে নিয়ে যাবে? কিভাবে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে? সব যায়গায় কারফিউ জারি করেছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার। তার লালিত-পালিত পুলিশ দিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার। অবশেষে কোন রকম চেষ্টার পর এম্বুলেন্স ভাড়া করে লিজার লাশ এলাকায় গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

হাজার হাজার মানুষ লিজার বাড়িতে লাশ দেখতে আসে। মা-বাবা আত্মীয় স্বজনরা ও এলাকাবাসীর চোখের পানি কেও ঠেকায়ে রাখতে পারেনি। নিজ এলাকায় জানাজা শেষে তাকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

শহীদের বাবা জয়নাল শিকদার বলেন, আমার কলিজার টুকরা সন্তান আমার মেয়ে চলে যাওয়ায় আমার বুকটা খালি হয়ে গেছে। আমার অভাবের সংসার। অভাবের তাড়নায় বাধ্য হয়ে মেয়েকে কাজে দিয়েছি। আমি নিজে অচল আমার একসাইড অচল হয়ে গেছে। মেয়ে যা বেতন পাইতো তা দিয়ে আমার সংসার কোনরকমভাবে চলে যেতো। আমার মেয়ে ইতিহাসের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব, অভ্যুত্থানের অন্যতম অকুতোভয় এক ত্যাগী সৈনিক। মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ঘাতকের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ করে সে। আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন।

মা ইয়ানুর বলেন, আমার মেয়ে খুব ভালো ছিলো। তার কোন অপরাধ ছিলো না। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিলো না। আমার ৫ মেয়ে ২ ছেলে ৩ মেয়ের পর ১ ছেলে দিছে আল্লাহ । কিন্তু অভাবের সংসার ছিলো এদেরকে লালন পালন করতে টাকা পয়সা লাগবে। এতো টাকা পাবো কোথায়? অভাবের সংসারে আর্থিক সাহায্য করার জন্য মেয়েকে ঢাকায় কাজে দিয়েছি। কে জানে অমার বুক টা খালি করে পরিবার কে ছেড়ে অকালে চলে যাবে। সে যে বাসায় কাজ করতো তারাও খুব ভালো ছিলো । যখনই ইচ্ছা বাড়ি চলে আসতে বলতাম।

মেয়ে আসতে না চেয়ে বলতো, আমি এখানে ভালো আছি আমার কোরআন পড়ার কিছু বাকি আছে এইটুকু শেষ করে আসবো । পরে তোমরা আমার বিয়ে দিয়ে দিয়ো।

প্রস্তাবনা: পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা দিয়ে সহযোগীতা করা।

একনজরে শহীদ মোসা: লিজা

পূর্ণ নাম	: মোসা: লিজা
জন্ম	: ০১ জানুয়ারি ২০০৪
জন্মস্থান	: ভোলা, বোরহান উদ্দিন
পেশা	: কাজের বুয়া
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- দেউলিয়া শিবপুর, ইউনিয়ন- সাচরা, থানা- বোরহান উদ্দিন, জেলা- ভোলা
পিতার নাম	: জয়নাল শিকদার
মায়ের নাম	: ইয়ানুর বেগম
পরিবারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
ঘটনার তারিখ ও স্থান	: ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ২টা, শান্তিনগর মোড় ফ্লাইওভার থেকে ৪ তলার বারান্দায়
আহত হওয়ার সময়	: ২১ জুলাই ২০২৪, দুপুর ২টা
আক্রমণকারী/আঘাতকারী	: স্বৈরাচারি সরকারের ঘাতক পুলিশ বাহিনী
শহীদ হওয়ার তারিখ, সময় ও স্থান	: ২২ জুলাই সোমবার বিকাল ৩.৫০ মিনিটে পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ICU
শহীদের কবরের অবস্থান	: বাড়ির পাশে সামাজিক কবরস্থান

শহীদ মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন

ক্রমিক : ৩৬৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৭

শহীদ পরিচিতি

মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ছিলেন একজন সাহসী ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। তিনি ১৯৮৯ সালের ১৭ ডিসেম্বর ভোলা জেলার সদর উপজেলার শাহামাদার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুলতান আহমেদ ও মাতা জিন্নাতুন নিসা। গ্রামীণ পরিবেশে অর্থনৈতিক ভঙ্গুর অবস্থায় যাচ্ছিল তাদের জীবন। এরইমধ্যে তার বাবা আবার দ্বিতীয় বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন সৎ মা। শুরু হয় সংসারের টানাপোড়েন। এমতাবস্থায় দেলোয়ারের জন্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্নটা ছিল যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। এইভাবে অভাবের সংসারে বড় হতে থাকে দেলোয়ার।

নিজের ভাগ্যের চাকা বদলের জন্য গ্রাম ছেড়ে পাড়ি জমান রাজধানীতে। শুরু করেন নিজের সংসার। তিন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তার মধ্যবিত্ত পরিবার ছিলো যেন এক টুকরো সুখের নীড়। জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হিসাবে তার নিজের একটি ফার্নিচারের দোকান ছিল। তার দুচোখ জুড়ে খেলা করতো সন্তানগুলোকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন।

পারিবারিক অবস্থা

অভাগা যেদিকে যায় সাগর ও শুকিয়ে যায়।

কথাটি যেন মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা শৈশব থেকে হাজারো দুঃখ কষ্টে বেড়ে উঠা দেলোয়ার যখনই সুখের মুখ দেখা শুরু করেন তখনই দুঃখ যেন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। যখন তিনি আন্দোলনে আহত হন, তার চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে একমাত্র সম্বল ফার্নিচারের দোকানটি বিক্রি করে দেন তার পরিবার। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস শেষ রক্ষা আর হলো না, তিন সন্তান ও স্ত্রীকে রেখে পরপারে পাড়ি জমান দেলোয়ার।

পরিবারে সকল খরচই দেলোয়ার হোসেনের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলো। তার অকাল প্রয়াণে স্ত্রী ও সন্তানেরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের নিজের বলতে এখন আর কোন সম্পদই অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে তারা অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। পরিবার প্রধানের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। এই দুরাবস্থার মধ্যে, তারা আশা করে সমাজ সহায়তা করবে, যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরিয়ে আনা যায়।

ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই, '২৪ জুড়ে। ছাত্ররা মূলত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের নায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট,সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোঁড়া হচ্ছিলো ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক,পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু, আর হাতের মেহেদীর রঙ শুকাবার আগেই অনেকেই হয়েছিলো বিধবা। এসব দেখে দেশের সাধারণ মানুষও চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। তাদের মধ্যে একজন হলেন দেলোয়ার হোসেন। যিনি মজলুম ছাত্র-জনতার মুখে নিজের সন্তানদের ছাপ দেখতে পেতেন। তাই বিবেকের কাছে হার মেনে প্রতিদিনই শামিল হতেন আন্দোলনে। সে সময় চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। এক পর্যায়ে এই আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সারাদেশে ঢল নামে ছাত্র-জনতার। মুখে মুখে আন্দোলিত হতে থাকে হাসিনার পতনধ্বনি।

এই ঘটনার পরিক্রমায় **১৯ জুলাই ২০২৪**, জুমাবার বিকেলে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিতে মিরপুরের মিছিলে যোগদান করেন তিনি। সেখানে দিনভর ছিল গোলাগুলি। পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি ও খুনী আওয়ামী লীগের বিতর্কিত সংস্থা রাস্তায় ছিল তৎপর। ছাত্ররা তারপরেও রাস্তায় অবস্থান ধরে রেখেছিল। সরকারী দলের তাণ্ডবে রাজপথ রক্তাক্ত হচ্ছিল। হাসপাতাল গুলো আহত ও লাশে ভরছিল। সন্ধ্যা ৬ টার দিকে পুলিশের গুলিতে আহত হন দেলোয়ার হোসেন। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে দেলোয়ার হোসেন, অবশেষে ছাত্ররা ঝুঁকি নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায় তাকে। হাসপাতালের বক্ষব্যাধি বিভাগে ২ দিন চিকিৎসারত অবস্থায় **২১ জুলাই ২০২৪** তারিখ, রাত ৯ টায় মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে শহীদি কাফেলায় সংযুক্ত হয় আরেকটি নাম শহীদ দেলোয়ার হোসেন।

সর্বোপরি, ৪ আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ছাত্র-জনতা, সেদিন বিকেলেই ঘোষণা আসে "লং মার্চ টু ঢাকা" হবে পরের দিন। এরই মধ্যে দিয়ে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হয়। কিন্তু সেই মুক্ত দেশে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি শহীদ দেলোয়ার হোসেন। তারই জন্য কবি হয়তো লিখেছিল-

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রান যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুদের অনুভূতি

কথায় আছে, "A man does not live in years but in deeds" এটিই যথার্থ দেলোয়ার হোসেনের বেলায়।

তার প্রতিবেশি বলেন, "দেলোয়ার হোসেন ছেলে হিসেবে খুবই ভালো। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলতো। কারো সাথে কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিলো না। তাছাড়া এলাকার সকল মানুষ একই কথা বলেছেন তার সম্পর্কে।"

দেলোয়ার হোসেন স্ত্রী বলেন, "আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ ছিলো কখনো কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ করে নাই। গ্রামের সবার সাথে ভালো সম্পর্ক ছিলো তার। এমনকি সে টাকা পয়সা জমা করে নাই সব সময় বলতো আল্লাহ আমাদের খাওয়াবে চিন্তা করবা না।"

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে মারা যাওয়ায় তার পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎসটি বন্ধ হয়ে গেছে। মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী তিন পুত্র সন্তান নিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে, যাদের বুক জুড়ে রয়েছে শুধু হাহাকার।

১.স্ত্রীকে শিক্ষকতার চাকুরির ব্যবস্থা করে দেয়া।
২.সন্তানদের শিক্ষার খরচের ব্যবস্থা করা।
৩. স্ত্রী সন্তানদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয়পত্র National ID Card
মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
Name
MOHAMMAD DELOWAR HOSSAIN
মোহাম্মদ সুলতান মাল
জিন্নাতুন নেছা
Date of Birth 17 Dec 1989
NID No 779 235 1665

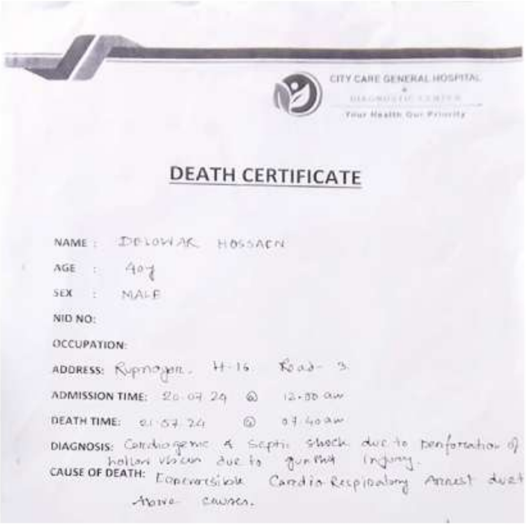
CITY CARE GENERAL HOSPITAL

DEATH CERTIFICATE

NAME : DELOWAR HOSSAEN
AGE : 40y
SEX : MALE
NID NO:
OCCUPATION:
ADDRESS: Rupnagar. H-16 Road- 3
ADMISSION TIME: 20.07.24 @ 12.00 am
DEATH TIME: 21.07.24 @ 07.40 am
DIAGNOSIS: Cardiogenic & septic shock due to perforation of hollow viscus due to gunshot injury.
CAUSE OF DEATH: Irreversible Cardio Respiratory Arrest due to above causes.

একনজরে শহীদ পরিচিতি

পুরো নাম	: মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
জন্ম তারিখ	: ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯
পেশা	: ফার্নিচার দোকানী
পিতা	: মৃত সুলতান আহমেদ
মাতা	: জিন্নাতুন নেসা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: শাহামাদার, ইউনিয়ন: কাচিয়া ১২ নং ওয়ার্ড, থানা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মিরপুর, ঢাকা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
	: ১. স্ত্রী: মোসা. লিজা, বয়স, ২৭
	: ২. ছেলে: রাব্বি হাসান (বয়স ১৩, শ্রেণি ষষ্ঠ)
	: ৩. ছেলে: হাসানুর (বয়স ৬, শ্রেণি শিশু)
	: ৪. ছেলে: হুসাইন (বয়স ২)
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: মিরপুর, ১৯ জুলাই, সন্ধ্যা ৬টা
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
নিহত হওয়ার তারিখ ও স্থান	: হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়, ১৪/০৭/২০২৪
সমাধি	: শাহামাদার, ভোলা সদর, ভোলা

শহীদ মোঃ বাহাদুর হোসেন মনির

ক্রমিক : ৩৭০
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৮

শহীদ পরিচিতি

বাংলাদেশের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ইতিহাসে সংযুক্ত নতুন নাম মোঃ বাহাদুর হোসেন মনির। এই তরুণ যুবকের জীবনাবসান ঘটেছে আওয়ামী সরকারের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে।

শহীদ মোঃ বাহাদুর হোসেন মনির বাল্যকাল থেকেই পিতামাতার চক্ষু শীতলকারী সন্তান ছিলেন। ছোট থেকে লেখাপড়ায় খুবই মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু পরিবার অসচ্ছল হওয়ায় পড়াশোনায় বেশি আগাতে পারেননি। তার পরিবার অনেক কষ্ট করে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা চালান। অভাবের তাড়নায় ও পরিবারের প্রয়োজনে স্বল্প বয়সেই তাকে জীবনের সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। দেশের ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী এই তরুণ যুবক দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তাকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে।

২০২৪ সালের ১৯ জুলাই, ঢাকার নতুনবাজার বাঁশতলায় আন্দোলনরত জনতার উপর পুলিশ গুলি চালায়। সেই ভয়াবহ ঘটনায় বাহাদুর হোসেন মনিরের বুকের ডান পাশে গুলি লেগে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু আন্দোলনরত জনতার উপর সরকারী নির্যাতনের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

বাহাদুর হোসেন মনিরের মৃত্যু আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দেশের জন্য আত্মাহুতি দান করা মানুষের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। তার মৃত্যু বৃথা যাবে না। তার আত্মাহুতি দেশের মুক্তির আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করবে। আমরা আশা করি, বাহাদুর হোসেন মনিরের হত্যাকারীরা শাস্তি পাবে এবং দেশের জনগণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

শহাদাতের প্রেক্ষাপট

শুরুটা হয়ে ছিলো জুলাই মাসের কোটা সংস্কার আন্দোলন দিয়ে। নিরীহ নিরস্ত্র আন্দোলনকারিদের উপর সরকারের দমন পীড়ন কারনে অধিকার আদায়ের আন্দোলন সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। যার শেষ হয় স্বৈরাচারী হাসিনার পদত্যাগ ও পলায়নের মাধ্যমে।

জুলাইয়ের ১৬ তারিখ রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদসহ সারাদেশে আরও ৬ জন আন্দোলনরত অবস্থায় পুলিশের গুলিতে নিহত হলে ছাত্রজনতা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৭ তারিখ কঠিন আন্দোলন শুরু হয়, বাড়তে থাকে লাশের সংখ্যা। তারপর ১৮ তারিখে দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ হাতে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। তাতেও তারা থেমে থাকেনি সেই দিন রাত থেকে ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করে দেওয়া হয় মিথ্যা ছলনা করে।

বন্ধুদের সাথে ঘুরতে সিলেট গিয়েছিলেন বাহাদুর হোসেন মনির। সরকারের স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে কোটাপ্রথা পুনর্বহাল হলে দেশব্যাপী আন্দোলনের ডাক দেয় ছাত্রসমাজ। কর্মসূচীতে যোগদান করতে তড়িঘড়ি করে ফিরে আসেন ঢাকায়। প্রতিদিনই বাবা-মাকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়তেন আন্দোলনে, অংশগ্রহণ করতেন সমন্বয়কদের ঘোষণা করা বিভিন্ন কর্মসূচিতে। বাবা কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে তিনি আন্দোলনে যাওয়ার কথা গোপন করতেন। ১৬, ১৭, ১৮ জুলাই দেশব্যাপী ব্যাপক সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা তার মনকে অনেক বেশি অস্থির ও ভারাক্রান্ত করে তোলে। পিতা আবু জাফর আদরের সন্তানকে দেশের সংঘাতময় পরিস্থিতির কথা স্বরন করিয়ে দিয়ে বাইরে বেরুতে নিষেধ করলে তিনি বলেন, "আন্দোলনে সফল হতে হলে আরও রক্ত দিতে হবে। একদিনতো মরতেই হবে, যদি সে মৃত্যু হয় দেশের জন্য তবে তাই হবে সবচে বড় পাওয়া"। এই বলে তিনি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েন। সেদিনই ছিলো শহীদ মোঃ বাহাদুর হোসেন মনিরের জীবনের শেষ দিন।

১৯ জুলাই জোহরের নামাজের পর দুপুরের খাবার খেয়ে রাস্তায় নামলে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ ও ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা। সেদিন সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে সবচেয়ে বেশি তান্ডব চালায় সরকারি গুন্ডাবাহীনি। দুষ্কৃতিকারীদের মূহুর্মূহু গুলিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আন্দোলনকারীরা। নতুনবাজার বাঁশতলা এলাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবিদ্ধ হন মনির। পুলিশের ছোড়া তপ্ত সীসা তার ডান বুক ভেদ করে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়, আঘাত করে তার পেছনে থাকা আরেক আন্দোলনকারীকে, মা.... বলে লুটিয়ে পড়েন রাস্তায়। বুকের তপ্ত রক্তে সিক্ত হয় রুক্ষ জমিন। তিনি তার কথা রেখেছেন, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দিয়েছেন নিজের রক্ত, রঞ্জিত করেছেন দেশের মাটি। আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে তার আত্মত্যাগ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে সাথীরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তার মৃত্যু সংবাদ নিশ্চিত করেন। হাসপাতাল থেকে এম্বুলেন্সে করে তার লাশ নিয়ে যাওয়ার সময়ও চতুর্পাশে চলছিল পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গোলাগুলি। গ্রামের বাড়িতে শহীদের লাশ দাফনেও পরিবারকে পুলিশি ঝামেলায় পরতে হয়।

শহীদ মো: বাহাদুর হোসেন মনির অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় এসে ছিলেন। ভালো টাকা পয়সা ইনকাম করে ভালো পাত্রী দেখে বিয়ে করবে আর প্রতিবন্ধী বোন কে ভালো রাখবে ও তাদের পড়ালেখার খরচ চালাবে। তার স্বপ্ন গুলো যেন স্বপ্নই রয়ে গেলো।

ঘাতকের একটা গুলিতে তার জীবনের সকল চাহিদা আর চাওয়া পাওয়া গুলো নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন আমিন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

শহীদ মো: বাহাদুর হোসেন মনির সম্পর্কে মোঃ রায়হান খালাতো ভাই বলেনঃ সে আমার বন্ধু ও আত্মীয়। ফোন করে জানতে পারি মনির পুলিশের গুলিতে মৃত্যু বরণ করে। তাকে হারিয়ে আমরা মর্মাহত।

শহীদের বাবা বলেনঃ আমার ছেলে গুলি খেয়ে সাথে সাথে মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর পর পুলিশ ও আওয়ামিলীগ আমাদের সাথে খুব খারাপ আচারণ করেছে। তারা এত নিচু ও পশুর মত, আমার ছেলেকে নিয়ে আসতে গেলে পুলিশ আটকে দেয়।

মমতাময়ী মা ছেলের মৃত্যুর খবর শুনে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরলে তিনি বিলাপ করতে করতে বলেন, সে আমারে ছাইরা চলে গেছে। আমার কলিজার ছেলে ডারে হারিয়ে আমরা দিশে হারা।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মোঃ বাহাদুর হোসেন মনিরের পরিবার একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার। তার বাবা আবু জাহের (৫৭) বয়স্ক হওয়ায় রিকসা চালিয়ে কোনমতে ছোট বোনের চিকিৎসা, পড়ালেখার খরচ সহ পরিবারের বিভিন্ন আর্থিক দাবি পূরন করে থাকতেন। মা জাহানারা বেগম (৪৯) ও অসুস্থ, তেমন কিছু করতে পারেন না। শহীদ পরিবারটি আর্থিকভাবে নিঃস্ব ও দুর্বল।

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: বাহাদুর হোসেন মনির
জন্ম তারিখ	: ১৮-০৬-২০০৭
পিতা	: মো: আবু জাহের
মাতা	: জাহানারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ভাষানচর ৪ নং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন: রসুলপুর , থানা: শশীভুবন, জেলা: ভোলা
বৈবাহিক অবস্থা	: অবিবাহিত
পেশা	: দিনমজুর
ঘটনার স্থান	: নতুনবাজার বাঁশতলা, গুলশান, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৯-০৭-২০২৪, বিকাল ৩টা
শাহাদাতের সময়কাল	: ১৯-০৭-২০২৪, বিকাল ৩টা
আঘাতের ধরন	: বুকের ডান পাশে গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রামের বাড়িতে, হরাজী মসজিদের পাশে

প্রস্তাবনা

১. পরিবারকে নিয়মিত ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
২. শারীরিক প্রতিবন্ধী বোনের দায়িত্ব নেওয়া
৩. রিকশাচালক পিতাকে ভালো কর্মসংস্থান করে দেওয়া

শহীদ মো: নাহিদুল ইসলাম

ক্রমিক : ৩৭১

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৫৯

শহীদ পরিচিতি

মো: নাহিদুল ইসলাম ছিলেন একজন সাহসী ও সংগ্রামী বীর। তিনি ২০০৩ সালের ১ ডিসেম্বর ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন থানার অন্তর্ভুক্ত উত্তর ভাটামারা গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো: আব্দুল জলিল ৫৭ বছর বয়সী একজন পরিশ্রমী মানুষ, আর মা বিবি ফাতেমা একজন গৃহিণী। পরিবারের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র পুত্র সন্তান এবং সকলের নয়নের মণি। বাবার অসুস্থতার জন্য পরিবার ও বোনদের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। অভাবের সংসারে বড় হওয়া নাহিদুল ছোটবেলা থেকেই সংগ্রাম করতে শিখেছিলেন। করে ৮ম শ্রেনি পর্যন্ত পড়ালেখা চালান। অভাবের তাড়নায় ও পরিবারের প্রয়োজনে স্বল্প বয়সেই তাকে জীবনের সংগ্রামে নামতে হয়েছিল। দেশের ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী এই তরুণ যুবক দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তাকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে।

পাশাপাশি তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক এবং সদালাপী ব্যক্তি। লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তিনি রাজধানীতে বিকাশ মার্কেটিং এর কাজ শুরু করেন তিনি। নিজের প্রয়োজনের তুলনায় পরিবারের জন্যই বেশি অর্থ পাঠাতেন। এই কঠিন জীবনের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি তার ভালোবাসা অটুট ছিল। একজন কর্মী এবং শিক্ষার্থী হিসেবে তার দ্বৈত জীবন ছিল বাস্তবতার কশাঘাতে ভরা, কিন্তু তবু তিনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন লালন করতেন। দারিদ্র্যের কষ্ট, কঠোর পরিশ্রম, আর পরিবারের প্রতি গভীর ভালোবাসা নাহিদুলকে একটি বাস্তবিক জীবন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক করে তুলেছিল।

শহীদ নাহিদুলের অর্থনৈতিক অবস্থা

একমাত্র পুত্র সন্তান নাহিদকে হারিয়ে পাগল প্রায় অবস্থা তার পিতামাতার। নাহিদুল ইসলাম ছিলেন তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। বাবার কোন কর্মসংস্থান না থাকায় নিজের পড়ালেখার পাশাপাশি ঢাকায় গিয়ে বিকাশের মার্কেটিং কর্মী হিসাবে যোগদান করেন তিনি, এর মাধ্যমে পরিবারের কিছু সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একদিন, বাবা মায়ের কোল শূন্য করে অপ্রত্যাশিতভাবে শহীদ হন নাহিদুল। তাঁর মৃত্যুতে পরিবারের মধ্যে শুরু হয় হাহাকার। এখন তারা চিন্তিত, কিভাবে চলবেন এবং কিভাবে সংসারের খরচ চালাবেন। নাহিদুলের অভাব তাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে এবং গোটা পরিবারটি এখন নিঃস্ব। এই দুরবস্থার মধ্যে, তারা আশা করে সমাজ সহায়তা করবে, যাতে তাদের জীবনে কিছুটা আলো ফিরিয়ে আনা যায়। এইজন্য বোধ হয় কবি লিখেছেন-

> দুঃখরা কেন এভাবে মিছিল করে আসে
> খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবনের স্পন্দন থামিয়ে দিয়ে ?
> দুঃখরা কেন বার বার ওদেরকেই ভালোবাসে
> ওদের হাসি-কান্নায় ভরপুর জীবনকে জড়তায় ঢেকে দিয়ে ?

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

কর্মের কারণে পৃথিবীতে মানুষ অমর হয়। মানুষ চলে গেলেও থেকে যায় তার কর্ম। তেমনি মৃত্যুর পরে ও শহীদ নাহিদুল ইসলাম অমর। এলাকাবাসীর মুখে মুখে আজ ও তার সম্পর্কে বন্দনা।

চাচাতো রাকিব বলেন, "আমরা দুই ভাই এক সাথে আন্দোলনে শরীক হই তার পর আমি প্রথমে ছররা বুলেট খাই, খাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমার ভাই গুলি খায় গুলি খাওয়া সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালের ডাক্তার ভাইকে মৃত ঘোষণা করেন। এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারিনি সে আমার সাথে নাই। দোয়া করি আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করুন এবং শহীদের উচ্চ মাকাম দান করুন।"

সহপাঠি ও ভাতিজা মো: নিহাদ বলেন, "চাচা আমার বাড়ি আসলে সব সময় আমাদের সাথে থাকতেন। আমাদের সাথে খেলাধুলা করতেন। চাচা আজ আমাদের মাঝে নাই আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আল্লাহ তাকে জান্নাত বাসি করুক। শহীদের উচ্চ মর্যাদা দান করুক।"

সহপাঠী জাকির হোসেন বলেন, "নাহিদ ভাই আর আমি একই আন্দোলনের কর্মী ছিলাম। একসাথে কাজ করতাম। তার অনেক স্মৃতি আমার সাথে জড়ানো। যে স্মৃতি ভুলতে পারিনা।"

আন্দোলনের দায়িত্বশীল আল আমিন ভাই বলেন, "আমি যখন ২০১৮ সালে দৌলত থানা শাখার সভাপতি ছিলাম তখন দ: বড়ধলিদাখির মাদ্রাসার দায়িত্বশীল হিসেবে নাহিদকে পাই। নাহিদ আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। আমি যখন কোনো প্রোগ্রামের কথা বলতাম সে এলাকার এবং প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্রদেরকে প্রোগ্রামে হাজির করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি সে যেভাবে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করতো আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে সেভাবে জান্নাতের মেহমান হিসেবে সহযোগিতা করুন। (আমিন)"

বাবা আব্দুল জলিল বলেন, "আমি আমার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বাকরুদ্ধ। আমার ছেলে হাজারের মধ্যে একজন ছিলো। এখন পর্যন্ত কোনো বিষয়ে কেউ কখনো কোনো বিচার দেয় নাই। ছেলেকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন ছিলো ছেলেটা বড় হয়ে একটা ভালো চাকরি করবে কিন্তু আল্লাহ নিয়ে গেলো। আল্লাহ তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।"

মা বিবি ফাতেমা বলেন, "আমার একমাত্র কলিজা ছিল। আমার ৩ মেয়ের পরে আল্লাহর কাছে কেন্দে কেন্দে আল্লাহর কাছে চেয়ে নিছে আল্লাহ আমার পুতের চাকুরি লাগবেনা শুধু আমি মরলে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কোরআন, পড়বে মাটি দিবে। এই আশা করে আল্লাহর কাছে পুত চাইছি আল্লায় দিছে কিন্তু আগুন পানি থেকে বাচিয়ে পুতরে বড় করেছি কিন্তু পুলিশ গুলি করে মারলো। আমরা এর বিচার চাই। আমার পুতও মরলো একবার এক মুহূর্তের জন্য পুতের বাবা ঘরে থাকতে পারে নাই পুলিশের ভয়ে পুলিশ থাকলো পুতের এখন আর আমি দেখি নাই আমি ঘুম থেকে উঠলে কলিজার ধড়ফড় করে। পুতে মরার সময় কি কষ্ট করে মরছে। আমি দেখি নাই আমার খোকা কোথায় চলে গেল। আল্লাহ আমার বাবাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।"

আজ নাহিদ নেই কিন্তু তার প্রতিবাদী চেতনা, তার আত্মত্যাগ, তার শহীদ হওয়ার বেদনা যেন সবকিছুই থেকে যায় তার পরিবারের চোখের জলে, এলাকার মানুষের হৃদয়ে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

শহীদ নাহিদুল ইসলামের জীবনের কাহিনী যেন এক অশ্রুসিক্ত পরিহাস। জীবনের সবচেয়ে রঙিন সময়গুলোতে যখন একজন যুবক নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছা ও পরিবারকে নিয়ে ভাববে, ঠিক তখনই নাহিদুলের জীবন গতি বদলে গেল পরিবারের অমোঘ দারিদ্র্যের চাপে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সংসারের চাকা সচল রাখা এবং বাবা মা কে ভালো রাখা। কিন্তু নাহিদুলের জীবনের গল্প অন্ধকারে মোড় নেয় যখন সে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে শহীদ হয়ে যায়।

মূলতো বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলছিল জুলাই '২৪ জুড়ে।

ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ, মানববন্ধন, প্রতিবাদ সভা, এবং সেমিনারের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্দোলনটি সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখা যায়, যেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ও ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কারণ স্বৈরাচার সরকার ছাত্রদের ন্যায্য দাবী না মেনে চালাচ্ছিলো অত্যাচারের স্টীমরোলার। সারাদেশ জুড়ে গুলি, রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল ছোড়া হচ্ছিলো ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে। খালি হয়ে যাচ্ছিলো হাজারো মায়ের বুক, পিতাহারা হয়ে পড়ছিলো হাজারো শিশু। আর নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এই আন্দোলনে যোগদান করেন নাহিদ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯ জুলাই শিক্ষার্থীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন' বা সর্বাত্মক অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে রাজধানী ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়। এই কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বন্ধু ও চাচাতো ভাই রাকিবকে সাথে নিয়ে মিরপুর ১০ এ শুক্রবার জুমার নামাজ পড়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন নাহিদ। আন্দোলনে মিছিল চলাকালিন ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া হয়। এক পর্যায় প্রথমে রাকিব বুলেট খায় তার কিছুক্ষণ পরে পুলিশের গুলি এসে বুকে লেগে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায় নাহিদের এবং সেখানেই লুটিয়ে পড়ে নাহিদ। সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন তাকে। এছাড়াও পুলিশ ও বিজিবির নৃশংস গুলিতে ১১৯ জন শাহদাতবরণ করেন। এরপরপরই ছাত্র আন্দোলন রূপ নেয় গণআন্দোলনের প্রতীক হিসেবে। এদিন রাস্তায় ছাত্রদের চাইতেও বেশি ছিল নানান শ্রেণির, নানান পেশার মানুষ যাদের একটাই দাবী ছিল স্বৈরাচার হটানো। বলাবাহুল্য সারাদেশের চেয়ে রাজধানী ঢাকা ছিল বেশি অগ্নিগর্ভ, যেখানে এইদিনে শহীদ হয়েছিল শত শত মানুষ। ঢাকার যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, রামপুরা-বাড্ডা, সায়েন্সল্যাব, মিরপুর ১ ও ১০, মহাখালী, মোহাম্মদপুর, সাভার ছিল আন্দোলনের মূল হটস্পট। এদিন রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। একইসাথে বিচ্ছিন্ন করা হয় সকল ইন্টারনেট সেবা। ফলে তথ্যহীনতায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় সারাদেশ। এই রক্তক্ষরী ১৯ জুলাই পিতা-মাতার কোল খালি করে শহীদ হন নাহিদুল ইসলাম।

নাহিদুলের মৃত্যু শুধু তার পরিবারকেই নয়, আমাদের সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আজও যখন তার স্মৃতি আমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন মনে হয় সে যেন একজন সাহসী যোদ্ধা, যার হৃদয়ে ছিল নিখাদ দয়া। নাহিদুল আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তার আদর্শ ও সংগ্রাম চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এই দোয়াই আজ সকলের মুখে।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: বাবার জন্য কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলে উপকার হবে

প্রস্তাবনা-২: বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া যেতে পারে

প্রস্তাবনা-৩: শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতা প্রদান

ডাঃ আজমল হাসপাতাল লিঃ
DR. AZMAL HOSPITAL LTD.

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

পুরো নাম	: মো: নাহিদুল ইসলাম
জন্ম	: ১/১২/২০০৩
পেশা	: শিক্ষার্থী ও বিকাশ মার্কেটিং কর্মী
স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: উত্তর ভাটা মারা , ইউনিয়ন : বড় মাইনকা , থানা: বোরহান উদ্দিন, জেলা: ভোলা
পিতার নাম	: মো: আব্দুল জলিল।
বয়স	: ৫৭ বছর
মাতার নাম	: বিবি ফতেমা , পেশা : গৃহিণী
ভাই বোনের সংখ্যা	: ৩ জন বোন
	: ১) শাহিনা বেগম , বয়স- ২৭, বিবাহিত
	: ২) নূর নাহার , বয়স- ২৫ , বিবাহিত
	: ৩) সুফিয়া, বয়স -২৩ , বিবাহিত
ঘটনার স্থান	: মিরপুর ১০
আক্রমনকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: তারিখ : ১৯/০৮/২০২৪ , বিকাল ৫টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময় স্থান	: ১৯/০৮/২০২৪, মিরপুর আইডিয়েল হাসপাতাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: নিজ গ্রাম, পারিবারিক কবরস্থান

No Picture

শহীদ মোঃ শাহিন

ক্রমিক : ৩৭২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬০

"কত রবো আমি আর পথের দিকে চাইয়া"

জন্ম পরিচয়

শহীদ মো: শাহিন ১৯৮৮ সালের ১২ মে ভোলা জেলার দৌলত থানার অন্তর্গত দক্ষিণ জয়নগর নুরুমিয়ার হাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ সাজেদ ও মা রিনা বেগমের বড় সন্তান ছিলেন। শহীদ মো: শাহিন ছোটবেলা থেকেই ছিলেন দায়িত্বশীল ও ন্যায়ের পক্ষে। তাই পরিবারের বড় হিসেবে নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে ছিলেন সচেতন। ছোট দুই ভাই ও এক বোনের দেখাশুনা করতেন তিনি।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

শহীদ মোঃ শাহিন এর বাবা ছিলেন ভ্যানচালক আর মা মিনা বেগম গৃহিণী। দরিদ্র এই সংসারের টানাপোড়েন যেন লেগেই থাকে। তাই নিজেও লেগে যান কাজে। পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভার হিসেবে কাজ শুরু করেন। এরই মধ্যে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন তিনি। দুই সন্তানের জনক শহীদ মো:শাহিন থাকতেন ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে। চন্দনকোঠা বিদ্যুৎ ভিলার একটি মাত্র রুমের ছোট বাসা নিয়েছিলেন আশ্রয় হিসেবে। এত অভাবেও ভুলে যাননি বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব। বাবাকে নিজের বাসায় রাখতে না পারলেও প্রতিদিনের খাবার খাওয়াতেন একই সাথে। তার মা অন্যদের আশ্রয়ে ছোট ভাই ও বোনকে নিয়ে থাকতেন গ্রামে। সেখানেও নেই তাদের কোন নিজস্ব জমি-জমা কিংবা বাড়ি। এভাবেই দারিদ্রের সাথে যুদ্ধ করে চলছিল তাদের জীবন।

ঘটনার বিবরণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই নিজের স্ত্রীর সাথে সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন শহীদ মো: শাহিন। প্রতিদিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে মিছিল বা সমাবেশে যোগ দিতেন তিনি। বাসায় এসে সারাদিনের খবর জানাতেন স্ত্রীকে। সার্বিক পরিস্থিতি শুনে তার স্ত্রী কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাকে আন্দোলনে অংশ নিতে মানা করেন। কিন্তু শাহীন তার সন্তানদের কথা চিন্তা করেন। কিছুদিন পরেই তো তার ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে। আর তিনি তো চান না তারা বৈষম্যের শিকার হোক। সে কথাই তুলে ধরেন স্ত্রীর কাছে। অগত্যা তার স্ত্রী তাকে আর বাধা দিতে পারেননি। তাছাড়া শাহিন ছিলেন বিএনপির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে নানা বৈষম্য ও জুলুমের শিকার হয়ে আসছিলেন। তাই মনে প্রাণে স্বৈরাচার হাসিনাকে হটিয়ে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার চিন্তায় ছিলেন। ৪ আগস্ট সকাল থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন তিনি। ৫ আগস্ট সকালবেলায় পরিবারের জন্য নাস্তা কিনে আনেন ও দুপুরের খাবারের জন্য বাজার করে দিয়ে যান। স্বৈরাচার পতনের খবর পেয়ে উল্লসিত জনতা বিজয় মিছিলে অংশ নেয়।

শাহিনেরাও ছিলেন সেই মিছিলে। কিন্তু যাত্রাবাড়ী থানার সামনে যেতেই পুলিশী আক্রমণের সম্মুখীন তারা। তখনও পুলিশ বাহিনী স্বৈরাচারের পক্ষ হয়ে বর্বর আক্রমণ চালায়। তাদের গুলির আঘাতে অনেক মানুষ আহত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। পরবর্তীতে কিছু মানুষ তাদের হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করে। শহীদ শাহিনের ছোট দুই ভাইও তখন আহতদের রিকশায় তুলছিলেন হাসপাতালে নেয়ার জন্য। শহীদ শাহিনের সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত থাকায় তৎক্ষণাৎ নিজের ভাইকেও চিনতে পারেননি তারা। রিকশা অনেকটা দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের খেয়াল হলো তাদের ভাইকে তো তারা রিকশায় উঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে রিকশা চোখের আড়াল হয়ে গেছে। দুই ভাই সাত-পাঁচ না ভেবে ঢাকা মেডিকেলে চলে যান। সেখানে গিয়ে এ বেড থেকে ওই বেডে নিজের ভাইকে খুঁজে ফিরছিলেন তারা। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না নিজের ভাইকে। পরে খোঁজ নিতে মর্গের সামনে যেতেই দেখতে পান তাদের ভাইয়ের নিথর দেহ পড়ে আছে সেখানে। ডুকরে কেঁদে ওঠেন তারা। এ দৃশ্য দেখে কেউ কাউকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে একটি এম্বুলেন্স ভাড়া করে নিজ গ্রামে নিয়ে আসেন। শাহিনের পরিবার এতটাই দরিদ্র ছিল যে তাকে কবর দেওয়ার মতো জায়গাটুকু ছিল না তাদের। তাই গ্রামের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

স্ত্রীর অনুভূতি: আমি আমার স্বামীকে অনেক ভালোবাসি। সেও আমাকে অনেক ভালোবাসত। ছোট থেকে আমার অনেক কষ্ট কিন্তু উনাকে পেয়ে আমি সব কষ্ট ভুলে গেছি। সে কখনো আমাকে

বাহিরে বের হতে দিত না। সব সময় আমাকে আগলে রাখার চেষ্টা করতো। এখন আর আগলে রাখবে কে। কে আমাকে ভালোবাসবে। উনি ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার। দোয়া করি উনি ওপারে ভালো থাকুক। আল্লাহ উনাকে জান্নাত দান করুন।

নিকটাত্মীয় চাচা মো: সাদেকের অনুভূতি: আমার ভাইয়ের ছেলে অত্যন্ত মিশুক ছিলো। তারে আল্লাহ ফুটফুটে দুইটা বাচ্চা দিয়েছেন। আল্লাহ এত অল্প বয়সে নিয়ে যাবে কল্পনা করা যায়না। ওর প্রতি আমাদের অনেক টান আছে। আমরা মরণের আগ পর্যন্ত ওর সন্তানদের দেখে যাবো। আমার ছেলে বউ ওদের খুব আদর করে। তারা এদের সকল খরচ বহন করবে ইনশাআল্লাহ। তবে যারা আমার নাতি নাতিনদের ক্ষতি করেছে আল্লাহ তাদের বিচার করুক। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত দান করেন।

শহীদ পরিবারকে সাহায্যের প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: ছোট ২টি বাচ্চার দেখাশুনার ভার নেয়া

প্রস্তাবনা-২: পরিবারকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

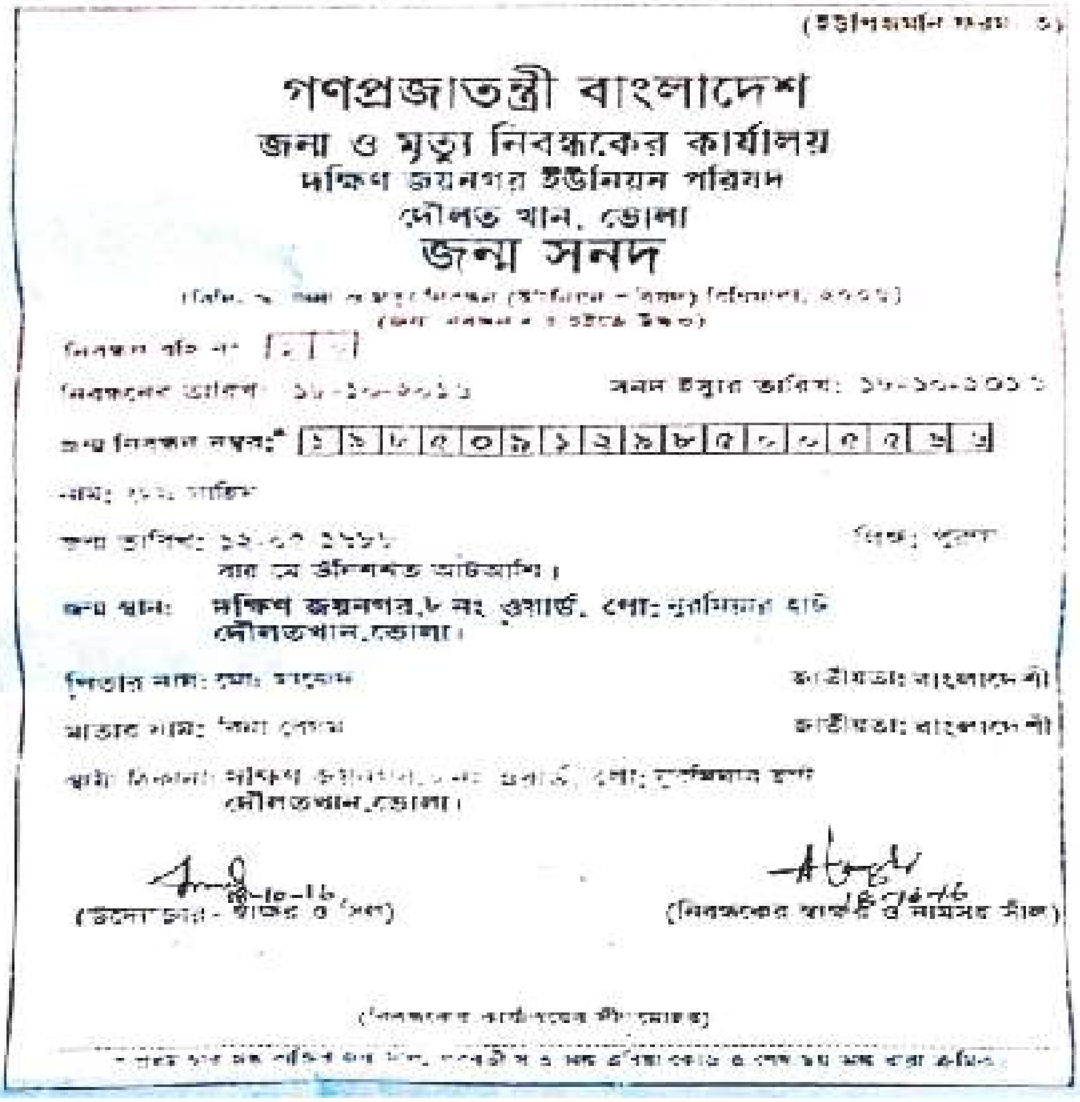
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
দক্ষিণ জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ
দৌলত খান, ভোলা
জন্ম সনদ

একনজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: শাহিন, পেশা: পিকআপ চালক
জন্ম তারিখ	: ১২-০৫-১৯৮৮
পিতা	: মো: সাজেদ, পেশা: ভ্যান ড্রাইভার
মাতা	: রিনা বেগম, পেশা: গৃহিণী
পরিবারের সদস্য	: ১. স্ত্রী: স্বপ্না বেগম, পেশা: গৃহিণী
	: ২. ছেলে: জোনায়েদ আব্দুল্লাহ, বয়স: ৬ মাস
	: ৭. মেয়ে: জান্নাতুল ফেরদৌস, বয়স: ৪ বছর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ জয়নগর নুরুমিয়ার হাট, থানা: দৌলতখান, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: এলাকা: চন্দনকোটা বিদ্যুৎ ভিলা, থানা: যাত্রাবাড়ী, জেলা: ঢাকা
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: যাত্রাবাড়ী, ৫ আগস্ট, ২০২৪
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: যাত্রাবাড়ী, ৫ আগস্ট ২০২৪

শহীদ সাইদুল ইসলাম

ক্রমিক : ৩৭৩

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬১

"নামাজের দিকে এসো কল্যাণের দিকে এসো"

মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি শুনে তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে গেল সাইদুল। জোহরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়ে উপস্থিত। তাও আবার সামনের সারিতে। আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই। কোরআনের সেই আয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে অগ্রগামীদের কাতারে শামিল হয়ে গেল সাইদুল।

শহীদ পরিচিতি

শীতের পাতা ঝরা রুক্ষতার অবসান ঘটিয়ে বসন্ত উপহার দেয় ফুলের ডালি। তেমনি সাইদুল যেন স্রষ্টার পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য ছিল বসন্তের ফুলের ডালি। যে সমাজে কন্যারা নিজেদের অধিকারটুকুই আদায় করতে পারেনা সে সমাজে কি আর মেয়েরা সংসারের হাল ধরতে পারে? তাইতো তিন কন্যার পর সাইদুলকে দেখে দরিদ্র বাবা মার মনের কোনে আশা জেগেছিল, তাদের দুঃখের দিন বুঝি এবার ঘুচবে। ছেলে তাদের সংসারের হাল ধরবে। সেই সংসারের হালে হাত রাখার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল সাইদুল। শহীদ সাইদুল ২০১০ সালের ১০ মার্চ ভোলা জেলার লালমোহন থানার অন্তর্গত কালমা ইউনিয়নের গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থা

সাইদুল ছিলেন খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার বাবা প্রতিবন্ধী। তবুও সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারেন না। দিনমজুরি করে অল্প কিছু অর্থ পান যেটা দিয়ে সংসারের কোন প্রয়োজনই তেমন মিটাতে পারেন না। আর থাকার জন্য তাদের রয়েছে অতিজীর্ণ একটি মাত্র টিনের ঘর। বন্যার কারণে তাও এখন ভগ্নপ্রায়। সাইদুলের চার বোনের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী ও একজন দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। বড় দুই বোনের বিয়ে হলেও সেখানে নেই কোন শান্তির ছায়া। বাধ্য হয়ে তারাও গার্মেন্টসে শ্রমিক হিসেবে কাজ নেয়। অসহায় বাবার সংসারটাকে একটু এগিয়ে নেয়ার বৃথা চেষ্টারত বড় দুই বোন।

যেভাবে শহীদ হলেন

পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া সাইদুল তার বড় বোনকে দেখতে ঢাকায় যায়। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল নতুন একজোড়া পোশাক ও কিছু বই কেনার। নতুন দিনের স্বপ্ন ছিল মনে। কিন্তু তার স্বপ্ন ভেঙে গেল ২১ জুলাই ২০২৪। সেদিন দুপুর জোহরের আযান শুনে দ্রুত তৈরি হয়ে গেল সালাতের জন্য। বোনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নিকটবর্তী মসজিদের উদ্দেশ্যে। সবার সামনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছিল সাইদুল। ফলে ইমাম সাহেবের সাথে তার দেখা হয় মসজিদে। নামাজ শেষে যখন সে বাসায় ফিরছিল তখনই আক্রমণ করে ঘাতক পুলিশ । একটি গুলি সাইদুলের কপাল ভেদ করে ছুটে যায় মাথার পিছনের দিক দিয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। রক্তে ভিজে যায় তার পবিত্র দেহ। কিছুক্ষণ এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকেন তিনি। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা সরে গেলে একজন রিকশাওয়ালা দ্রুত তাকে নিজে রিকশায় উঠিয়ে ছুটে যান হাসপাতালে। তখনও টিকটিক শব্দের স্পন্দন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েকটা হাসপাতালে ঘুরাঘুরি করেও তাকে ভর্তি করানোর সুযোগ পায়নি সে রিকশাওয়ালা। ততক্ষণে সাইদুলের পবিত্র আত্মা তার রবের সান্নিধ্যে চলে গেছে। রিকশাওয়ালা সাইদুলের পকেটে থাকা মোবাইল থেকে নম্বর নিয়ে তার ছোট খালুকে জানালে তিনি সাইদুলের পরিবারের সাথে কথা বলেন। পরবর্তীতে তার বড় বোন তার শহীদ হওয়ার খবর জানতে পারেন। সাইদুলের লাশ রাখা হয়েছিল মসজিদের সামনে। লাশ দেখে ইমাম সাহেব ও কয়েকজন মুসল্লী হতভম্ব হয়ে যান। কারণ এই কিছুক্ষণ আগেই তো সাইদুল তাদের সাথে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। তার বড়বোন খবর পেয়ে দিগ্বিদিক ছুটতে থাকেন একমাত্র ভাইয়ের খোঁজে। মসজিদের সামনে এসে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। একি! এ যে তার সোনার টুকরা ভাই শহীদ হয়েছে। এজন্যই বুঝি একেবারে সেজেগুজে রবের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল। অটোতে করে লাশ বাসার সামনে আনার পর পুলিশ এসে হাজির হয় সেখানে এবং সাইদুলের লাশ বাড়িতে নেয়ার জন্য সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তার বোন জোর করতে থাকলে তাকে পুলিশ গুলি করার হুমকি দেয়। হুমকির মুখে তার বোন বলেন, প্রয়োজনে ভাই বোন একসাথে মরবো তবুও ভাইয়ের লাশ রেখে যাব না। আমার মাকে আমি কি দিয়ে সান্ত্বনা দিবঃ অনেক বাক বিতণ্ডার পর পুলিশ বাধ্য হয় লাশ দিতে। কিন্তু ভোলা পর্যন্ত ভাইয়ের লাশ নেওয়ার খরচ ও যে সে বহন করতে পারবে না। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় এম্বুল্যান্স এ করে একমাত্র ভাইয়ের লাশ নিয়ে যান বাড়িতে। পরের দিন সকালে সাইদুল সমাহিত হন নিজ গ্রামে

শহীদ সম্পর্কে বন্ধু/নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

মা হাসিনা বেগম বলেন, আমার একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে আমার কলিজা ছটপট করে। আজ এক মাস আমি না খাওয়া। আমার ৪ মেয়েসহ খুব অসহায়ভাবে আছি আমরা। দিন রাত আমার ছেলের জন্য কাঁদি। ঘটনার দিন কোন করে ছেলেকে বলেছি, বাবা মেইন রোডে যাবা না। কেন গেলঃ ছেলে জানি না। আমি ঋণগ্রস্থ: ২ লাখ টাকার ঋণের বোঝা মাথায়। আমরা কোথাও বের হইনা।

চাচা আবু কালাম বলেন, ওরা ৫-৬ জন গুলি খায়। অটো দিয়া বাসার সামনে আসলে মৃত লাশটি বোন নিতে চাইলে খুনি পুলিশ বাধা দেয়। আমার ভাই প্যারালাইসিস রোগী। কামাই নাই খুব কষ্টে চলছে জীবন।

শহীদ পরিবারকে সহযোগিতার প্রস্তাবনা

১.বাবার কর্মসংস্থান করে দেয়া
২.ঘর নির্মাণ করে দেয়া
৩.প্রতিবন্ধী বোনের পুনর্বাসন প্রয়োজন

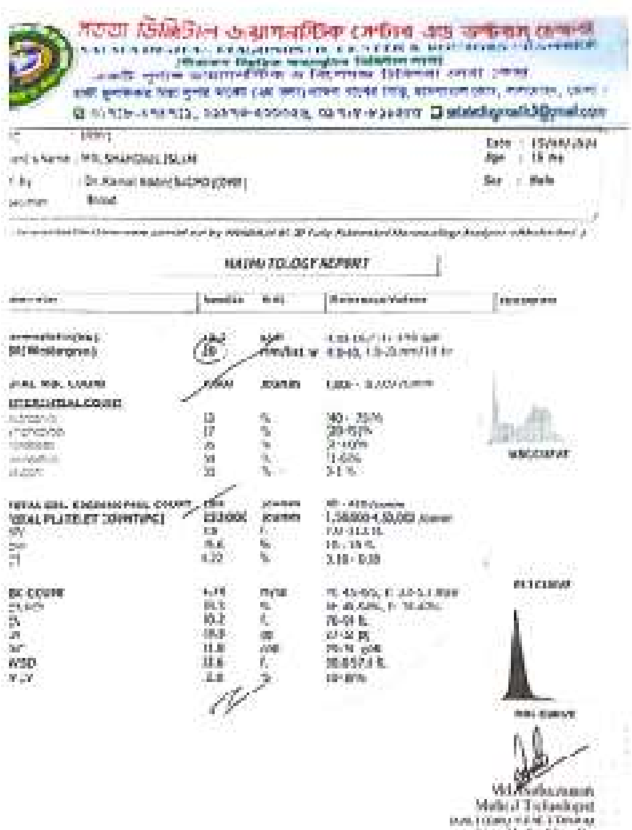
HAEMATOLOGY REPORT

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

পুরো নাম	: সাইদুল ইসলাম
জন্মতারিখ	: ১০/০৩/২০১০
পিতার নাম	: আকবর
বয়স	: ৫০
পেশা	: রিকশাচালক
মাতার নাম	: হাসিনা বেগম
বয়স	: ৪৬
পেশা	: গৃহিণী
ঠিকানা	: গ্রাম: ১ নং ওয়ার্ড লেজ ছকিনা, ইউনিয়ন: কালমা, থানা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৬ জন
বোন	: ১. মেহানা-২২ বছর-গার্মেন্টস কর্মী
	: ২. সুমাইয়া -২০ বছর -গার্মেন্টস কর্মী
	: ৩. সোনিয়া-১৬ বছর-প্রতিবন্ধী
	: ৪. সাদিয়া-১০ বছর-ছাত্রী
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: মৌচাক,সানারপাড়, সাইনবোর্ড ২১/০৭/২০২৪
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: মৌচাক, সানারপাড়, সাইনবোর্ড ২১/০৭/২০২৪
সমাধি	: নিজ গ্রামে

শহীদ মোঃ সেলিম তালুকদার

ক্রমিক : ৩৭৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬২

**‘মানুষের ছেলেরা শহীদ হচ্ছে,
তোমার ছেলে আঁচলে বাঁইধা রাখবা নাকি!
দোয়া করো যেন শহীদ হই।’**

শহীদ পরিচিতি

সেলিম তালুকদারের গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলার মল্লিকপুর গ্রামে। বেড়ে ওঠা ঢাকার মধ্যবাড্ডা এলাকায়। বন্ধু-বান্ধব, এলাকাবাসীর কাছে তিনি রমজান (ডাকনাম) নামে পরিচিত। সুলতান তালুকদারের চার সন্তান। তাদের মধ্যে সেলিম ছিলেন মেজো এবং তিন বোনের একমাত্র ভাই। ছেলেবেলা থেকেই নম্র, ভদ্র, হাসমুখ হিসেবে পরিচিত এলাকায়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত আদায় করতেন, পরিবারের সদস্যদেরও নামাজের ব্যাপারে তাগাদা দিতেন।

বিজিএমই ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি থেকে দুই বছর আগে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে নারায়ণগঞ্জের মেট্রো নিটিং এন্ড ডাইং মিলস লিমিটেড-এর সহকারী মার্চেন্ডাইজার পদে চাকরি করতেন। ২০২৩ সালের ৪ আগস্ট বিয়ে করেন সুমি আক্তারকে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৬ বছরের নির্যাতন, নিষ্পেষণে পিষ্ট বাংলাদেশের মানুষ ভুলতে বসেছিল অধিকার কেউ থালায় সাজিয়ে দেয়না, আদায় করে নিতে হয়। স্বৈরাচারী হাসিনার দুঃশাসনকেই তাদের ভাগ্যের লিখন মেনে নিয়েছিল। "এই দেশে আর কিছু হবেনা"- এই বাক্যই ছিলো প্রবীণদের দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু দেশের ছাত্রসমাজ এই দীর্ঘশ্বাসকে প্রত্যাখান করেছিল। যে দেশের বিদ্রোহী কবি নজরুল, রেনেসা কবি ফররুখ, আধুনিকতায় লালিত হয় মীর আব্দুশ শাকুর আল মাহমুদ এবং আধ্যাত্মিকতায় মল্লিক সে দেশের তরুণ সমাজকে বেশিদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। তথাকথিত "চেতনার বড়িতে" অরুচি হয় দ্রুত। উন্নয়নের ফানুস তাদের হৃদয়ে কোন ভাবাবেগ তৈরী করেনা। তারা দ্রুতই বুঝতে পারে তাদের দেশের নীতিনির্ধারনী পরিষদ মিথ্যাবাদী, ভাঁড়, নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন, মনোরঞ্জনকারী গায়ক-নর্তকীদের এক মহামিলন। যারা দেশকে এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যাদেরকে এখনই থামানো না গেলে সামনে গভীর পতন ছাড়া আর কিছুই নেই এদেশের ভাগ্যে।

স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠলে সময়ের ব্যবধানে সমগ্র জাতি এতে সাড়া দেয়। সারাদেশে ছাত্র জনতার ঢল নামে। মুখে মুখে উচ্চারিত হয় স্বৈরাচারের পতনধ্বনি। সে আন্দোলনে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে শুরু থেকেই যোগ দেন সেলিম তালুকদার।

১৮ জুলাই খুব সকালে সেলিম তার ইউনিভার্সিটির পুরনো আইডি কার্ডটি বের করেন। তার মা জিজ্ঞাসা করলে তেমন কিছু বলেননি। পরে মা বুঝতে পারেন তিনি আন্দোলনে যাচ্ছেন। তার স্ত্রী অসুস্থ থাকায় তাকে সেখানে যেতে নিষেধ করেন মা। উত্তরে সেলিম বলেন, 'মানুষের ছেলেরা শহীদ হচ্ছে, তোমার ছেলে আঁচলে বাঁইধা রাখবা নাকি! দেখছো রংপুরের ছেলেটা ক্যামনে বুক আগাই দিয়া শহীদ হইছে, দোয়া করো যেন শহীদ হই'- এ কথা শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মা সেলিনা বেগম। আন্দোলনে না যাওয়ার জন্য পরিবারের লোকেরা অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে। তার স্ত্রী বারবার বাধা দেয়। সে স্ত্রী, বাবা ও মাকে জানায়- আমরা যদি আন্দোলন না করি তাহলে এই স্বৈরাচারের পতন হবে? সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর অসুস্থতা ফেলেই চলে যান আন্দোলনে।

> আন্দোলন যার রক্তে আগুন জ্বালিয়েছে, শাহাদাতের সুধা পানের লক্ষ্যে তৃষিত যে হৃদয়, তাকে আটকিয়ে রাখার সাধ্য কার !!

সেইদিন ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমপ্লিট শাট ডাউন কর্মসূচি। আর সেইদিন মেরুল বাড্ডা থেকে রামপুরা পর্যন্ত সমস্ত রাজপথ ছিল ছাত্র জনতার দখলে। আন্দোলনের মিছিলে প্রথম সারিতে ছিলেন শহীদ সেলিম। ১৮ জুলাই বেলা ১১টার দিকে তিনি ফেসবুকে একের পর এক সহিংসতার ভিডিও প্রকাশ করতে থাকেন। ছাত্রজনতার সাথে পুলিশ ও ছাত্রলীগের থেমে থেমে সংঘর্ষ হতে থাকে। একপর্যায়ে মিছিল ভঙ্গ করতে খুনি হাসিনার পুলিশ ও হেলমেট বাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকে। দুপুর ১১ টার দিকে এক পর্যায়ে পুলিশের গুলিতে সেলিম আহত হন, শর্টগান থেকে ছোড়া অসংখ্য স্প্রিন্টার আঘাত করে তাকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সেলিম। তার শরীরের রক্তে রাজপথ লাল হয়ে যায়।

বেলা ১টার দিকে সেলিমের ফোন থেকে অপরিচিত একজন ফোন করে তার পরিবারকে জানান, সেলিম গুলিবিদ্ধ এবং ফরাজি হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তার পর থেকে বন্ধ পাওয়া যায় ফোন। দিশেহারা মা ও তার ছোট বোন পাগলের মতো ছুটে যান হাসপাতালে। সেখানে গিয়ে না পেয়ে ছুটে যান মুগদা মেডিকেলে। দেখতে পান গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সেলিম। ছররা গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে আছে তার শরীর ও মাথা। গুরুতর অবস্থায় আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে নেয়া হয় তাকে। অবস্থার আরো অবনতি হলে ধানমন্ডি পপুলার হসপিটালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। এক্স-রে ও সিটিস্ক্যানে সেলিমের মাথায় ১৮টি, বুক ও পিঠে ৫৭টি ছররা গুলি পাওয়া যায়। শরীরে অসংখ্য ক্ষত নিয়ে টানা ১৩ দিন লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থায় ১ আগস্ট মৃত্যু হয় তার।

আহত অবস্থায় প্রশাসনিক হয়রানির ভয়ে অনেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে ভর্তি নিতেও অস্বীকৃতি জানায়। মৃত্যুর পর সনদ নিতে গিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়ে সেলিমের পরিবার। স্ত্রী সুমি বলেন, ১ আগস্ট হাসপাতাল থেকে মৃত্যুর সনদ নিতে গিয়ে পুলিশ সকাল থেকে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত লাশ আটক রাখে। স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে মর্মে সেলিমের বাবার কাছ থেকে লিখিত নেয়। একপর্যায়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই সেলিমের লাশ নিয়ে আসতে হয়। এদিন বাড্ডার লিংক রোডে কুমিল্লাপাড়া এলাকায় (ভাড়া বাসা) প্রথম জানাজা শেষে রাতেই গ্রামের বাড়ি নলছিটি উপজেলার উদ্দেশে রওনা হয় তার পরিবার। ২ আগস্ট সকালে দ্বিতীয় জানাজা শেষে নিজ বাড়ির মসজিদের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হন সেলিম তালুকদার।

> সেলিম তালুকদারের মৃত্যুর তিনদিন পর কুলখানির আয়োজন করা হয়। সেদিনই ছিল তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী।

নাটকের চেয়েও বেশি নাটকীয়

পুলিশের গুলিতে আহত হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন সেলিম। তখনো জানতেন না তিনি বাবা হতে যাচ্ছেন। কুলখানি অনুষ্ঠানের দিন সেলিমের স্ত্রী অসুস্থ হন। ৫ আগস্ট চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে জানা যায়, সুমি আক্তার চার সপ্তাহ ছয়দিনের অন্তঃসত্ত্বা। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচদিনের মাথায় মা হওয়ার খবরে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন সুমি আক্তার।

শুধু সেলিম তালুকদারের মৃত্যু শোকই নয়, অনাগত এক শিশুর পিতৃহীনতা, সুমি আক্তার আর সন্তানের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কর্মক্ষমতা হারানো বাবার একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেসন্তান হারানো, এমন আকস্মিক বিপদে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই যেন জীবন্মৃত।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

পড়াশোনা শেষ করে সেলিম হাল ধরেন পরিবারের। কাজ করতেন নারায়ণগঞ্জের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সহকারী মার্চেন্ডাইজার হিসেবে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেসন্তানকে হারিয়ে পাগলপ্রায় বাবা-মা। অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূর ভবিষ্যৎ, পরিবারে একমাত্র আয়ের উৎস সন্তানকে হারিয়ে নিঃস্ব হাতে ঢাকা ছেড়ে স্থায়ীভাবে গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেলিমের পরিবার।

বাবা সুলতান তালুকদার কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন অনেক বছর আগে। পেশা হিসেবে নিজের রেন্ট-এ-কারে একসময় যাত্রী পরিবহন করতেন। ৬৬ বছর বয়সে গাড়ি চালানোর কাজে দীর্ঘ সময় বসে থাকলে হাত-পা ফুলে যায় তার। কর্মে ফেরাও এখন অসম্ভব। এ পরিবারে হাল ধরার মতো নেই আর কেউ। কীভাবে সংসার চলবে, সেলিমের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে যেনে এক অনিশ্চিত জীবন পার করছে সেলিমের পরিবার।

সুমি বলেন, 'আমি দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমাকে সরকারিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিলে অনাগত সন্তানকে নিয়ে ভালোভাবে বেঁচে থাকাতে পারতাম। আমি আমার স্বামী হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ন্যায়বিচার চাই।'

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

বোন নাসরিন আক্তার সুমা বলেন, আমার ভাই আমাদের পড়াশুনার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। আমাদেরকে নামাজ পড়ার জন্য তাগিদ দিতেন। কখনো ভাই খারাপ কাজ করতেন না। আল্লাহ ভাইকে এত তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। তার কথা মনে পড়লেই অনেক কষ্ট লাগে। আল্লাহ ভাইকে জান্নাত নসিব করুন।

সেলিমের বাবা সুলতান তালুকদার বলেন, একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে আমরা এখন দিশেহারা। অনাগত সন্তানের মাঝে ওর স্মৃতি ধরে রাখতে চাই। এখন সরকারের কাছে আমাদের দাবি, আমার ছেলে যেন শহীদের তালিকায় স্থান পায়।

সেলিমের শ্বশুর মতিউর রহমান বলেন, আমার মেয়েটা অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গেল। গর্ভে সেলিমের অনাগত সন্তান। আমার মেয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থী। এখন ওর যদি কোনো কর্মসংস্থান হয়, তবে অনাগত সন্তানকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে।

প্রস্তাবনা

১. শহীদের চিকিৎসা বাবদ তার পরিবার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ করেছে। ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২. তার বিধবা স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩. বোনের পড়াশোনা ও বিয়ের বিষয়ে সহযোগিতা করা যেতে পারে।

৪. অসুস্থ পিতা মাতার জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Zone - 1, Dhaka North City Corporation
Dhaka, Bangladesh

Birth Certificate

Date of Birth: 21-01-1995

Place of Birth: Dhaka, Bangladesh

Father's Name:
Nationality: Bangladeshi

Mother's Name:
Nationality: Bangladeshi

Permanent Address:

Present Address:

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

নাম	: মো: সেলিম তালুকদার
পেশা	: চাকরিজীবি
জন্ম তারিখ	: ২৫-০১-১৯৯৫
পিতা	: সুলতান তালুকদার, মাতা: সেলিনা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: দক্ষিণ মল্লিকপুর, ইউনিয়ন: নলছিটি পৌরসভা, থানা: নলছিটি, জেলা: ঝালকাঠি
ঘটনার স্থান	: ব্রাক ইউনিভার্সিটি, মেরুল বাড্ডা
আহত হওয়ার সময়কাল	: ১৮-০৭-২০২৪, সকাল ১১.৩০
শাহাদাতের সময়কাল	: ৩১-০৭-২০২৪
আঘাতের ধরন	: ছররা গুলি
আক্রমণকারী	: পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পারিবারিক কবরস্থান, নলছিটি

শাহাদতের দিন সেলিমের স্ত্রী সুমি আক্তার ৪ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন

শহীদ কামাল হোসেন

ক্রমিক : ৩৭৫

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৩

শহীদ পরিচিতি

২৪ এর মুক্তিকামী শহীদ কামাল হোসেন এর ডাকনাম সবুজ (৩৮)। বাড়ি ঝালকাঠি সদর উপজেলার বিনয়কাঠি ইউনিয়নের বালকদিয়া গ্রামে। জন্মদাতা জনাব মুনসুর হাওলাদার (৭০) ও জননী মৃত মাহমুদা বেগমের একমাত্র শহীদ সন্তান তিনি। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ের গাড়ি চালক ছিলেন এই তেজস্বী বীর। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর নিজের একাকীত্ব জীবন ঘুচাতে সাদিয়া বেগম রাণীর (৩২) সাথে রঙিন জীবনে বাঁধা পড়েছিলেন কামাল। একেএকে দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্ম নেয় তিন সন্তান। ছেলেদ্বয় সামিউল ইসলাম (১৩) ও আবদুল্লাহ (৫)। একমাত্র মেয়ে ইসতিরাক জাহান (৩)। মধ্যবিত্ত পরিবার হলেও শহীদ ছিলেন দায়িত্ব পালনে অনড়।

আর্থিক অসঙ্গতি থাকলেও সততা ও পরিশ্রমের বলয়ে নিজ পরিবারকে নিয়ে মফস্বল ছেড়ে ঝালকাঠি শহরে ভাড়া বাসায় সংসার পেতেছিলেন। স্বপ্ন দেখতেন সন্তানেরা একদিন মানুষের মত মানুষ হয়ে পরিবারের হাল ধরবে। দিন-রাত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক ভাবে অসুস্থতা অনুভব করলেও তাঁকে থামানো যায়নি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হিসেবে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভরসা। দেশের স্বাধীনতা ফেরাতে পরিবারের কথা না ভেবে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে নিজেকে ঠাঁই করে নিয়েছেন শহীদ কামাল হোসেন সবুজ।

ঘাতকদের সাথে লড়াইয়ের দিন গুলো কেমন ছিল

দীর্ঘ ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জুলাই-আগস্ট ২০২৪ গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। যার ফলে নতুন এক সম্ভাবনার সূচনা হয়েছে। আগামীর বাংলাদেশ কীভাবে চলবে, তার একটি গতিমুখ ঠিক করে দিয়েছে এই আন্দোলন। এই গতিমুখের সঙ্গে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশও ঘটেছে। আপামর জনতা এক হয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলে সোচ্চার হয়ে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার পতন ঘটায়। আন্দোলনের একমাত্র কারণ ছিল দেশের মানুষ যাতে ন্যায়বিচার পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় জনমতের স্বাধীন চেতনা। প্রভাবমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে দেশের জনগণ একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। একই সঙ্গে গণমাধ্যমকে ক্ষমতাসীনরা যেন ভয় দেখাতে না পারে, নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকে, ক্ষমতার ভারসাম্য হয়, ধর্ম-মতের নাগরিকগণ সকলে নিজেদের অধিকার যেন ফিরে পায়! জুলাই ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক ক্রান্তিকাল লগ্ন। সারাদেশে ছাত্র-জনতা সরকারী চাকরির বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একযোগে আন্দোলনের ডাক দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন জনগোষ্ঠী। আন্দোলন দমাতে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে। গত ১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর ফটকে ঘাতক পুলিশের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ শাহাদত বরণ করেন। শিক্ষার্থীদের সামনে হাসতে হাসতে গুলি চালায় আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টকারী দেশের চরম শত্রু, স্বৈরাচারী, খুনি, নরখাদক হাসিনার লেলিয়ে দেয়া হিংস্র পুলিশ বাহিনী। ফলে রাজধানী সহ সারাদেশে ছাত্র-জনতা দূর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। স্বৈরাচারের দোসররা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ঘোষণা করে এবং শিক্ষার্থীদের হলত্যাগের নির্দেশ দেয়। সেদিন এক অভূতপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হয় বাংলাদেশ। স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাত-পা বেঁধে ফেলার পরও আন্দোলন থেমে থাকে না। ঊর্ধ্বগতিতে আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আন্দোলন দীর্ঘায়িত করতে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। যেন সংগ্রাম নেতৃত্বের ভার তারা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিল সেদিন। আন্দোলন নতুন করে গতি ফিরে পায়। সরকারের রক্তচক্ষুকে অপেক্ষা করে ময়দানে সরব হয়ে ওঠে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আপামর জনতা। ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে বিভিন্ন কর্মসূচি তারা বাস্তবায়ন করে।

Death Registration Certificate

যেভাবে তিনি শহীদ হন

২০ জুলাই ২০২৪ শনিবার, সকাল নয় ঘটিকা। রাজধানীর বাড্ডার শাহজাদপুর এলাকায় নাস্তা খেতে বের হয় কামাল হোসেন সবুজ। ইচ্ছে ছিল নাস্তা শেষে কর্মস্থলে ফিরবেন। পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন খবরাখবর দেখে আন্দোলনে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছে পোষণ করেন তিনি। তবে পেশায় গাড়িচালক হওয়ায় সময় বের করতে পারেন না। হঠাৎ নাস্তা করা কালীন ঘাতক পুলিশের একটি গুলি তাঁর কপালে এসে বিদ্ধ হয়। মুহূর্তে মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে আসে কামালের। পথচারীরা দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্বৈরাচারের পেটুয়া বাহিনী হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাঁধা দেয়। হাসপাতাল কর্মীরা ভয়ে চিকিৎসা সেবা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। চিকিৎসার অভাবে ধীরেধীরে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েন শহীদ কামাল হোসেন সবুজ। শহীদের লাশ পরদিন ২১ জুলাই রবিবার ঝালকাঠি সদর উপজেলার আগরবাড়ি এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে দাফন করা হয়।

নিউজ লিংক

https://sokalerkhobor24.com/news/54710/

https://www.somoynews.tv/news/2024-07-25/0FYLUzDx

https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/v0c2oxpkjyf

https://www.kalbela.com/country-news/107144

পরিবারের অভিমত

শহীদ স্ত্রী সাদিয়া বেগম রাণী (৩২) বলেন- 'এই তিন ছেলে মেয়ে এখন এতিম হয়ে গেল! আমি ওদের নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, এখন কে ওদের দেখবে? 'সংসার চালানোর মতো কেউ আর রইল না। বাকি দিনগুলো কীভাবে চলবে ভেবে উঠতে পারছি না।'

জনাব রিপন বলেন, 'আমার ভাগ্নে-ভাগ্নিরা পিতাহারা হয়ে গেল। অল্প বয়সে বোনটি বিধবা হয়ে গেল। ওদের কান্না আর সহ্য করতে পারছি না। আমি এর বিচার চাই।'

শহীদ পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তিন সন্তানের লেখাপড়ার খরচ, পরিবারের ভরণপোষণ, এবং সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য নিজের পৈতৃক জমিতে বাড়ি নির্মাণ করতে গিয়ে আর্থিক টানাপড়েনে পড়েন কামাল হোসেন ও তাঁর পরিবার। একমাত্র উপার্জনকারীর মৃত্যুতে শহীদ পরিবারটি এখন নিঃস্ব। সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। শহীদের প্রস্থানের পর ভাড়া বাসা ছেড়ে গ্রামে ফিরে গিয়েছে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা।

প্রস্তাবনা

১. শহীদ পরিবারে মাসিক ও এককালীন সহায়তা করা যেতে পারে।

২. শহীদ সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়া যেতে পারে।

৩. শহীদ স্ত্রীকে কর্মসংস্থান করে দেয়া যেতে পারে।

একনজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

নাম : মো: কামাল হোসেন, বয়স: ৩৮, পেশা: গাড়ি চালক
পিতা : মো: মুনসুর হাওলাদার বয়স: ৭০, অসুস্থ
মাতা : মৃত মাহমুদা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা : ঝালকাঠি, সদর উপজেলা, বিনয়কাঠি ইউনিয়ন, বালকদিয়া গ্রাম
বর্তমান ঠিকানা : একই
শহীদ হওয়ার সময় ও স্থান : ২০ জুলাই ২০২৪, বাড্ডা, শাহজাদপুর, ঢাকা
যাদের আঘাতে শহীদ : পুলিশের গুলি
শহীদের কবরস্থান : ঝালকাঠি সদর উপজেলার আগরবাড়ি (শ্বশুরবাড়ি এলাকায়)

পরিবার : ১. স্ত্রী: মোসা: সাদিয়া বেগম রাণী, বয়স: ৩২, পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১০ম শ্রেণি
: ২. ছেলে: মো: সামিউল ইসলাম, বয়স: ১৩, পেশা: ছাত্র, প্রতিষ্ঠান: ঝালকাঠি সরকারী বিদ্যালয়, শ্রেণি: সপ্তম
: ৩. ছেলে: মো: আবদুল্লাহ, বয়স: ০৫, পেশা: ছাত্র, স্থানীয় মাদ্রাসায় হিফজুল কোরআন বিবাগে অধ্যয়নরত
: ৪. মেয়ে: মোসা: ইসতিয়াক জাহান, বয়স: ০৩

“জীবিকার তাগিদে ঘর থেকে বের হয়ে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরলেন।”

শহীদ মিরাজ

ক্রমিক : ৩৭৬

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মিরাজ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান ভোলা জেলার ২ নং পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের নব কুমার গ্রামে। বর্তমানে তাঁরা ঢাকার মিরপুর ৬ এলাকার একটি বস্তিতে বসবাস করছেন। তাঁর পিতা জনাব মো: মাকসুদ ফরিদ একজন দিনমজুর এবং মাতা মোছা: মিনারা বেগম একজন গৃহিণী। মিরাজুল ইসলাম পেশায় ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রী।

শহীদ মিরাজ অনেক ভদ্র একজন মানুষ ছিলেন। তিনি কাউকে গালি দিতেন না। কোন দল পছন্দ করতেন না। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব আন্দোলনে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হয়ে শাহাদাত বরন করেন।

পারিবারিক অবস্থা
শহীদ মিরাজের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। মিরাজের পিতা দিনমজুরের কাজ করেন আর মা মিনারা বেগম বাসাবাড়িতে কাজ করেন। তার ছোট ভাই মো: রায়হানের বয়স ১৫ বছর এবং মো: আশারফুলের বয়স ৬ বছর। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারনে শহীদ মিরাজ পড়াশোনা বাদ দিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করেন। তাঁদের সামান্য দিয়ে কোনমতে ভাল ভাত খেয়ে দিনাতিপাত করতেন।

বিস্তারিত ঘটনা
দিনটি ছিল ৪ আগস্ট ২০২৪। প্রতিদিনের মত মিরাজ কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। পথিমধ্যে সংঘর্ষের মুখোমুখি হন। মিরপুর ১০ এরিয়াতে তখন পুলিশ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের সাথে আন্দোলনকারীদের তুমুল সংঘর্ষ চলছিল। আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে পুলিশ ও আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসী বাহিনী এলোপাতাড়ি গুলি নিক্ষেপ করছিল। গুলিতে আহত হয়ে আন্দোলনকারীরা রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেকে। আশেপাশের পীচ ঢালা কালো রাস্তা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। টিয়ারশেল, বোমা, গ্রেনেড, বুলেট আর বন্দুকের গুলির ভয়ানক শব্দে চারপাশ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ যেন বাংলার বুকে এক খন্ড ফিলিস্তিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
/ জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম মো: মিরাজ
Name MD. MIRAZ
পিতা মো: মাকসুদ ফরাজ
মাতা মিনারা বেগম
Date of Birth:
ID NO:

এমন অবস্থায় হঠাৎ একটি গুলি এসে শহীদ মিরাজের বুকের বা পাশ দিয়ে ভেদ করে বেরিয়ে যায়। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সেখানেই প্রাণ হারাণ তিনি। পরবর্তীতে তাঁর লাশ উদ্ধার করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য
প্রতিবেশি চাচা মোঃ মোস্তফা বলেন, ছেলেটি অনেক ভালো ছিল। মুরুব্বি দেখলে সালাম দিত, সব সময় নামাজ রোজার প্রতি মনযোগি ছিল। কখনো কারও সাথে কোন বিবাদে জড়াত না। আল্লাহ মিরাজকে জান্নাত নসিব করুন। আমিন

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

নাম	: শহীদ মিরাজ, জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
পিতা	: জনাব মো: মাকসুদ ফরিদ
মাতা	: মোছা: মিনারা বেগম
পেশা	: রাজমিস্ত্রি
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: নব কুমার ইউনিয়ন: ২ নং পূর্ব ইলিশা, থানা: ভোলা, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা	: মিরপুর রোড ৩৪, মিরপুর ৬, ঢাকা
আহত হওয়ার তারিখ	: ০৪/০৮/২০২৪
শাহাদাতের তারিখ	: ০৪/০৮/২০২৪

শহীদ মোঃ রনি

ক্রমিক : ৩৭৭

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৫

শহীদ পরিচিতি

স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে গড়ে ওঠে সরকার পতনের আন্দোলন। হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৬ জুলাই আবু সাঈদের শাহাদাতের মাধ্যমে আন্দোলনে মৃত্যুর মিছিল শুরু হলে পরদিন ১৭ জুলাই আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। তারপর ১৮ তারিখে দেশের বিভিন্ন জেলায় আন্দোলন দমন করতে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ হাতে অস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে ছাত্রদের উপর গুলি চালায় কিন্তু তাতেও তারা থেমে থাকেনি সেই দিন রাত থেকে ইন্টারনেট কানেকশন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দেশব্যাপী কারফিউ জারি করা হয়।

ডিজিটাল ক্র্যাকডাউনের মাধ্যমে ৫ দিন নেটওয়ার্ক বন্ধ রেখে সরকারি পুলিশ ও আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়। অনেক লাশ গুম করা হয়, লাশের স্তুপে আগুন ধরিয়ে লাশ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সর্বশেষ ছাত্রদের দাবি মেনে না নিয়ে আরো বেশি আঘাত হানার চেষ্টা করে তৎকালীন অবৈধ হাসিনা সরকার। আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কদের গুম করা হয়, ডিবি অফিসে তুলে নিয়ে রাতভর করা হয় অমানুষিক নির্যাতন, অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে আন্দোলন শেষ করার ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে ছলনায় পথ ভুলেনা ছাত্রসমাজ। ছাত্ররা রাজপথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকার চেষ্টা করে, অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়। ৯ দফা হয়ে উঠে ১ দফা। বিক্ষুব্ধ স্লোগানে ফেটে পড়ে দেশ,

'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাই ফিরিয়ে দে
লাশের ভিতর জান দে, নইলে গদি ছাইড়া দে
এক দফা এক দাবি, হাসিনা তুই কবে যাবি
আমার ভাই মরলো কেন, খুনি হাসিনা জবাব চাই'

অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে দেশ। অবশেষে সমন্বয়কদের পক্ষ থেকে মার্চ টু ঢাকা কর্মসূচির ঘোষণা আসে।

মো: রনি অফুরন্ত স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে রাজধানী ঢাকায় পাড়ি দেন। অনেকের মত রনিরও স্বপ্ন ছিলো কাজ করে টাকা পয়সা আয় করবেন। পিতামাতার কষ্ট লাঘব করবেন।

মো: রনি ঢাকায় টাইলস মিস্ত্রির কাজ করতেন। প্রতিদিনের মত ৪ তারিখ সকালে কাজের জন্য বাসা থেকে বের হয়ে যান। দুপুরের দিকে কাজ শেষ করে খাবার খাওয়ার জন্য বের হয়ে হোটেলের দিকে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পুলিশের বন্দুক থেকে ধেয়ে আসা বুলেট রনির কোমড়ের পিছন দিয়ে ঢুকে সামনে দিয়ে বের হয়ে যায়। রনি রক্তাক্ত হয়ে সাথে সাথে রাস্তার উপর পরে যান। পাশে থাকা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছাত্ররা তাকে ধরে ভ্যানগাড়ীতে করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে যাওয়ার পথেই রনির জীবনের ইতি ঘটে যায়। তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের একজন ডাক্তার তার পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নাম্বার নিয়ে তার বাড়িতে জানান, যে আপনার ছেলের গুলি লেগে মারা গেছে। এই খবর শুনে বাবা বেহুঁশ হয়ে যান।

পরদিন ৫ তারিখ সকাল ৮ টার দিকে রনির মরদেহ এম্বুলেন্সে করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে লাশ আসার সাথে সাথে এলাকায় কান্নার রোল পরে যায়। রনির পরিবার সহ এলাকাবাসী আর্তনাদে গ্রামের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে।

হাজার হাজার মুসল্লির উপস্থিতিতে জানাযা শেষে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

শহীদের নিকটাত্মীয়ের বক্তব্য

১. বড় ভাই রাকিবের বক্তব্যঃ আমরা দুই ভাই ছিলাম। এক ভাই শহীদ হয়েছে। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে পারলে ভালো লাগতো। অনেক কষ্ট লাগে ভাইয়ের জন্য। দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাত দেন।

২. ছোট বোন সুমির অনুভূতিঃ আমার ভায়ের জন্য আমার অনেক কষ্ট লাগে। ভাই আমাদের অনেক খেয়াল রাখতো। ভাই মরে যাওয়াতে অনেক ক্ষত জমে আছে এই ক্ষত কিভাবে দুর করবো?

৩. দাদা হাশেম বলেনঃ নাতিদের থাকার জন্য জমি বিক্রি করে ঘর করে দিয়ে দিছি। নাতি যাওয়ায় এখন এই ঘরে কে থাকবে। নাতি বড় হইছে এখন কর্ম করতেছে, কামাই রুজি শুরু করছে। এখন আল্লাহ নিয়ে গেছে।

৪. মা মাইনুর বেগম বলেনঃ ছেলের কথা মনে পরলেই আমার বুক শুকিয়ে যায়, ছেলের এমন মৃত্যু হবে কল্পনা করতে পারি নাই। আমার ২ ছেলে, ছোট ছেলের বুদ্ধি একটু বেশি। আমার আর কিছু চাওয়া নেই আমার বাবাকে আল্লাহ যেন শহীদি মৃত্যু দান করে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মোঃ রনির পরিবারের সদস্য তার বাবা হারুন খান, মা মাইনুর বেগম ও দশম শ্রেণিতে অধ্যায়নরত ছোট বোন নুপুর (১৭)। ছোট বোনের পড়ালেখার খরচ সহ সংসারের যাবতীয় চাহিদা গুলো তিনি যথাসম্ভব পুরনের চেষ্টা করতেন। মোঃ রনি শহীদ হওয়ার পর সংসার পরিচালনা করার মতো বর্তমানে কেউ না থাকায় পরিবারের এই করুন অবস্থায় বাবা বৃদ্ধ হয়েও অভাবের তাড়নায় কাজে বের হয়েছেন। তার মৃত্যুর পর পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

প্রস্তাবনা

১. ছোট বোনের পড়াশোনার খরচ ও তার বিয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২. পরিবারের ভরণ পোষনের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

একনজরে শহীদ রনি

নাম	:	মোহাম্মদ রনি
জন্ম তারিখ	:	০২-০৭-২০০২
পিতা	:	মোঃ হারুন খান
মাতা	:	মাইনুর বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: দক্ষিন বালিয়া, ইউনিয়ন: দক্ষিণ দিঘলদী, থানা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
বৈবাহিক অবস্থা	:	অবিবাহিত
পেশা	:	টাইলস মিস্ত্রি
ঘটনার স্থান	:	মাটির টোলা, ঢাকা
আহত হওয়ার সময়কাল	:	০৪/০৮/২০২৪, দুপুর ২টা
শাহাদাতের সময়কাল	:	০৪/০৮/২০২৪, বিকাল ৫টা
আঘাতের ধরন	:	তলপেটে কোমরের নিচে গুলি
আক্রমণকারী	:	স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশের
শহীদের কবরের অবস্থান	:	গ্রামের বাড়িতে

শহীদ শামীম হাওলাদার

ক্রমিক : ৩৭৮

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৬

জন্ম ও পরিচিতি

শহীদ শামীম হাওলাদার ১৯৮৬ সালে ভোলা জেলার গোপ্তমুনি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল মান্নান হাওলাদার এবং মা বেউটি বেগম। তিনি তার বাবাকে হারিয়ে বাবার আদর্শকে জীবিত রাখার চেষ্টা করেন প্রতিনিয়ত। বাবার জন্য অনেক কষ্ট হয় তাই মাকে বাবার শ্রদ্ধার জায়গায় স্থান দিয়ে মাতৃস্নেহে সবসময় থাকতে পছন্দ করেন। মাও তা স্নেহের ছেলে শামীমকে অনেক বেশী ভালোবাসেন। শামীম ছোট বেলা থেকেই নম্র ভদ্র এবং একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। পেশায় তিনি একজন ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রী ছিলেন এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শহীদ শামীম তাঁর পেশাগত আয় দিয়ে পরিবারের ভাইবোনদের সকলকে আগলে রেখে বড় করেন।

তাঁর তিন ছেলে। ছেলেদের নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন ছিল তাঁর। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করবে। যেন এদেশের একজন সৎ দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হতে পারে। পরিবারের প্রতি তার যেমন আন্তরিকতা ছিলো তেমনি দেশের প্রতি তার ভালোবাসা কোন অংশে ঘাটতি ছিলোনা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা ছিলেন সোচ্চার।

শহীদ শামীমের শাহাদতের ঘটনা

দীর্ঘ ১৫ বছর স্বৈরাচার সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিলো অনেকবার। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা দিতে হয়েছিলো তাকে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়েকরা তাদের অধিকার আদায়ে যখন সোচ্চার সরকার তাদের এই আন্দোলনকে খামখেয়ালী মনে করে এবং তিরস্কার করে বলে সব কোটা কি রাজাকারেরা পাবে? তখন আন্দোলনের গতি আরো বেড়ে যায়। চতুর্দিকে ছাত্রদের উপর অমানুষিক নির্যাতন দিনের পর দিন বেড়ে যায়। শামীম হাওলাদার ভোলা থেকে কোরবানির ঈদের পর বাড়ি থেকে ঢাকায় কর্মস্থলে আসেন। তিনি ২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য মিছিলের দাওয়াত পেয়ে ২০ তারিখ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। চারিদিকে পুলিশ ও হেলমেট বাহিনী এলোমেলোভাবে ব্যাপক গুলি ছুড়তে থাকে। বেলা ১১ টায় তা তীব্র আকার ধারণ করে।

মোহাম্মাদপুর চৌরাস্তার মোড়ে পুলিশের ব্যাপক গোলাগুলি শুরু হয় তখন তিনি গুলিতে আহত হয় কিন্তু এই গুলি তাকে আন্দোলন থেকে পিছপা করতে পারেনি। বিকাল ৫টার দিকে আবার মানুষের অধিকারের আন্দোলন চলাকালে মুখোমুখী অবস্থানে পুলিশ এবং ছাত্র জনতার গোলাগুলিতে পুলিশগুলি করে শামীম হাওলাদারকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আন্দোলনকারী ভাইয়েরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে কর্মরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহীদ শামীম তার পরিবারের সবার কাছে ভালো, অমায়িক মানুষ ছিলেন। পরিবারের সবার এবং সমাজের মানুষের ভাষ্যমতে শহীদ শামীমের মনে কোন হিংসা ছিলোনা। কোন রাগ ছিলোনা। কিন্তু সে অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দিতোনা। অবশেষে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে বৈষম্যের অবসান ঘটাতে আন্দোলনে অংশ্রগহণ করে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। জান্নাত কামনায় সর্বস্তরের মানুষ শামীম হাওলাদারের জন্য দোয়া করেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

মা বিউটি বেগম: বিয়ার দুই বছর পরে আমার ছেলে হইছে। ছেলে আমারে রাইখা চলে গেছে। ছেলের কামাই খাইলাম না। আমি মরলে আমার কবর জিয়ারত করতো। কিন্তু আগেই ছেলে চলে গেলো।

সৎ বোন জরিনা: আমার ভাই, আপন ভাই থেকে বেশি ভালো বাসতো যা হইতো আমাদের এসে বলতো। এখন কে বলবে আমার ভাই কই গেল।

ভাতিজা রিপন: সে আমার এক সপ্তাহের বড়। সে আমার সাথে কখনো খারাপ আচারণ করে নাই। এখন শুধু আমার তার কথা মনে পড়ে।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

শহীদের পিতা আব্দুল মান্নান হাওলাদার তার চার মেয়ে দুই ছেলে রেখে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। এখন পরিবারে আছে শহীদ শামীম হাওলাদার তাঁর মাসহ উনার ভাই বোন ৪ জন সাথে তার স্ত্রীসহ ৩ ছেলে। মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের বোঝা নিয়ে শামীম হাওলাদার উক্ত পরিবারের হাল ধরেন। ঢাকায় ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রীর কাজ করে এতো বড় সংসার শহীদ শামীম হাওলাদার যা আয় করে তা দিয়ে কোনরকম দিনাতিপাত করছেন।

শামীম হাওলাদারকে হারিয়ে নিরুপায়, বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে তার মাসহ তার স্ত্রী। শামীম হাওলাদারের শাহাদাতের পরপরই তাদের সংসারের জীবন থেমে যায়। একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে যেন সব হারিয়েছে পরিবারটি। বর্তমানে ছোট ভাই আবদুল গণি ঔষধ কোম্পানির চাকুরি করে যা পান তা দিয়ে এখন মা সহ অন্যরা খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করেন। শহীদ শামীম হাওলাদারের পিতার মৃত্যুর পর তার মাসহ পরিবারের সদস্যরা গ্রামের যে টিনের ঘরে থাকে সেখানে কোনভাবে বসবাস করাও কঠিন।

শহিদ শামীম হাওলাদার এর বাবা ১০ বছর আগে মারা যান। পরিবারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি উনিই ছিলেন। শামীম হাওলাদার মারা যাওয়ার পর ৩টি সন্তান সহ পরিবারটির একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

প্রস্তাবনা-১: নিয়মিত মাসিক অনুদান।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Birth Registration Certificate

একনজরে শহীদ মোঃ শামীম হাওলাদার

পূর্ণ নাম	: মোঃ শামীম হাওলাদার
জন্ম তারিখ	: ৮-০১-১৯৮৬
জন্মস্থান	: গোগুমুলি, ভোলা সদর, ভোলা
পেশা	: ইলেকট্রিক মিস্ত্রি
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: গোগুমুলি, ইউনিয়ন: ইলিশা, থানা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: গোগুমুলি, ইউনিয়ন: ইলিশা, থানা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
পরিবার:	
পিতার নাম	: মৃত: আব্দুল মান্নান হাওলাদার
মাতার নাম	: বিউটি বেগম (৫৫) গৃহিণী
স্ত্রী	: গৃহিণী
৩ ছেলে	: ১. সালমান (৮) প্রথম শ্রেণি
	: ২. ইমান মাহাদি(৫) শিশু শ্রেণি
	: ৩. আলী আহমেদ (৩)
আঘাতকারী	: আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী পুলিশ
আহত হওয়ার ও স্থান সময়	: মোহাম্মদপুর চৌরাস্তা মোড়, ঢাকা ২০-০৭-২০২৪ বিকেল ৫:০০টায়
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ২০-০৭-২০২৪, বিকেল ৭টায়, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ঢাকা
জানাজা	: ২১-০৭-২০২৪ সকাল ১০টায়
কবরস্থান	: নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থান

“তোমরা শহীদদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত” -(সূরা বাকারাঃ ১৫৪)

শহীদ হাবিবুর রহমান

ক্রমিক : ৩৭৯

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৭

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ১৯৯৫ সালের ১৮ জানুয়ারি ভোলা জেলার চরফ্যাশন থানার নুরাবাদ ইউনিয়নের ফরিদাবাদ গ্রামে ফরাজি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। তার বাবা আব্দুর রব ফরাজী এবং মাতা মোসাম্মৎ ফাতেমা। বাবার বয়স ৭০ এবং পেশায় একজন কৃষক এবং মায়ের বয়স ৬০ এবং তিনি একজন গৃহিণী।

পরিবারের সার্বিক অবস্থা

দরিদ্র পরিবারের জন্ম শহীদ হাবিবুর রহমানের বাবার কৃষি কাজের উপর নির্ভর করেই চলে তাদের ছয় ভাই বোনের সংসার। একটি মাত্র টিনের ঘর ই সকলের আশ্রয়ের স্থান। ছোটবেলা থেকেই দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় হওয়া হাবিবের ভাই বোনদের। পেশায় গার্মেন্টস কর্মী হাবিবুর রহমান ছিলেন বিএনপির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাকে হারিয়ে তার স্ত্রী ৪ বছরের শিশু সন্তানকে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

দীর্ঘদিন ধরে চলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন রূপ নিয়েছিল সরকার পতনের আন্দোলনে। সে আন্দোলনের যোগ দিয়েছিল বাংলা সর্বস্তরের জনগণ। কৃষক, শ্রমিক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সমাজের উঁচু স্তরের মানুষও নেমে পড়েছিল রাস্তায়। টানা ১৬ বছরের জুলুম ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই বাঁধভাঙ্গা জনতার ঢল নেমেছিল রাজপথে। আপামর ছাত্র জনতার দীর্ঘ বিপ্লবের ফলাফল হিসেবে ৫ আগস্ট ২০২৪ পতন ঘটে জালিম সরকারের। তাই সেদিন বিজয় উল্লাসে মেতে উঠে সারা দেশের মানুষ। সেই বিজয় মিছিলে যোগ দিয়েছিল হাবিবুর রহমান। যাত্রাবাড়ী থানার সামনে যেতে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায় বিজয় মিছিলে। প্রায় তিন শতাধিক মানুষ গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। হাবিবুর রহমান ও সেই সময় গুলিবিদ্ধ হন। একটি গুলি হাবিবুর রহমান এর বুক ভেদ করে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথেই তিনি লুটিয়ে পড়েন রাস্তায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে তার চাচাতো ভাই নয়ন তাকে খুঁজতে থাকে রাস্তায় পড়ে থাকা লাশগুলোর মধ্যে। হঠাৎ চোখ পড়ে রক্তে রঞ্জিত ভাইয়ের লাশের উপর। শীঘ্রই তিনি অ্যাম্বুলেন্স এ করে তার ভাইয়ের লাশ নিয়ে গ্রামে চলে যান। সেখানেই তার জানাজা ও দাফন কার্য সম্পাদন করা হয়। হাবিবুরদের ত্যাগে দেশ স্বৈরাচার মুক্ত হলেও মুক্তির স্বাদ উপভোগ করতে পারেননি তারা। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

বাবা আব্দুর রব ফরাজি বলেন, আমার পুতে আমারে ১১ টার সময় কল দিয়ে আমারে আর তার মারে বলে আজকেও মিছিল আছে দোয়া কইরো মা। ছেলে চলে গেছে। যাওনের কথা আমার আগে। তার ভাইবোনরা আগে। সে তো আমার সংসার চালাইতো। বাকিদের সবার টান আছে, তাদের কোন তৌফিক নাই। আর আমার ছেলেকে আল্লায় নিয়ে গেছে। আল্লাহ আমার পুতেরে জান্নাত দান করুক।

মা মোসা: ফাতেমা বলেন, আমার পুতে বলতো মা আল্লাহ ভরসা এই যালিমদের দেখে নিবো। আপনারা যা লাগবো আমারে বইলেন। কখনো উপবাস থাইকেননা, কখনো কষ্ট কইরেন না।

বড় ভাই মো. আলি বলেন, আমাদের সবার ছোট ছিলো হাবিব। আমরা সবাই আছি আর ছোট ভাই শুয়ে রইছে কবরে। আমাদের খোজখবর রাখতো কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেল।

শহীদের পরিবারকে সহযোগিতার প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: ছোট ছেলেকে সহায়তা করা।

প্রস্তাবনা-২: শহীদ পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান ও নিয়মিত মাসিক অনুদান প্রদান।

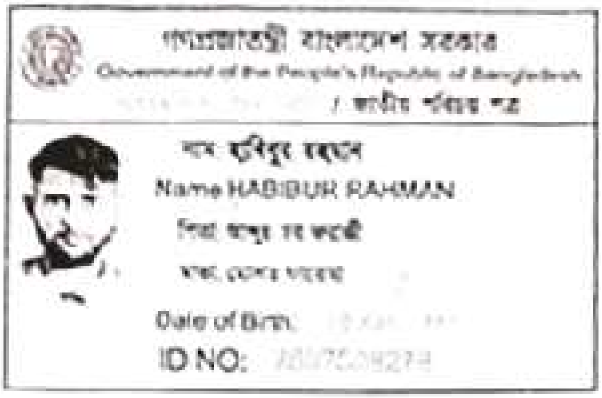

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Government of the People's Republic of Bangladesh
জাতীয় পরিচয় পত্র
নাম হাবিবুর রহমান
Name HABIBUR RAHMAN
পিতা আব্দুর রব ফরাজী
Date of Birth:
ID NO:

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

পুরো নাম	: শহীদ হাবিবুর রহমান, জন্ম: ১৮ জানুয়ারি ১৯৯৫
পিতা	: আব্দুর রব ফরাজি, বয়স : ৭০ বছর
মাতা	: মোসা: ফাতেমা, পেশা: গৃহিণী
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: ফরিদাবাদ, ইউনিয়ন: নুরাবাদ, থানা: চরফ্যাশন, জেলা: ভোলা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ১. পিতা
	: ২. মাতা
	: ৩. স্ত্রী
	: ৪. ছেলে (সালমান, বয়স: ৪ বছর)
	: ৫. দুই ভাই, ৩ বোন
আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে, ৫ আগস্ট ২০২৪
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
নিহত হওয়ার স্থান ও তারিখ	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে, ৫ আগস্ট ২০২৪
সমাধি	: নিজ গ্রামে

শহীদ মো: ফজলু

ক্রমিক : ৩৮০

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৮

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: ফজলু ১৯৯৩ সালে ভোলা শশীভূষন উপজেলার জাহানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলা থেকে নম্র, ভদ্র এবং একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। পেশায় তিনি ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি ছিলেন। তার বাবা জনাব আমিনুল হক (৬৫) বার্ধক্যজনিত কারণে কোন কর্ম করতে পারেন না। মা ছালেহা খাতুন (৫৫) গৃহিনী। এই ভঙ্গুর পরিবারে শহীদ ফজলু তাঁর পেশাগত আয় দিয়ে ভাইবোনদের সকলকে আগলে রেখে বড় করেন। ফজলুর স্ত্রী সুমাইয়া বেগম (২৩) তার ভরনপোষণ, ছোট মেয়ে ফারজানা খাতুন (০৭) তার পড়ালিখার খরচ সুন্দরভাবে চলতো কিন্তু নির্মম পরিহাস ফজলু শহীদ হওয়ার পর গোছালো পরিবার অগোছালো হয়ে গেল, কোন আয় নেই পরিবারের সবকিছু ছবির হয়ে গেল। পরিবারের প্রতি তার যেমন আন্তরিকতা ছিলো তেমনি দেশের প্রতি তার ভালোবাসা কোনঅংশে ঘাটতি ছিলো না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা ছিলেন সোচ্চার।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শুরু থেকেই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন শহীদ ফজলু দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। স্বৈরাচার শেখ হাসিনার গণহত্যা, বিভিন্ন দুর্নীতি ভোট জালিয়াতি ও অর্থপাচারের মত বড় বড় অপরাধ রাসেল গাজী এবং তার ভাইকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই তিনি নিজের পরিবারের চাইতেও আন্দোলনকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের পক্ষ থেকে যখন ৩ তারিখ রাতে ৪ তারিখ থেকে ঢাকাতে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেয় ঘটনার দিন ০৪/০৮/২০২৪ বিকাল ৪ টায় শহিদ ফজলু মিরপুর টাফ কলেজের সামনে মিছিলে অংশগ্রহন করে।

চারিদিকে পুলিশ ও হেলমেট বাহিনী এলোমেলোভাবে ব্যাপক গুলি ছুড়তে থাকে। বেলা ৪ টায় তা তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্র জনতা খালি হাতে আন্দোলন করে অন্যদিকে পুলিশলীগ এবং ছাত্রলীগ মিলে ছাত্র-জনতার উপর দেশীয় অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে মুহুর্মুহু হামলা চালায়। তখন বিকেল ৪টার দিকে পুলিশ কর্তৃক গুলি এসে ফজলুর পেটে লেগে যায় এবং পেট দিয়ে ঢুকে পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে শহীদ ফজলু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন তাকে ছাত্র-জনতা মেডিকেলে নিয়ে যায় এবং রাত ৮ টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসকগণ তাকে মৃত বলে ঘোষনা দেন।

শহীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

শহীদের পিতা বৃদ্ধ আমিনুল হক (৬৫) ৮ সন্তানসহ দশ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার নিয়ে জীবনের শেষ সময় পার করেছেন। বার্ধক্য জনিত কারনে আমিনুল হক সাহেব কিছুই করতে পারেন না কিন্তু এতো বড় সংসার পরিচালনায় একমাত্র উপার্জকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন শহীদ মো: ফজলু।

গার্মেন্টসে কাজ করে ফজলু সামান্য উপার্জন দিয়ে ঢাকায় তার পরিবার নিয়ে সুন্দর জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তার পিতা মাতাকে গ্রামের বাড়ীতে সংসার খরচ দিতেন। যা আজ পরিবারের কাছে স্মৃতিতে অম্লান।

শহীদ ফজলুকে হারিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে তার বৃদ্ধ বাবা মা. বাবা বারবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ফজলুর শাহাদাতের পরপরই তাদের সংসারের জীবন থেমে যায়, তার বৃদ্ধ বাবা মা হয়ে যায় বাকরুদ্ধ। একমাত্র উপার্জনক্ষম সন্তানকে হারিয়ে যেন সব হারিয়েছে পরিবারটি।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়র অনুভূতি

আমিও যখন আন্দোলনে আসি তখন আমার কাছে ফোন আসে আপনার ভাই ফজলু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। আমি সাথে সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই এবং আমার ভাই ফজলুকে হসপিটালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে চিকিৎসরত অবস্থায় দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়।

মো: সবুজ (শহীদের ভাই) আমার জানা মতে তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি দেশদ্রোহী কাজে লিপ্ত ছিলেন না। (জিহাদুল ইসলাম প্রতিবেশি)

পরিবার সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য

শহীদ ফজলুর বৃদ্ধ পিতা মাতা যে ঘরে থাকে সেখানে কোনভাবে বসবাস করাও কঠিন। জীর্ণ শীর্ণ বাড়ীতে পরিবারের সবাই একসাথে বসবাস করছে। শীর্ণ শহীদ ফজলু একমাত্র পরিবারে উপার্জনকারী ছিলেন। একমাত্র মেয়ের পড়াশুনা করার জন্যও কোন আয় উপায় নেই।

একনজরে শহীদ মোঃ ফজলু

শহীদের পূর্ণ নাম	: মোঃ ফজলু
জন্ম তারিখ	: ২০-০১-১৯৯৩
জন্মস্থান	: ৮ নং জাহানপুর, শশীভূষণ, ভোলা
পেশা	: গার্মেন্টস কর্মী
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: ২৪/৫ উত্তর ইব্রাহিমপুর, কাফরুল ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: ৮ নং জাহানপুর, চরফ্যাশন ভোলা
পরিবার:	
পিতার নাম	: আমিনুল হক(৬৫) কৃষক
মাতার নাম	: ছালেহা খাতুন (৬০) গৃহিণী
ভাই বোন	: ৮ জন
বৈবাহিক অবস্থা	: বিবাহিত
শহীদের মেয়ে	: কামরুনা খাতুন (৭) ১ম শ্রেণি
আঘাতকারীর	: পুলিশ
আহত হওয়ার ও সময়	: পুলিশ কলেজের সামনে, মিরপুর ১৪ , ঢাকা ০৪-০৮-২০২৪ বিকেল ৪:০
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ৪-০৮-২০২৪ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রাত ৪টা
কবরস্থান	: জাহানপুর শশীভূষন, ভোলা

প্রস্তাবনা:

১.নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহায়তা
২. ব্যবসায়িক কাজে মূলধন সহায়তা
৩. বাড়ি করে দেওয়া

শহীদ মো: শিহাব উদ্দিন

ক্রমিক: ৩৮১

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৬৯

শহীদ পরিচিতি

১৯৮৮ সালের ৪ জানুয়ারি ভোলার লালমোহন উপজেলায় জন্মগ্রহণ করে শহীদ শিহাব উদ্দিন। পিতা ইব্রাহিম খলিল (৬৬) এবং মাতা ইয়ানুর বেগমের ১ম সন্তান শহীদ শিহাব উদ্দিন। এছাড়াও তাদের সংসারে আছে আরো দুই ছেলে লিটন আর আবুল বাশার। শহীদ শিহাব উদ্দিন পেশায় একজন শিক্ষক। শিক্ষকতা করতেন কওমি মাদ্রাসায়। তার বাকি দুই ভাই কৃষিকাজ করেন।

শহীদের পিতা ইব্রাহিম খলিল তিনি ছিলেন একজন কৃষক। কৃষিকাজ করে ৪ সদস্য বিশিষ্ট পরিবার নিয়ে তিনি কোনরকম জীবন যাপন করতেন। এরই মাঝে এক ভাই প্রতিবন্ধি। আশার দিক ছিলো পুরো পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন শহীদ শিহাব উদ্দীন।

যেমন ছিলো শহীদ শিহাব উদ্দিনের জীবন

শিহাব উদ্দিন ছোট বেলা থেকেই নম্র, ভদ্র এবং একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। তিনি হাটহাজারী দারুল উলুম মাদরাসা থেকে ইফতা বিভাগ পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। তার পিতা ইব্রাহিম খলির একজন কৃষক ছিলেন মা ইয়ানুর বেগম মারা যায় অনেক আগেই। পেশাগতভাবে শহীদ শিহাব শিক্ষক ছিলেন এবং বেফাক বোর্ডে চাকুরী করতেন। শহীদ শিহাব তাঁর পেশাগত আয় দিয়ে পরিবারের ভাইবোনদের সকলকে আগলে রেখে বড় করেন। পরিবারের প্রতি তার যেমন আন্তরিকতা ছিলো তেমনি দেশপ্রেম তাকে অন্যায়ের সাথে মাথানত করতে দেয়নি।

শাহাদাতের ঘটনা

কোটা সংস্কারের উদ্দেশ্যে শুরু হওয়া ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলন জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে রূপ নিতে থাকে সহিংসতায়। চারিদিকে আনদোলনকারীদের উপর আসতে থাকে নৃশংস আক্রমণ। সরকারের পোষ্য ছাত্রলীগ নামের গুণ্ডাবাহিনী দেশের নানা প্রান্তে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী জনতার উপর অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরে। এই গুণ্ডাবাহিনীকে সর্বাত্মক নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছিলো দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। যেখানেই ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলনে নেমেছে সেখানেই এই সন্ত্রাসীরা রণক্ষেত্রে পরিণত করছিলো। যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া এলাকা এসময়ে ভয়াবহ রূপ নেয়। দিন যত যাচ্ছিলো এখানে আন্দোলনকারীদের নিহত হওয়ার সংখ্যাটা ততই বাড়ছিলো। আর গুরুতর আহত হওয়ার সংখ্যাটার কোনো হিসাব ছিলো না।

১৯ জুলাই ২০২৪ বৃহস্পতিবার 'কমপ্লিট শাটডাউন' চলাবস্থায় শহীদ শিহাব বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সারা ঢাকা জুড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে সবাই আন্দোলনে বের হয়। একদিকে ছাত্র জনতার সাথে কওমী ছাত্ররা অন্যদিকে পুলিশ, বিজিবি, ছাত্রলীগের সাথে পুলিশের গোলাগুলি আরো বেড়ে যায়।

চারিদিকে পুলিশ ও হেলমেট বাহিনী এলোমেলোভাবে ব্যাপক গুলি ছুড়তে থাকে। বেলা ১১ টায় তা তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্রদের সাথে শহীদ শিহাবও আন্দোলনে যোগ দেয় এবং মাদরাসার ছাঁদে অবস্থান করে। হঠাৎ পুলিশের গুলি শিহাবের মাথায় বিদ্ধ হয়। সাথে সাথে শিক্ষক শিহাব উদ্দিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

শহীদ শিহাব তার পরিবারের সবার কাছে ভালো, অমায়িক মানুষ ছিলেন। পরিবারের সবার এবং সমাজের মানুষের ভাষ্যমতে শহীদ শিহাবের মনে কোন হিংসা ছিলোনা। কোন রাগ ছিলোনা। কিন্তু সে অন্যায়কে কখনো প্রশ্রয় দিতোনা। অবশেষে দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে বৈষম্যের অবসান ঘটাতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে।

শহীদ সম্পর্কে নিকটজনদের কথা

শিহাব একজন মেধাবি ছাত্র ছিল। নম্র ও ভদ্র। তাকে তার ১ম স্ত্রী তালাক দিয়ে চলে গেছে। সে একজন আলেম ও দ্বীনি দায়িত্বশীল। -মোঃ মোজাম্মেল (চাচাতো ভাই)

সে দিন পুলিশের গুলিতে আমার ছেলে শহীদ হইছে শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। এরপর রাত ১ টার দিকে আমার ছেলের লাশ নিয়ে আমার বাড়ীতে এসেছে। ছেলেকে হারিয়ে এখনও আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আমরা নিরুপায়। আল্লাহর কাছে এর বিচার চাই। -বাবা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ (৬৬)

আমার ভাই একজন ভালো মানুষ ছিলো। মৃত্যুর খবর শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে যাই। প্রতি মাসে ভাই আমার জন্য ২/৩ হাজার করে টাকা দিত। এখন আমরা আমাদের একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে নিরুপায়। -ছোট ভাই মোঃ লিটন (২২)

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

একদিকে শহীদ শিহাবের শিক্ষকতার সামান্য উপার্জন অন্যদিকে পরিবারে প্রতিবন্ধি ভাইসহ অন্যান্য সদস্যদের ভালোভাবে তিনবেলা খাবার যোগান দিতে কষ্টকর হয়ে যেত। মাস শেষে সবাই শহীদ শিহাবের দিকে তাকিয়ে থাকতো কখন টাকা পাঠাবে, ঘরের বাজার করবে এই নিয়ে অপেক্ষায় থাকতো। এইভাবে একটি নিঃস্ব পরিবারে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ হয়ে যায়। শহীদ শিহাব(৩৮) এই বয়সে ভঙ্গুর পরিবারের হাল ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। যা আজ পরিবারের কাছে স্মৃতিতে অম্লান।

সহযোগিতা প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: নির্মানাধীন ঘরের বাকি কাজ করার প্রয়োজন।

প্রস্তাবনা-২: অটো গাড়ি বা দোকান ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হয়।

প্রস্তাবনা-৩: কিছু জমি কিনে দিলে নিয়মিত আয় হবে।

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ

নাম	: শিহাব উদ্দিন
পেশা	: শিক্ষক
জন্ম তারিখ	: ৪ জানুয়ারি, ১৯৮৮
স্থায়ী ঠিকানা	: থানা/উপজেলা: লালমোহন জেলা: ভোলা
পিতা	: ইবরাহীম খলিল
মাতা	: ইয়ানুর বেগম
ভাইবোনের বিবরণ	: ৩ জন
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
শাহাদাতের দিনক্ষণ	: ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার, বেলা ১১ টা
শাহাদাত বরণের স্থান	: যাত্রাবাড়ী
দাফন করা হয়	: নিজ বাড়ি

শহীদ মোঃ রাকিব

ক্রমিক : ৩৮২

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭০

শহীদ পরিচিতি

মোঃ রাকিব নব্য স্বাধীন দেশের বীর সৈনিক ছিলেন। তিনি ২ মার্চ ১৯৯৮ সালে পিতা আবুল হোসেন মোল্লা ও মাতা কোহিনুর বেগমের কোল আলোকিত করে জন্ম নেন। তার বাড়ি ভোলার চরফ্যাশন থানার পূর্ব চর মাদ্রাজ গ্রামে। মো: রাকিবের জন্মতে বাবা আবুল হাশেম মোল্লা ও মাতা কহিনুর বেগমের সংসারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মাতা কোহিনুর বেগম ছেলেকে তিলে তিলে জীবনের সকল কষ্টকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে সন্তানকে বড় করেন। পরিবার অসচ্ছল থাকায় লেখাপড়ায় তিনি বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি। এলাকার সর্বস্তরের মানুষের কাছে মো: রাকিব অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, সদা হাস্যোজ্জ্বল ও পরোপকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের বাবা-মা ভাইসহ পরিবারে চারজন সদস্য ছিল। সমাজে বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি সদা সোচ্চার ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সরকারের ফ্যাসিস্ট পুলিশ বাহিনী ও কুখ্যাত সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের হাতে তাকে জীবন দিতে হলো। তিনি ছিলেন বাবার আদর্শ ও সমাজের সর্বস্তরে মানুষের ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে জনগণ নানান অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন ও জুলুমের নির্মম ভুক্তভোগী। এদেশের মুক্তিকামী জনতা সময়ের দাবিতে সাড়া দিয়ে এহেন অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারংবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই সাথে হুংকার দিয়ে সংগ্রামী জনতার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ছাত্রবৃন্দ। উপরন্তু গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষী, দেশের ক্রান্তিকালে বরাবরই ছাত্রদের মাধ্যমে আন্দোলন সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে।

দীর্ঘ ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন, ভোটচুরি, দুর্নীতিন, খুন, অন্যায়, অত্যাচার জনমনে ফেলেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। কোটা প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করে আওয়ামী সরকার। ২০১৮ সালে ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা সকল দাবী মেনে নিলেও তার অন্তরে ছিল হিংসার অগ্নিগিরি। তাই ২০২৪ সালে একটি বিরোধী দলহীন নির্বাচনে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর আবার কোটা ফিরিয়ে আনতে চাইল হাসিনা সরকার। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই থেকে। অহিংস এই আন্দোলন ১৫ জুলাই থেকে সহিংস হয় । আন্দলোনে নিরস্ত্র ছাত্র জনতার ওপর সশস্ত্র ঘাতক ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও পুলিশ, জঙ্গই সদস্যরা হামলা চালাতে থাকে। রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের শাহাদাতের পর থেকেই আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে পরিণত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমেই জনসাধারণের আন্দোলনে রূপ নেয়। এটি বৈষম্যবিরধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন হিসেবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুরুতে সাধারণ ছাত্রদের অহিংস আন্দোলন ধীরে ধীরে ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী অভ্যুত্থানের দিকে ধাবিত হতে থাকে। পর্যায়ক্রমে এ আন্দোলন শুধু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; হয়ে উঠে দেশের আপামর জনতার এক বিশাল গণঅভ্যুত্থান। জাতি,ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এ অভ্যুত্থানে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজপথে বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ জনতার তোপের মুখে স্বৈরাচার সরকারের প্রধান শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পদত্যাগের পূর্বে তিনি রেখে যান তার ঘৃণ্য ও বিকৃত মস্তিষ্কের অজস্র কুকীর্তি। এরই অংশ হিসেবে আন্দোলনকারী সহ অনেক নিরীহ জনতার উপর লেলিয়ে দেয়া হয় সশস্ত্র বাহিনী। তাদের গুলিতে শহীদ হয় নিরস্ত্র নিপীড়িত জনতা।

শহীদ সংক্রান্ত ঘটনার বর্ণনা

ছাত্রলীগ দেশব্যাপী কুখ্যাত ও এক সন্ত্রাসী বাহিনীর নাম। ভিন্নমতের ছাত্রদের দমন পীড়ন, নির্যাতন দিনদুপুরে মানুষ মেরে খুন করার নজির রয়েছে। কোন ছাত্র সংগঠন এত ভয়ংকর, নিষ্ঠুর, নির্দয় ও নির্মম হতে পারে তা কারো জানা নেই। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মো: রাকিব ছিলেন একজন জীবন বাজি রাখা সৈনিক। ৫ আগস্ট ছিল তার জন্য অভিশপ্ত দিন। এ দিনে দুপুরের খাবার খেয়ে তিনি অন্যান্য ছাত্রদের সংঘটিত করে আন্দোলনের যোগদান করেন। শহর মিছিলের জনপদে পরিণত হয়। তিনি সামনের সারি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া সে দিনটি ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ঢাকা চলো কর্মসূচি। কর্মসূচির ডাকে সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই ছাত্র জনতার সাথে তিনি ও তার ছোট ভাই যুক্ত হন। ৫ তারিখ দুইটার মধ্যে হাসিনা সরকার পদত্যাগ করলে ছাত্র-জনতা বিজয় মিছিল শুরু করে। পুলিশ সেই মিছিলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিতে মো: রাকিবের বুক ঝাঁজরা হয়ে যায়। ছোট ভাই বেঁচে গেলেও বড় ভাই রাকিব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যাত্রাবাড়ী থানার সামনেই চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ হওয়ার স্বপ্ন ও তার আত্মত্যাগ এলাকার সকল স্তরের মানুষের কাছে স্মরণীয় করেছে। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাকে শহীদী মর্যাদা দান করুন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

মো: রাকিব ছোটবেলা থেকেই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ছিলেন। প্রতিবেশীরা জানান, সে এলাকার জন্য গর্ব করার মত ছেলে ছিল। ভদ্র, নম্র, বিনয়ী ও বাবা-মায়ের বাধ্যগত নেক সন্তান ছিলেন। সে সর্বদা গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। অন্য একজন প্রতিবেশী বলেন, আমার চোখে এমন ভদ্র ছেলে আর কাউকে দেখি নাই। কারো সাথে বেয়াদবী করেছে এটা আমার জানা নেই। সামাজিক ও সাংস্কৃতি সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। সবাইকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তার একমাত্র ছোট ভাই বলেন, আমার ভাই সহজ সরল ও সুন্দর মনের অধিকারী ছিলেন। শহীদ সম্পর্কে মা কোহিনুর বেগম বলেন, বছর খানেক আগে বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর থেকে পরিবারের সম্পূর্ণ হাল ধরেন আমার ছেলে মো: রাকিব। কিন্তু রাকিবের মৃত্যুতে আমার পরিবারে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা

মোঃ রাকিবের পরিবার ছিল আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও মধ্যবিত্ত। বাবা আবুল হোসেন মোল্লা যা উপার্জন করতেন তা মো: রাকিব ও তার একমাত্র ছোট ভাইয়ের পিছনে খরচ হয়ে যেত। সংসারে ছেলে একদিন দায়িত্ব নিবে এই প্রত্যাশা নিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। ইতোমধ্যে বাবা মারা যান। পরিবারের পুরো দায়িত্ব চলে আসে মো: রাকিবের উপর। তিনি প্রাণ কোম্পানিতে চাকুরীও নিয়েছিলেন। মা জননী ও ছোট ভাইকে নিয়ে ভালোই চলছিল। মা বলেন, হৃদয়ের ধন এভাবে চলে যাবে তিনি কোনদিন ভাবতেও পারেননি। মো: রাকিবের পরিবারটা একেবারে অসহায় হয়ে গেল। বর্তমানে পরিবারের উপার্জনের আর কেউ রইল না। অসহায় মা তার ছোট সন্তানকে নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

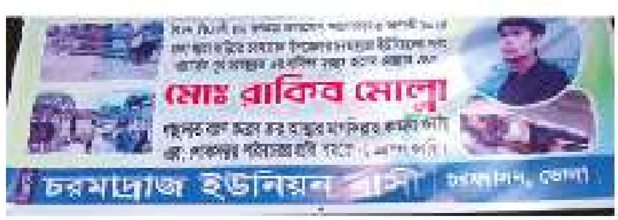

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
জন্ম সনদ

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: বাকিব
জন্ম	: ০২/০৩/১৯৯৮
পিতা	: আবুল হাশেম মোল্লা
মাতা	: কহিনুর বেগম
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: পূর্ব চর মাদ্রাজ, ইউনিয়ন: চর মাদ্রাজ, থানা: চর ফ্যাশন, জেলা: ভোলা
পেশা	: প্রাণ কোম্পানিতে তিনি চাকুরী করতেন
ঘটনার স্থান	: যাত্রাবাড়ী থানার সামনে
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪ বিকাল ৩টা
শাহাদাতে সময়কাল	: ০৫/০৮/২০২৪ বিকাল ৩টা
আঘাতের ধরণ	: শরীরে গুলি লাগে
আক্রমণকারী	: স্বৈরাচারী হাসিনার ঘাতক পুলিশ
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পূর্ব মাদ্রাজ পারিবারিক কবরস্থান

প্রস্তাবনা:

১. ছোট ভাইয়ের পড়ালেখার খরচ যোগানে সহযোগীতা করা যেতে পারে

২. এককালীন অর্থ দেওয়া যেতে পারে

“কুরআন যে ধারণ করে তাঁর নিজ অন্তরে,
সে ফিরবেই বারেবারে শহীদি কোন প্রান্তরে”

শহীদ ওমর ফারুক

ক্রমিক : ৩৮৩
আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ওমর ফারুক ভোলা জেলার লালমোহন থানার অন্তর্ভুক্ত চরভূতা ইউনিয়নের হরিগঞ্জ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২০০৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বাবা-মায়ের চার সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তাঁর পিতা মো: ফয়েজুল্লাহ ও মাতা হামিদা বেগম। ছোটবেলাতেই স্থানীয় এক মক্তবে হাতেখড়ি তার। প্রবল মেধাবী ওমর ফারুক অল্প দিনেই শেষ করলো, কুরআনের প্রায় ২০ পারা হিফজ।

শৈশব ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য:
দ্বীপাঞ্চল ভোলার ছবির মতো সুন্দর গ্রাম হরিগঞ্জে কেটেছে তাঁর শৈশব। ছোট থেকেই নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন তিনি। আর তাই বড়দের স্নেহ ও ছোটদের ভালোবাসার পাত্র ছিলেন তিনি। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হয়েও শহীদ ওমর ফারুক ছিল নির্লোভ, কষ্টসহিষ্ণু। বড় ভাই আল-ইমরান ও আরেক সহোদর বোন হাফসার সাথে কেটেছে তাঁর শৈশব।

তাঁর আচরণে পাড়া-প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজন ও সহকর্মীরা খুবই সন্তুষ্ট ছিল। বাবার আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বাবাকে সহযোগিতা আর বড় ভাইয়ের এবং ছোট বোনের পড়াশোনার খরচ মেটাতে সে নিজেই পরিবারের হাল ধরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কালক্ষেপণ করেনি। তাই, একটি কয়েল ফ্যাক্টরীতে নিজে দিনমজুর হিসেবে কাজ করে সহযোগিতা করতে থাকেন তার বাবা ও পরিবারটিকে। পরোপকারী মানুষ হিসেবে এলাকাতেও তার সুনাম পাওয়া যায় মানুষের মুখে মুখে।

শহীদের পারিবারিক অবস্থা
শহীদ ওমর ফারুকের বাবা একজন নিরাপত্তা প্রহরী। আর শহীদ নিজে একটি কয়েল ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে চাকুরি করতেন। ওমর ফারুকের এক ভাই ও দুই বোন আছে। বাবা-মা বেঁচে আছেন। গ্রামে বসতভিটার ১৫ শতাংশ জমিটুকুই তাদের একমাত্র সম্বল। এছাড়া তাদের আর কোন জমিজমা নেই। ঢাকার রায়েরবাগ টিনের ভাড়া বাসায় থাকতেন তারা। তার বোন হাফসা বেগম (২০) এর অল্প বয়সে বিয়ে হলেও আবার বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। বড় ভাই আল ইমরান (২৫) (শিক্ষার্থী, ফাজিল ৩য় বর্ষ) এবং ছোট বোন আফসানা (১৩) (শিক্ষার্থী, ৮ম শ্রেণি)। দুজনেই ভোলা জেলার লালমোহন ইসলামীয়া কামিল মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত। এই পুরো পরিবারটি চলতো শহীদের কয়েল ফ্যাক্টরিতে শ্রম দেওয়া অর্থ এবং তার বাবার নিরাপত্তা প্রহরীর কাজ করে প্রাপ্ত অল্প কিছু অর্থ দিয়েই।

ওমর ফারুক থেকে শহীদ ওমর ফারুক হয়ে ওঠার গল্প:
দেশের সর্বত্রই তখন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন আর স্বৈরাচারের লেলিয়ে দেওয়া বাহিনী গুলোর প্রতিরোধ। রাজধানী ঢাকার অন্যতম প্রবেশপথ যাত্রাবাড়ী এলাকা ছিল এই আন্দোলনের প্রথম থেকেই 'রেডজোন' এরিয়া। ক্রমাগত 'বাংলা ব্লকেড', 'কমপ্লিট শাটডাউন' বিভিন্ন নামে আন্দোলনের গতি দিনদিন বাড়তে থাকে। স্বৈরাচার সরকারের প্রশাসন ও দলীয় ক্যাডার কর্তৃক প্রতিনিয়তই ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ধরপাকড়, গুলিবর্ষণ, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা ইত্যাদি তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ১৯ জুলাই ২০২৪ ইংরেজি, রোজ-শুক্রবার চলছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের ডাকে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচী। অপরদিকে অবৈধ খুনি সরকার কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের কারফিউ জারি করা হয়েছে। কিন্তু, সারাদেশে ছাত্র-জনতা কারফিউ উপেক্ষা করে রাস্তায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যা অবৈধ সরকারের প্রশাসন কোনভাবেই দমাতে পারছিল না। সেদিন যাত্রাবাড়ী এলাকার দনিয়া কলেজের সামনে সারাদিন আন্দোলনের সাথে রাজপথে ছিল শহীদ ওমর ফারুক। পুলিশ হামলা, টিয়ারগ্যাস আর গুলি উপেক্ষা করেও মাঠে টিকে ছিলেন তিনি। পাশাপাশি অন্দোলনে অংশ নেওয়া অন্য সবাইকেও বারবার সতর্ক করছিলেন তিনি। ছাত্র-জনতার প্রবল প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে, সন্ধ্যা নামার সাথে বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্বশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ছাত্র-জনতার উপর অতর্কিত গুলিবর্ষণ শুরু করে। অন্যদিকে পুলিশও তখন বেশ মারমুখী। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা নিখুঁত নিশানার মাধ্যমে গুলি করছিল কয়েক মিটার সামনে থাকা নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর। তবুও দমানো গেল না, ছাত্র-জনতার দ্রোহ। গুলিবিদ্ধ আর আহতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেও অন্য সবাই থেকে যাচ্ছিলো রাজপথেই। এমনই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন মুহূর্তে কয়েকটি বুলেট এসে শহীদ ওমর ফারুকের বুক ঝাঁজরা করে দিলো। পরবর্তীতে স্থানীয় লোকজন শহীদ ওমর ফারুককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে রাজধানীর মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নিয়ে যান। ফুসফুস বুলেটে আক্রান্ত হওয়ায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ২ আগস্ট ২০২৪ রাত্রী ৩টা বেজে মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন।

শহীদ সম্পর্কে সহোদর ভাইয়ের স্মৃতিচারণ
শহীদ বড় ভাই আল ইমরানের ভাষ্যমতে, "শহীদ ওমর ফারুকের পড়াশোনায় এগোতে পারেনি খুব বেশি তবে, ন্যায়-অন্যায় কে বিবেচনা করার ব্যাপারে যথেষ্ট সোচ্চার ও স্বক্রীয় ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করত সবসময়। ছোটবেলায় তাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হলে ২০ পারা কুরআনের হেফজ সম্পন্ন করে। তেমনি এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর ১৬ জুলাই স্বৈরাচার সরকারের একপ্রকার দমনপীড়ন অবস্থা দেখে নিজেই রাজপথে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক পরদিন থেকেই পুরোপুরি সক্রিয় থেকে প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শহীদ ওমর ফারুক। সে নিয়মতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তো। একজন ধর্মপ্রাণ, সহজ সরল, পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল শহীদ ওমর ফারুক। স্থানীয় আলেম-ওলামায়ে কেরামের সাথেও তার সুসম্পর্ক ছিল।"

Government of the People's Republic of Bangladesh

Death Registration Certificate

একনজরে শহীদ ওমর ফারুক

শহীদের পূর্ণনাম : ওমর ফারুক
জন্ম তারিখ : ৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৭
পেশা বা পদবী : কয়েল ফ্যাক্টরির শ্রমিক
পিতার নাম : মোঃ ফয়জুল্লাহ
পিতার পেশা ও বয়স : সিকিউরিটি গার্ড, ৬০ বছর
মাতার নাম : হামিদা বেগম
মাতার পেশা ও বয়স : গৃহিনী, ৩৭ বছর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৫ জন
পরিবারের মাসিক আয় : ১৫০০০

ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য :
স্থায়ী ঠিকানা : হরিগঞ্জ, ইউনিয়ন: চড়ভুতা, উপজেলা: লালমোহন, জেলা: ভোলা
বর্তমান ঠিকানা : বাসা/মহল্লা: রায়েরবাগ দোতলা মসজিদ, থানা: যাত্রাবাড়ী, জেলা: ঢাকা

পরিবারটির সহযোগিতা প্রসঙ্গে

প্রস্তাবনা-১: পরিবারটির আর্থিক সহযোগিতা জারি রাখার স্বার্থে শহীদের বড় ভাইয়ের একটি চাকুরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে

প্রস্তাবনা-২: শহীদের গ্রামের বাড়িতে একটি রাস্তা তৈরী করা দরকার। সরকার নির্ধারিত খাস জমি বরাদ্দ আছে

প্রস্তাবনা-৩: নিয়মিত মাসিক আর্থিক সহায়তা করা যেতে পারে

শহীদ মো: জসিম

ক্রমিক : ৩৮৪

আইডি : বরিশাল বিভাগ ০৭২

ভূমিকা

গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ভোলায় ইসলাম প্রিয় ও আল্লাহ ভীরু শহীদ মো: জসিম। আর্থিক অবস্থার দু-টানার মধ্যে পিতৃহীন জসিম ছাতা তৈরির কাজ করে অসুস্থ মা ও তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে কোনমতে জীবিকা নির্বাহ করে সংসার চালিয়েছিলেন। বাবার স্বপ্ন ছিল অল্প আয়ের মধ্যে দিয়ে হলেও সন্তানের ভবিষ্যত নিশ্চিত করা। অসহায় শহীদ জসিম নৈতিক ভাবে ছিল খুবই উঁচু মানের লোক। তাই ছাতা কারিগর হয়েও সন্তানাদির ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা ছিল তার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস দেশব্যাপী কোটা আন্দোলনের জোয়ার দেখে একজন দিনমজুর যখন স্বপ্ন বুনতে থাকে তখনই দীর্ঘ দেড়যুগ ধরে স্বৈরাচার সরকারের পেটুয়া বাহিনী কর্তৃক ছোঁড়া গুলিতে প্রাণ হারিয়ে এই ধরার মায়া ছেড়ে চলে যান শহীদ মো জসিম। কতোই না বেদনাদায়ক ও নির্মম গণহত্যা ছিল ৪ আগস্ট ২০২৪ তার বিবরণ অনুমেয়। শহীদ মো: জসিমের ঘর কান্নার শব্দে কাঁপছে এখন। ঘরে ১৫ বছরের শিশু সিয়াম ছাড়া উপার্জন করে সংসারের হাল ধরার আর কোন উপায় দৃশ্যমান না। তাই ছোট্ট শিশু সিয়াম পড়াশোনা বাদ দিয়ে বাবার পথে হাঁটছে।

শহীদ পরিচিত

দিনমজুর শহীদ মো: জসিম ১৪ অক্টোবর ১৯৮০ সালে ভোলায় এক হত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে খুব বেশি উপকৃত না হলেও ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিক অবস্থান মজবুতের সাথে এতিম জসিমের সংসার চলছিল। প্রতিদিনের মতো জসিম সাহেব ছাতা মেরামতের কাজ করতে দোকানে যান। সেই দিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ঠিক দুপুর ২টার সময় হঠাৎ করে ঘাতক পুলিশ মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে গড়ে ওঠে সরকার পতনের তীব্র আন্দোলন।

আহত হওয়ার ঘটনা

৪ আগস্ট ২০২৪ দুপুর ২. ০০ টায় মো. জসিম নিজ কর্মস্থল ছাতা মেরামতের দোকানের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে নবীনপুর ৩ নং ওয়ার্ড মোড়ে যান। একটি রিকশাতে করে গিয়ে মার্কেটের সামনে পৌঁছানোর পর রিকশা থেকে নেমে মার্কেটের ভিতরে ঢুকবেন এমন সময় কোনো রকম ঘোষণা, মাইকিং বা সংকেত ছাড়াই স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের সন্ত্রাসী বিজিবি বাহিনী মানুষকে ভীত করার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনতাকে লক্ষ্য করে অনবরত গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে আসে মার্কেটের সামনে। এখানে এসে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে স্বৈরাচারের পদলেহনকারী বিজিবি বাহিনী। এগুলোর মধ্যে হঠাৎ একটি গুলি জনাব মোঃ জসিমের পিঠ দিয়ে ঢুকে পেট দিয়ে বের হয়ে যায়। সাথে সাথে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই এসব ঘটে যায়। জসিমের শরীরে গুলি লাগলে পেট ছিদ্র হয়ে ভূঁড়ি বের হয়ে আসে। তিনি পেটে হাত দিয়ে মাটিতে পড়ে যান।

শহীদ জসিমকে উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা

ঘটনাস্থলে উপস্থিত জনতা প্রথমবার চেষ্টা করেও তাঁকে ঘাতক পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশ তখন অনবরত গুলি ছুঁড়ছিল। সেখানে আরো অনেকে শাহাদাত বরণ করেন। শহীদ জসিমের পরিচিত একজন তার বাড়ীতে খবর জানান। খবর পেয়ে শহীদের ছেলে আর ভাতিজা বাড়ি থেকে ছুটে চলেন সংগঠিত ঘটনাস্থলে দিকে। তারা গ্রামের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে মার্কেটে যাবার সময় সেই রাস্তায়ও বিভিন্ন জায়গায় বেশ কয়েকটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে। ফলে মূহুর্তের মধ্যে এখানে কি হয়ে গেছে তা তারা অনুমান করতে পেরেছিল। স্বৈরাচার পুলিশ সাধারণ একটা গ্রামের ছোট রাস্তায় ঢুকেও মানুষ হত্যা করতে কুন্ঠাবোধ করেনি। একটার পর একটা লাশ পার হয়ে সম্মুখে এগিয়ে যায়। শহীদের ছেলে সিয়াম ও চাচাতো ভাই। একটা সময় তারা পৌঁছে যায় মার্কেটের সামনে। একটু দূর থেকেই দেখতে পায় শহীদ মো: জসিম মাটিতে পড়ে আছেন। আর মাত্র কয়েক কদম গেলেই পৌঁছে যাবে তাঁর কাছে। এমন সময় আবার রক্ত পিপাসু পুলিশের গুলি। একটু দূরেই যে পেটুয়া বাহিনী পুলিশের গাড়ি ছিলো তারা তা লক্ষ্য করেনি। সাথে সাথে তারা পিছনের দিকে সরে যায়। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলিতে কোনোভাবেই আর সামনে আগানো যাচ্ছে না। দুই চাচাতো ভাই বুদ্ধি করে আরও একটু পিছনে গিয়ে রাস্তা থেকে বিলের মধ্যে নেমে যায়। তারপর ফসলের ক্ষেত পেরিয়ে বনের ভিতর দিয়ে গিয়ে বাজারের পিছন দিক দিয়ে ঢুকে। তারপর পুলিশের গুলির শব্দ কিছুটা কমে আসলে তারা দৌড়ে যায় শহীদ মো: জসিমের দিকে। দুই ভাই মিলে শহীদকে রাস্তা থেকে তুলতে যাবে এমন সময় তাদের পিছন দিক থেকে কয়েকজন পুলিশ চিৎকার করে উঠে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তাদের দুজনকে। একজন রেগে গিয়ে কিছু একটা ছুঁড়ে মারে তাদের দিকে। আরএকজন পুলিশ সদস্য তাদেরকেও গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গুলি করার প্রস্তুতি নিতে গেলে অন্য একজন পুলিশ সদস্য তাকে বাঁধা দেয়। আর দুই চাচাতো ভাইকে ইশারা করে তাড়াতাড়ি লাশ নিয়ে চলে যেতে। শহীদের লাশের পাশে নিজেরাই যখন মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল ঠিক তখন পুলিশের মধ্য থেকেই একজন সদস্যের এমন সংকেত পেয়ে যেন তাদের সাহস বেড়ে গেলো। কাল বিলম্ব না করে দুইজন মিলে শহীদ জসিমকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে প্রস্থান করে।

উদ্ধার ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া

শহীদ মো জসিমের ছেলে সিয়াম আর ভাতিজা তাঁকে মার্কেটের ভিতরের দিকে নিয়ে আসে। তারপর তারা কয়েকটি এম্বুলেন্সকে কল করে। কিন্তু এখানকার উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা শুনে কোনো এম্বুলেন্স আসতে রাজি হয়নি। অবশেষ উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে কয়েকজনের সহযোগিতায় একটা ভ্যান গাড়ি করে ভোলা জেলার সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় শহীদ মো জসিমকে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান যে জনাব মো জসিম এখনো মৃত্যু বরণ করেননি। তিনি এখনো বেঁচে আছেন! কিন্তু তার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। তাকে বাচাতে হলে যত দ্রুত সম্ভব ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বাবা বেঁচে আছেন! চাচা বেঁচে আছেন! ডাক্তারের মুখে এমন সংবাদ শুনে জীবনের শ্রেষ্ঠতম খুশি হয় যেন শহীদের ছেলে আর ভাতিজা। সাথে সাথে তারা এই সুসংবাদ তাদের পরিবারকে জানায়। কেননা এর আগে ভ্যানে করে তাকে নিয়ে আসার সময় বাড়িতে কল করে তার শাহাদাতের খবর জানানো হয়। জনাব মো: জসিমের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তার পরিবারের সদস্যরা তখনই রওনা দিয়েছিল জেলা হাসপাতালের দিকে। পথিমধ্যে আবার তার বেঁচে থাকার সংবাদে যারপরনাই

খুশি হয়ে যায় তারা।

ডাক্তারের পরামর্শ মতো সকলে মিলে একটা এম্বুলেন্স ভাড়া করে এবার আহত জসিমকে নিয়ে তার পরিবার রওনা দিলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

পথিমধ্যে পুলিশ বাধা

আহত মো: জসিমকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স ঢাকার শাহবাগ মোড় দিয়ে যাবার সময় সেখানে টহলরত পুলিশ আর বিজিবি এম্বুল্যান্সের গতিরোধ করে। আটকে দেয় তাদের গাড়ি। খুনি পুলিশ আর নিষ্ঠুর বিজিবি গুলিবিদ্ধ আহত মো: জসিমকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দিবে না। আহত জসিমের ছেলে সিয়াম ও ভাতিজারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু তারা কোনোভাবেই এই রোগীকে হাসপাতালে নিতে দিবে না। তাহলে নাকি তাদের চাকরি থাকবে না। স্বৈরাচারের পা-চাটা এই বাহিনী দুটোকে নানাভাবে বুঝাতে বুঝাতে অনেক সময় চলে যায়। স্বৈরাচার পুলিশ আর বিজিবি এরকম সরকারি আক্রমণে আহত রোগীকে কোনো হাসপাতালে কিছুতেই ভর্তি হতে দিবে না। ওইদিকে গুরুতর আহত জসিমের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার শরীর থেকে। এমন সময় তাকে বাঁচানোর জন্য তার সন্তান সিয়ামের মাথায় আসলো নতুন কৌশল। তার মনে পড়ে গেলো বাংলাদেশের পুলিশের চিরায়ত চরিত্রের কথা। সাথে সাথে তিনি পুলিশের একজন অফিসারকে একপাশে ডেকে নিয়ে তার হাতে বেশ কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করতে অনুরোধ করে। হারামখোর সেই পুলিশের চেষ্টায় অবশেষে কাজ হলো। তারপর আবার ঢাকা মেডিকেলের দিকে ছুটে চলে আহত মো: জসিমকে বহন করা এম্বুলেন্স। দুপুর পৌনে ২টার দিকে তাকে নিয়ে এম্বুলেন্স পৌঁছালো ঢাকা মেডিকেলের জরুরী বিভাগে।

হাসপাতালে ভর্তিতে বাধা

হাসপাতালে পৌঁছে গুরুতর আহত জসিমকে ভর্তি করতে গেলে সেখানেও বাঁধা। স্বৈরাচার সরকারের বাহিনী যারা আহতদেরকে ভর্তি নিতে তারা প্রচণ্ড রকম নারাজ। মনে হয় যেন পুরো দেশটাকে তারা ইজারা নিয়েছে। এইসব ন্যাক্কারজনক দৃশ্য দেখে গুরুতর আহত জসিমের ছেলে আর ভাতিজা কর্তব্যরতদের উপর রেগে যেতে নিলে তার শ্যালক তাদেরকে শান্ত করেন।

অমানবিক শর্ত মেনে ভর্তি

অনেক অনুনয় বিনয় করেও যখন স্বৈরাচার কর্মকর্তা কর্মচারীদের মন গলানো গেলো না তখন শাহবাগে পুলিশ আর বিজিবিকে যেভাবে ম্যানেজ করে এসেছে এখানেও সেভাবে ম্যানেজ করে আহত মো জসিমকে ভর্তি করানো হয়। তবে শর্ত থাকে যে হাসপাতালের চিকিৎসা,ঔষধ, খাবার এই ধরনের সরকারি কোনো সুবিধাই জসিমকে দেয়া হবে না। সবকিছুই তাকে কিনে নিতে হবে এবং যা কিছুই ঘটুক না কেনো এখানে কোনো কান্নাকাটি করা যাবে না। কোনো মিডিয়ার সাথে কথা বলা যাবে না। এসব কথার যদি কোনো হের ফের হয় তাহলে সাথে সাথে রোগীকে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হবে। নিরুপায় হয়ে স্বৈরাচারের সকল শর্ত মেনে নেয় আহত মো জসিমের পরিবার।

ঢাকা মেডিকেলে দুর্বিষহ একটি দিন

ভর্তি করানোর পরে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আহত জসিমকে প্রথমে ঢালাও বিছানায় এবং কিছুদিন পরে বেডে দেয়া হয়। ওই সময়ে ঢাকা মেডিকেলে কেবল রোগী আর রোগী। বেশির ভাগই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনে আহত। ১৬,১৭,১৮ জুলাইয়ের রোগী বেশি। তখন সরকারের সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিলো না, তাই ভর্তি নিতো। ভর্তির প্রায় কিছুক্ষণ পরে আহত মো জসিমের অপারেশন শুরু হল। ৮ ব্যাগ রক্ত লাগে তার। একে তো পরিবারের বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজন গ্রামের বাড়িতে আছে তার উপর আবার দেশের এমন উত্তপ্ত অবস্থা। তাই রক্ত বা ডোনার সংগ্রহ করা সোনার হরিণ সংগ্রহ করার মতো অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে অনেক চড়াই-উতরাই ডিঙ্গিয়ে ঐদিনের সবকিছুর সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও আর বাঁচানো গেলো না শহীদ মো: জসিমকে।

জানাজা ও দাফন

শহীদ মো: জসিমের মৃতদেহ বাড়িতে আনার পর স্ত্রী সন্তানদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠি; প্রকম্পিত হয় পুরো বাড়ি। উপস্থিত সকলের একটাই দাবি এই হত্যার বিচার করতে হবে। পরবর্তীতে গোসল দিয়ে বাদ মাগরিব নবিপুর তালুকদার মসজিদে হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকট আত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের স্ত্রী নার্গিস বলেন, আমি স্বামী হারিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি যে, আমার সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্ব কিভাবে চালিয়ে যাবো? আপনারা যদি সহযোগীতা করেন তাহলে আমি আমার সন্তানের ভার বহন করতে পারবো।

ভাই সবুজ বলেন, আমার ভাই মারা যাওয়ায় আমি অনেক কষ্টে আছি। আমার ভাতিজাদের দেখাশুনা কে করবে, আমি নিজেও তো অসহায়। এখন আপনারা যদি সহযোগিতা করেন তাহলে আমার জন্যও অনেক সহজ হবে তাদের কে দেখাশুনা করা।

একনজরে শহীদ মো জসিমের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি

শহীদের নাম	: মো: জসিম
জন্ম	: ১৪ অক্টোবর ১৯৮০
পেশা	: ব্যবসা
কর্মরত প্রতিষ্ঠান	: ছাতার দোকান
ঠিকানা	: আবু খলিফা বাড়ি, ইউনিয়ন: পৌর নবীপুর ৩ নং ওয়ার্ড, থানা: ভোলা সদর, জেলা: ভোলা
পিতা	: মৃত আবু কালাম খলিফা
মাতা	: বিবি ফাতেমা
ঘটনার স্থান	: ভোলা
আক্রমণকারী	: পুলিশ
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৪ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ২টা
মৃত্যুর তারিখ	: ৪ আগস্ট ২০২৪

প্রস্তাবনা:

শহীদের পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান

সন্তানের লেখা পড়ার খরচ বহনের ব্যবস্থা করা

নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

"আঁধার ঘুচাতে আলোর মশাল নিয়ে ফিনিক্স পাখির মতো আবির্ভূত হয়েছেন শহীদ হাফিজ"

শহীদ মো: হাফিজ উদ্দীন

ক্রমিক : ৩৮৫

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০১

শহীদের পরিচয়

শহীদ হাফিজ উদ্দিন ১৯৯৫ সালের ৩ মে যশোর সদরে পূর্ব বারান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মৃত আব্দুল খালেক এবং মায়ের নাম রাজিয়া খাতুন। শহীদ হাফিজের পরিবারে চার ভাই ও চার বোন ছিল। ভাইদের মধ্যে তিনি ছিলেন ৩য়। বড় ভাই মইনউদ্দিন (৩৮) মালয়েশিয়া থাকেন। মেজ ভাই মইজ উদ্দিন ২০০৯ সালে ইন্তেকাল করেছেন। ছোটভাই ইব্রাহীম (২২) স্থানীয় একটি বেসরকারি (কওমী) মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। চার বোনের সকলেই বিবাহিতা। ৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের আগেই তাঁর পরিবার ফরিদপুর থেকে যশোরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ফরিদপুরে তাঁদের পৈতৃক কোন জায়গাজমি নেই। যশোর শহরে বাসাভাড়া করে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও সম্প্রতি ভাইয়েরা মিলে (বিশেষ করে বড় ভাইয়ের সহযোগিতায়) থাকার জন্য যশোর পৌরসভার বাহিরে বাউলিয়া চাঁনপাড়া এলাকায় বাড়ি করার জন্য একটি জমি ক্রয় করেছেন। বাড়ি করার মতো আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় এখনও ভাড়া বাড়িতেই বসবাস করছেন।

পরিবার সামগ্রিকভাবে খুব বেশি সচ্ছল নয়! হাফিজ ৮০০০/ টাকা বেতনে পিকআপ ড্রাইভার হিসাবে চাকুরিরত ছিলেন। এই টাকা দিয়ে নিজের এবং সংসারের খরচ চালাতেন। শহীদ হাফিজের ভাই বোনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই ভালো ছিলো। যার কারণে

মা, বোন ও বোনের পরিবার, ভাই ও ভাইয়ের পরিবার সহ নিজের স্ত্রীকে নিয়ে তিনি একই বাসায় থাকতেন।

২৪ এর সংগ্রাম ছিলো এদেশের আপামর ছাত্র-জনতার সংগ্রাম। সকল শ্রেনীপেশার মানুষের অভূতপূর্ব অংশগ্রহণে ঘটা এক সফল বিপ্লব। রিক্সাওয়ালা, মুদি দোকানদারসহ সকল পেশাজীবী মানুষের। এমন মানুষও এই আন্দোলনে শরীক হয়েছেন, যাদের পরিবার চালাতে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। উদ্দেশ্য একটাই, দীর্ঘ পনেরো বছরের ফ্যাসিবাদের জুলুমের অপসারণ। আর তাই ছাত্রদের এক দফার দাবিতে পুরো দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। এ লড়াইয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানও সরাসরি অংশগ্রহণ করে। স্বৈরাচার পতন ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে এমনি এক ধার্মিক তরুণ শহীদ মো: হাফিজ উদ্দীন সরাসরি সক্রিয় ছিলেন। ৫ আগষ্ট যখন স্বৈরাচারী হাসিনা পদত্যাগ করলো, এদেশের আপামর জনতা বিজয়োল্লাসে মত্ত। এ সুযোগে কিছু দুর্বৃত্ত যশোর চিত্রার মোড়ে আওয়ামীলীগ নেতার মালিকানাধীন জাবের হোটেলে আগুন লাগায়। সেখানে বেশ কিছু ছাত্র-জনতা আটকে পড়ে যায়। সেই আগুনের চিমনি থেকে জনতাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে হাফিজ। অতঃপর তিনি আগুনে পুড়ে জুলাই বিপ্লবে শহীদ হিসাবে নাম লেখান।

ঘটনার বিবরণ

২৪ এর জুলাই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলো এ দেশের আপামর জনতা। বিপ্লবে যেমন উঁচুশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী, ছাত্রদের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল, ঠিক তেমনি বিরাট একটা অংশ নিম্নবিত্তের আত্মত্যাগ ছিলো। উঁচুশ্রেণী কিংবা মধ্যবিত্তের সংগ্রামের কথা আলোচিত হলেও বিপ্লব থেকে আড়ালে পড়ে গেছে নিম্নবিত্তের অকুতোভয় সংগ্রামের কথা।

জুলাই মাসে সারা দেশ যখন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল তখন সবার সাথে শহীদ হাফিজও ছিলেন রাজপথে। ভাগ্নে বোরহান উদ্দিন সহ আরও কিছু বন্ধু ও এলাকার ভাইদের নিয়ে নিয়মিতই যেতেন আন্দোলনে। আগস্ট মাসের ৫ তারিখ যখন স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলো তখন সারাদেশের মতো যশোর শহরেও শুরু হয়েছিলো বিজয় মিছিল, আনন্দ উল্লাস। এমন সময় দুর্বৃত্তদের দেয়া আগুনে পুড়তে থাকে যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র চিত্রার মোড়ে অবস্থিত ৫ তারকা হোটেল "হোটেল জাবের"। হোটেলে যখন অগ্নিকান্ড হয় তখন শহীদ হাফিজ তার ভাগ্নেসহ ৪ জন বিকাল ৩টার দিকে ঘটনাস্থলে যান। আগুনে আটকে পড়া লোকদের আর্তচিৎকার শুনে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে হোটেলের ভিতরে ঢুকে পড়েন। কয়েক দফায় কিছু লোককে উদ্ধার করতে পারলেও এক পর্যায়ে নিজেই আটকা পড়ে যান। নিচের দিকে আগুনের তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় তিনি উপরের দিকে উঠতে থাকেন এবং ১১ তলা পর্যন্ত উঠে পড়েন। এক পর্যায়ে ধোঁয়ার কারনে অক্সিজেন শূন্যতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যান শহীদ হাফিজ। আগুন নিভে গেলে উদ্ধারকর্মীরা আহত এবং নিহতদের বের করে নিয়ে আসেন। এসময় শহীদ হাফিজকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্বজনেরা হাসপাতালের মর্গে সনাক্ত করে তার মৃতদেহ বাসায় নিয়ে যান।

শহীদের নিকটাত্মীয়ের অভিব্যক্তি

শহীদ হাফিজের মা ছেলেকে হারিয়ে বলেন- "আমার ছেলে

অমায়িক ছেলে, সকাল বেলা উঠে সবাইকে ডেকে দিতো, নামাজ আদায় ও কোরআন তেলোয়াত করতো। যেদিন মারা গিয়েছে সেদিনও নামাজ পড়েছে। কোরআন পড়েছে।" শহীদ হাফিজের ভাগ্নে বলেন- "মামা একজন নামাজি ব্যক্তি ছিলেন। দাড়ি রেখেছিলেন। সবসময় পাঞ্জাবী-পায়জামা ও মাথায় টুপি পড়তেন। সর্বক্ষেত্রে ইসলাম পালনে সচেষ্ট থাকতেন।"

আমাদের করণীয়

শহীদেরা আমাদের সম্পদ। যে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে শহীদেরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, আমাদের উচিৎ তাঁদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা। বৈষম্যেবিরোধী এক নতুন বাংলাদেশ সংস্কার করা। এটাই হবে আমাদের শহীদদের প্রতি প্রতিদান। এছাড়াও এই শহীদদের যথাযথ স্বীকৃতি এবং তাঁদের অবদানকে সমুন্নত রাখতে হবে। তবেই তাঁদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: মো: হাফিজ উদ্দীন
জন্ম তারিখ	: ৩ মে, ১৯৯৫
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- বাউলিয়া চানপাড়া, উপজেলা - যশোর সদর (পৌরসভা), জেলা: যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম- পূর্ব বারান্দি, উপজেলা- যশোর সদর, জেলা- যশোর
পিতার নাম	: মৃত আব্দুল খালেক
মাতার নাম	: রাজিয়া খাতুন
স্ত্রীর নাম	: মাহিয়া খাতুন
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৮ জন।
ভাইয়ের সংখ্যা	: ০৪ জন (মৃত-০২)
বোনের সংখ্যা	: ০৪ জন (বিবাহিতা)
পেশাগত পরিচয়	: পিক-আপ ড্রাইভার (জামান অটো)
ঘটনার স্থান	: জাবির হোটেল, চিত্রার মোড়, যশোর
মৃত্যুর কারণ	: অগ্নিকাণ্ডে আক্রান্তদেরকে উদ্ধারকার্যে নিহত
মৃত্যুর সময়	: ৫ আগস্ট, বিকেল ৪:০০ থেকে ৮:০০ টা

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা-১: মাসিক অথবা এককালীন আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে

প্রস্তাবনা-২: শহীদ স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে

শহীদ সামিউর রহমান সাদ

ক্রমিক : ৩৮৬

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০২

শহীদের পরিচয়

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ, স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি, আঠারো বছর বয়সেই অহরহ বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি। জুলাই বিপ্লবে এদেশের বুকে আঠারো এসেছিল নেমে! এমনি এক আঠারো বছরের বিপ্লবী তরুণ হলেন, শহীদ সামিউর রহমান সাদ।

শহীদ সামিউর ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে যশোর জেলার সদর থানার পূর্ব বারান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ মতিউর রহমান এবং মাতার নাম মোছা: সাজেদা রহমান। পিতামাতা আর অগ্রজ বোনকে নিয়ে ৪ সদস্যের পরিবার তাঁদের। একমাত্র বোন সানজিদা পারভিন (২৬) যশোর এম এম কলেজে মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। পিতা মোটর পার্টসের ব্যবসায় করেন এবং মাতা গৃহিনী। শহীদ সামিউর রহমান সাদ বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর- এর একাদশ শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। সর্বশেষ তিনি বাবা-মা ও বড়বোনের সাথে যশোর জেলার সদর উপজেলার পূর্ব বারান্দি মোল্যাপাড়া এলাকায় থাকতেন।

ঘটনার বিবরণ

তারুণ্যের তেজ নিয়ে বিপ্লবের প্রয়োজনে জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন শহীদ সামিউর রহমান সাদ। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে চাকুরিতে কোটার বৈষম্যমূলক প্রয়োগের প্রতিবাদে রাজপথে নেমে আসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলে দেশব্যাপী ব্যাপক সংখ্যায় ছাত্র ও সাধারণ জনতা মারা যায়। যার ফলে কোটা বৈষম্যের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া

আন্দোলন এক পর্যায়ে রূপ নেয় শেখ হাসিনার ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে। ছাত্রদের সাথে যুক্ত হয় আপামর জনসাধারণ। তীব্র আন্দোলনের সামনে টিকতে না পেরে আগস্ট মাসের ৫ তারিখে দেশ ছাড়েন তৎকালীন আওয়ামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের পতন হয়। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষ উল্লাসে ফেটে পড়ে। সবাই যখন বিজয়োল্লাসে ব্যস্ত, ঠিক সেদিন চিত্রার মোড়ে জাবির হোটেলে দুর্বৃত্তরা আগুন লাগালে ঐখানে বেশকিছু ছাত্রজনতা আটকে পড়ে। তাদের উদ্ধার করার কাজে অংশ নিতে গিয়ে শহীদ হয়ে যেয়েন সামিউর রহমান সাদ।

৫ আগস্ট দুপুর বেলা সাদ তার বাবা-মা সহ দুপুরের খাবার খাচ্ছিল। তখন তার সহপাঠীরা তাকে কল দিয়ে বলে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছে। তখন সে তার বন্ধুদের সাথে দেখা করতে বাবার কাছ থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হওয়ার সময় তার এক সহপাঠী মোবাইলে জানায়, জাবের হোটেলে আগুন লেগেছে এবং তার কিছু বন্ধু সেখানে আটকা পড়েছে। তখন সে এলাকার বন্ধুদের সাথে নিয়ে জাবের হোটেলে গিয়ে উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করে। সে দুই তিন জনকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। উদ্ধার কাজে সহযোগিতা করার এক পর্যায়ে আগুনে তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় সাদ চতুর্থ তলায় আটকা পড়ে। তার শারীরিক অবস্থা দেখে ধারণা করা হয়, সে অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস নিতে না পেরে মারা যায়।

আনুমানিক বিকেল পাঁচটার দিকে তার বন্ধুরা তার বাসায় এসে তার বাবাকে বলে, "আংকেল সা'দের গাড়ি জাবের হোটেলের বাইরে পার্ক করা এবং সাদ ভিতরে আটকা পড়ে আছে"। শুনে তার বাবা দ্রুত ছুটে যান ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখেন সেখানে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে। তারা একের পর এক আহত এবং নিহতদের বের করছিল। সাদ এর বাবা আশা করেছিলেন হয়তো তার ছেলেকেও বের করা হবে। তিনি বলেন, তিনি যদি জানতেন তার ছেলে চতুর্থ তলায় বা পঞ্চম তলায় আটকে আছে তাহলে তিনি ফায়ার সার্ভিসের জন্য অপেক্ষা করতেন না, নিজেই চলে যেতেন। মাগরিবের কিছু আগে খুলনা

থেকে একটা ক্রেন আনা হয় যেটা দিয়ে ১৬ তলা থেকে রেসকিউ করা হচ্ছিল। তিনি অনেকক্ষণ আশা করে ছিলেন তার ছেলে হয়তো আগুনের তীব্রতায় উপর দিকে উঠে গিয়েছে এবং এই রেসকিউ টিমের সহায়তায় তার ছেলেকে ফিরে পাবেন। কিন্তু তাকে আর নামানো হলো না।

অপেক্ষা করতে করতে রাত প্রায় সোয়া নয়টার দিকে হাসপাতাল থেকে একজন কল দিয়ে তার বাবাকে বলে সা'দকে হাসপাতালে সনাক্ত করা গেছে আপনি হাসপাতালে আসেন। হাসপাতালের ব্রিজ পার হওয়ার পর তার ভাতিজা তাকে নিশ্চিত করেন যে সা'দ হাসপাতালেই আছে। তখন তিনি জানতে চান যে সে আহত হয়েছে কিনা? বা কতটুকু আহত হয়েছে? এ প্রশ্ন শুনে তার ভাতিজা কান্নায় ভেঙে পড়েন। তখন সা'দের বাবা বুঝতে পারেন যে তাঁর ছেলে আর বেঁচে নেই। তারা হাসপাতালে পৌছানোর আগেই সা'দের মৃতদেহ বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং এ খবর পেয়ে তিনি বাসায় চলে আসেন। স্থানীয় পূর্ব বারান্দি মোল্লাপাড়া কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

বিপ্লবের প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেননি শহীদ সাদ। ছোট বেলা থেকেই মানুষের পাশে দাড়ানোর অভ্যাস, তাকে জুলাই বিপ্লবের অকুতোভয় বীর বানিয়েছে।

শহীদ সামিউর রহমান সাদ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শুরু থেকেই অংশ নিয়েছিলেন এবং সামনের সারি থেকে স্থানীয় এলাকায় নেতৃত্ব ও দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যশোর জেলা সমন্বয়কদের একজন।

পরিবার ও নিকটাত্মীয়ের অভিব্যক্তি

সন্তানের স্মৃতিকাতরতায় শহীদ সামিউর রহমানের সাদের বাবা ভেঙে পড়েছেন এবং গর্ববোধ ও করছেন। সাদের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

'সাদ জুলাই শুরু থেকেই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, সে আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছে। সে যশোর জেলা সমন্বয়কদের একজন ছিল। সাদ বর্ডার গার্ড স্কুল থেকে তৃতীয় শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ছোটবেলায় শিশু সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। নিয়মিত নামাজ পড়ত। তার শখ ছিল ছবি তোলা এবং জিম করা। ৩ আগস্ট আমি ও তার মা তার সাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। আমরা চেষ্টা করতাম নিয়মিত তাকে সাপোর্ট করে যেতে।"

আমাদের করণীয়

এই শহীদেরা আমাদের সম্পদ। যে লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে শহীদেরা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে,আমাদের উচিৎ তাদের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করা। বৈষম্যেবিরোধী এক নতুন বাংলাদেশ সংস্কার করা। এটাই হবে আমাদের শহীদদের প্রতি প্রতিদান।

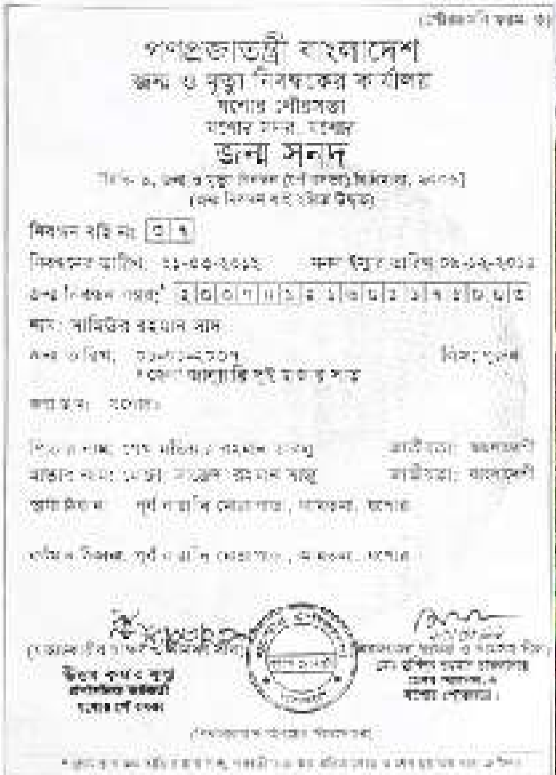

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
যশোর পৌরসভা
যশোর সদর, যশোর
জন্ম সনদ

নাম: সামিউর রহমান সাদ

এক নজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: সামিউর রহমান সাদ
জন্ম তারিখ	: ০১/০১/২০০৭ খ্রি:
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- পূর্ব বারান্দি, ইউনিয়ন- পৌরসভা ১ নং ওয়ার্ড, থানা- সদর, জেলা- যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ
পেশাগত পরিচয়	: ছাত্র, একাদশ শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ, বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর
পিতার নাম	: শেখ মতিউর রহমান
পিতার পেশা ও বয়স	: মোটর পার্টসের ব্যবসায়, ৫৩ বছর
মাসিক আয়	: মাত্র ৩০,০০০/- প্রায়
মাতার নাম: মোছা	: সাজেদা রহমান
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিনী, ৪৯ বছর
বোনের নাম	: সানজিদা পারভিন(২৬)
বোনের পেশা	: মাস্টার্স শিক্ষার্থী, সরকারি এম এম কলেজ, যশোর
ঘটনার স্থান	: জাবির হোটেল, চিত্রার মোড়, যশোর
মৃত্যুর কারণ	: অগ্নিকাণ্ডে আক্রান্তদের উদ্ধারে নিহত
আহত ও নিহত হওয়ার স্থান ও সময়	: ০৫/০৮/২০২৪, জাবের হোটেল, ৪ টা থেকে ৯ টার মধ্যবর্তী সময়ে
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: পূর্ব বারান্দী মোল্যাপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থান
গুগল লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/9MXtuluMhWw7a28R6

পরামর্শ

১। এককালীন আর্থিক সাহায্য।
২। নিয়মিত খোঁজখবর রাখা।

শহীদ আব্দুল আজিজ (চাঁন মিয়া)

ক্রমিক : ৩৮৭

আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০৩

শহীদের পরিচয়

ছোট্ট কিশোর বালক আব্দুল আজিজ। বাবা মা আদর করে নাম দিয়েছে চাঁন মিয়া। ২৪ এর মহান বিপ্লবে শহীদের খাতায় নাম লেখানো এক মহাপ্রাণ। শহীদ চাঁনের মতো কিশোরদের দু:সাহসিক প্রাণশক্তি জাতিকে পথ দেখিয়ে নতুন স্বাধীনতার পানে। অন্যথায় হয়তো জাতিকে বরণ করে নিতে হতো পরাধীনতার শেকল।

আগস্ট ২০২৪, ছাত্রজনতার তুমুল আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয় দীর্ঘ ১৬ বছর এই দেশকে লুটেপুটে খাওয়া জালিম হাসিনা সরকার। হাসিনা সরকারের এই পদত্যাগে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠে দেশের আপামর জনসাধারণ। দীর্ঘদিন জুলুমের শিকার ও বাক-স্বাধীনতাহীন জনতা সপরিবারে রাস্তায় নেমে আসে এই বিজয় উদযাপনের জন্য। সব বয়সের সকল শ্রেনী পেশার মানুষ এই আনন্দ মিছিলে সম্পৃক্ত ছিল । যশোর শহরের বিজয় মিছিলে ছিল ১৬ বছর বয়সী আব্দুল আজিজ ওরফে চাঁন মিয়া নামের এক ছাত্র।

আব্দুল আজীজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা তাকে আদর করে ডাকেন চাঁন মিয়া। একসময় এটিই তার নাম হয়ে যায়। কাগজে কলমে আব্দুল আজিজ সবার জন্য আদরের চাঁন মিয়া হয়েই ছিল । আব্দুল আজিজ ১১ অক্টোবর ২০০৮ সালে যশোরের সদর উপজেলার রায়পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। তার পিতার নাম সেলিম সরকার, মাতার নাম শিউলী সরকার। বাবা মায়ের বিচ্ছেদের পর বড় মামা জয়নুল সরদারের বাসায় লালিত পালিত হচ্ছিলো চাঁন মিয়া ও তার বড় ভাই আব্দুর রহমান আকাশ (১৭)। আব্দুল আজিজ যশোর রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি

বাবা-মা'য়ের বিচ্ছেদের পর চাঁন মিয়া ও তার ভাই আকাশ (১৭) বড় মামার বাড়িতে বড় হয়েছেন। বাবা-মা উভয়েই ২য় বিয়ে করেছেন। বাবা ২য় বিয়ে করে রায়পাড়া কলোনিতে থাকেন। মা ২য় স্বামীর সাথে সংসার করছেন। বাস এর হেল্পারি থেকে বাবার আয় ও বড় মামার পোনা মাছের ব্যবসা থেকে তাদের ভরণপোষণ হয়। নিজেদের কোন পৈতৃক যায়গা-জমি নেই।

ঘটনার বিবরণ

ঘটনার দিন ৫ আগস্ট সকাল ১১টার দিকে বড় ভাই আকাশের সাথে চাঁচড়া মোড় থেকে বিজয় মিছিলে আব্দুল আজিজ অংশগ্রহণ করে। মিছিলের সাথে চলতে গিয়ে আকাশ তাকে জনস্রোতে হারিয়ে ফেলে। দুপুরের দিকে আব্দুল আজিজ ওরফে চাঁন মিয়া কৌতুহলবশত যশোরের চিত্রার মোড় এলাকায় জাবির হোটেলে ঢুকে পড়ে এবং অগ্নিকাণ্ডে আটকে পড়ে। সে বড়ভাই আকাশকে কল করে জানায়, "ভাই, আমি নবম (৯ম) তলায় আটকে পড়ে আছি। আমাকে একটু উদ্ধার করো।"

ছোটো ভাইয়ের ফোন পেয়ে আকাশ তার মামাকে নিয়ে জাবের হোটেলের সামনে যায়। প্রথমে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ও পরবর্তীতে স্থানীয় উদ্ধারকর্মীরা অনেক আহত ও নিহতদের উদ্ধার করলেও চাঁন মিয়াকে খুঁজে পায়না আকাশ ও তাদের মামা। ৫ তারিখ সারারাত হাসপাতাল ও জাবির হোটেলের সামনে অপেক্ষা করার পর পরদিন ৬ আগস্ট সকালে আবার জাবির হোটেলে প্রবেশ করে নিজেরা খুঁজতে শুরু করে। খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে ৪র্থ তলার একটি রুমে এক কোনায় পড়ে থাকতে দেখা যায় তাকে। তার মামা তাকে সনাক্ত করে। শারীরিক অবস্থা দেখে ধারণা করা হয় যে, ৪র্থ তলায় ঐ রুমে গ্যাসের সিলিন্ডার বার্স্ট হয়ে সে মারা গেছে। ৬ আগস্ট জানাজার পর তাকে স্থানীয় রাজবাড়ি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

পরিবারের অভিব্যক্তি

বড় ভাই আকাশের খুব প্রিয় ছিল আব্দুল আজিজ। আকাশ তার সম্পর্কে বলেন, "আমার ভাই আমাকে অনেক বেশী ভালোবাসতো, সবসময় আমার সাথেই থাকতো। এমনকি সেদিন (৫ আগস্ট) মিছিলে আমার সাথেই গিয়েছিল ।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জন্ম সনদ

একনজরে শহীদের পরিচয়

নাম	: আব্দুল আজিজ (চাঁন মিয়া)
জন্ম তারিখ	: ১১/ ১০/ ২০০৮
পেশাগত পরিচয়	: ছাত্র, রেলস্টেশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: রায়পাড়া, ইউনিয়ন: পৌরসভা, ওয়ার্ড: ০৬, থানা: সদর, জেলা: যশোর
পিতার নাম	: সেলিম সরকার
পিতার পেশা ও বয়স	: গাড়ির সুপারভাইজার, ৪৮ বছর
মাসিক আয়	: ১০,০০০/- (প্রায়)
মাতার নাম	: শিউলি বেগম
মাতার পেশা ও বয়স	: গৃহিণী, ৩৬ বছর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৪ (চারজন)
বড় ভাইয়ের নাম	: আব্দুর রহমান আকাশ (১৭)
ঘটনার স্থান	: জাবের হোটেল, চিত্রার মোড়, যশোর
মৃত্যুর কারণ	: জাবের হোটেলের ৪ তলায় পুড়ে মারা যান
শাহাদতের সময়	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, বিকাল
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান	: রাজবাড়ি কবরস্থান, চাঁচড়া, যশোর
কবরের গুগল লোকেশন	: https://maps.app.goo.gl/ikMEU42zbwm5dEsR8

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। বড় ভাই আকাশকে স্বল্প পুঁজির ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেওয়া

‘এতদিন মিছিল করলাম কষ্ট করে, বিজয় মিছিলে যাব না?’

শহীদ মো: রিয়াদ শেখ

ক্রমিক : ৩৮৮

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০৪

শহীদ পরিচিতি

শহীদ মো: রিয়াদ শেখ একজন সাহসী ও উজ্জ্বল তরুণ; যার জন্ম ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ সালে যশোরের চাঁচড়া গ্রামে। পূর্বপুরুষদের বসত গৌরনদী, বরিশাল হলেও বর্তমানে তারা যশোরেই স্থায়ী। তিনি ছিলেন একজন নিষ্পাপ, উদ্যমী ছাত্র। যশোর সরকারি কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন শহীদ রিয়াদ। নিজের শিক্ষা ও উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল তার কিন্তু জীবনের এই যাত্রা খুব অল্প সময়ের মধ্যে থেমে গেল। স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরি করবেন। মাকে বলতেন, সব ঠিক হয়ে যাবে- অভাব থাকবে না।

রিয়াদের পরিবার ছিল পাঁচ সদস্যের। বাবা মো: কাবিল শেখ, যিনি বর্তমানে বেকার এবং মা শাহিনুর বেগম, একজন গৃহিণী; যিনি সংসার আগলে রাখেন। রিয়াদের বড় ভাই হৃদয় শেখ, পেশায় একজন ড্রাইভার।

রিয়াদ সবসময় মানবসেবায় এগিয়ে আসত, বহুবার সে রক্তদান করেছিলেন। মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকা এই তরুণের জীবন এক বেদনাদায়ক ঘটনার মাধ্যমে চিরতরে থেমে গেল। ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে হোটেল জাবিরে আগুন নেভাতে গিয়ে তার মাথায় কাঁচ ভেঙে পড়ে, যা মারাত্মক রক্তক্ষরণ ঘটায়। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে অন্যদের রক্ষা করতে গিয়ে তিনি শহীদ হন। তাঁর আত্মত্যাগ ছিল এক সাহসী এবং অনন্য নজির, যা তার পরিবার এবং এলাকাবাসীর হৃদয়ে স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। শহীদ রিয়াদকে তার গ্রামের বাড়ি চাঁচড়া,তালতলা, রাজবাড়ি মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়। শহীদ রিয়াদ এমন একটি জীবন, যার সমাপ্তি হৃদয়বিদারক হলেও, তার সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনি বেঁচে থাকবে চিরকাল।

পরিবারের সাথে তার শেষ কথা ছিল, ‘এতদিন মিছিল করলাম কষ্ট করে- বিজয় মিছিলে যাব না?’

অর্থনৈতিক অবস্থা

তাঁর বাবা একসময় স্বপ্নছোঁয়া ফিউচার পার্কে সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করতেন। রিয়াদ শহীদ হওয়ার তিনদিন পর পার্কের মালিক জানিয়ে দেন, পার্ক বন্ধ হয়ে যাবে এবং রিয়াদের বাবার চাকরি চলে যায়। সেই থেকে তিনি বেকার। রিয়াদের পরিবার বর্তমানে অর্থকষ্টে দিন পার করছেন।

পরিবারের আয়ের একমাত্র অবলম্বন এখন বড় ভাই হৃদয় শেখ; যিনি প্রাইভেট কার চালিয়ে মাত্র ১০০০০টাকায় পরিবারের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের বাড়িটি জরাজীর্ণ, একটি ভালো

বাড়ি তৈরির রিয়াদের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বাবার পক্ষে সেই ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়া, আওয়ামী বিরোধী মতাদর্শ পোষণ করায় শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে নাশকতার মিথ্যা মামলায় রিয়াদের বাবা ৩-৪ বছর বাড়িতে থাকতে পারেননি, যা তাঁদের অর্থনৈতিক সংকটকে আরও প্রকট করেছে।

রিয়াদের জন্য পরিবার ছিল সবকিছু। তাঁর ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং পরিশ্রমের প্রতি তার অঙ্গীকার অনুকরণীয়।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শহীদ মো: রিয়াদ শেখ ছিলেন এক সাহসী ও আদর্শবান ছাত্র, যিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শুরু থেকেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। শাসকের রক্তচক্ষুর কোনো ভয় না পেয়ে রিয়াদ প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনে অংশ নিতেন। তাঁর সাহসিকতা ও নেতৃত্বের কারণে সহপাঠীদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক অমূল্য প্রেরণা।

৫ আগস্ট, ২০২৪ বিকাল ৩:১৮ টায় রিয়াদ তাঁর দুই বন্ধু চয়ন ও শান্তকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। পরিবার থেকে তাকে আন্দোলনে না যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তারা বলেছিল, এতদিন আন্দোলন করেছ, আজ আর যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বিপদ হতে পারে। কিন্তু রিয়াদ পরিবারের অনুরোধ উপেক্ষা করে বন্ধুদের নিয়ে চাঁচড়া মোড়ে ছাত্রদের বিজয় মিছিলে যোগ দেন। সেদিনের মিছিলটি ছিল সরকারের পতনের প্রতীক এবং সাধারণ জনতা আনন্দে ফেটে পড়ে।

মিছিলটি হোটেলে জাবের ইন্টারন্যাশনালের কাছে পৌঁছালে জানতে পারে হোটেলটিতে আগুন লেগেছে। রিয়াদ এবং তাঁর বন্ধুরা ছুটে যান এবং উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে মিলে প্রায় ১৭-১৮ জন মানুষকে উদ্ধার করেন। রিয়াদের এই সাহসিকতা তাঁর মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, উপরের তলায় উঠতে গিয়ে কাঁচের গ্লাস ভেঙে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই খবরে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নামে। পরিবারের সদস্যরা মর্গে রিয়াদের নিথর দেহ খুঁজে পান এবং জানাজার পর তাঁকে যশোর সদর থানার স্থানীয় ভাপমিল মুসলিম কবর স্থান, চাঁচড়া রাজবাড়ি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

রিয়াদের স্বপ্ন ছিল সরকারি চাকরি করার,পরিবারের অভাব অনটনের সমাধানে হাল ধরার। আরও স্বপ্ন ছিল তাঁর পরিবারের জন্য একটি ভালো ঘর তৈরি করার। যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া রায়পাড়া এলাকায় একটি জরাজীর্ণ ঘরে থাকা রিয়াদ প্রায়ই তাঁর বাবার কাছে একটি ভালো ঘরের কথা বলতেন। যশোর সরকারি কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী রিয়াদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন এবং এই আন্দোলনটি পরবর্তীতে সরকারের পতনের আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

রিয়াদের বাবা মো: কাবিল শেখ বলেছিলেন, "রিয়াদ ছিল সৎ ও আদর্শবান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শুরু থেকেই সে নেতৃত্ব দিয়েছিল।" একবার পুলিশের উপর হামলার সময়, রিয়াদ তাঁর সহযোদ্ধাদের নিবৃত্ত করেছিল, যার জন্য পুলিশই তাঁকে ফুল দিয়ে সম্মান জানায়।

রিয়াদের শাহাদাতের পরপরই তাঁর পরিবার আরও বিপদের সম্মুখীন হয়। রিয়াদের বাবা সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি হারান এবং বর্তমানে বেকার অবস্থায় আছেন। পরিবারটি এখন রিয়াদের বড় ভাই হৃদয়ের আয়ের উপর নির্ভরশীল, যিনি প্রাইভেট কার চালিয়ে সামান্য আয়ে পরিবারের খরচ বহন করছেন।

রিয়াদ আশা করেছিল বৈষম্য দূর হলে হয়তো সরকারি পাবে। সেই বৈষম্য মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে কিন্তু অর্জিত পথে নেই সেই স্বপ্নবাজ রিয়াদ। এইচএসসি পরীক্ষা চলমান ছিল। বাকী পরীক্ষা ১১তারিখে হওয়ার কথা ছিল তার আগে ৫ তারিখেই বিদায় নিলেন তিনি।

শহীদ মো: রিয়াদ শেখের জীবনকাহিনী আমাদেরকে ন্যায়ের পথে চলার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের শেখায় যে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবতার জয় আনতে হয়। রিয়াদ ছিলেন একটি জাতির স্বপ্নের প্রতীক এবং একটি ভাল ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। তাঁর স্মৃতি চিরকাল আমাদের প্রেরণা জোগাবে এবং নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

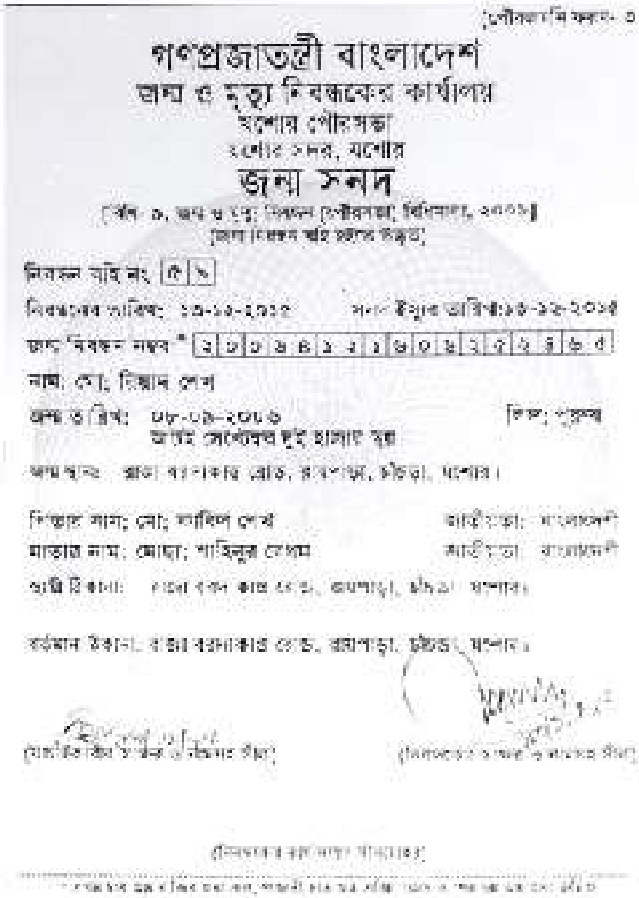
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়
যশোর পৌরসভা
যশোর সদর, যশোর
জন্ম সনদ

নাম: মো: রিয়াদ শেখ
লিঙ্গ: পুরুষ
পিতার নাম: মো: কাবিল শেখ
জাতীয়তা: বাংলাদেশী

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর অনুভূতি

রিয়াদের বাবা কাবিল শেখ বলেছিলেন, "তাঁর ছেলে ছিল সৎ, আদর্শবান এবং পরোপকারী। ছাত্র আন্দোলনে সে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং পুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। রিয়াদ সবসময় মানবসেবায় এগিয়ে আসত, বহুবার সে রক্তদান করেছে।"

রিয়াদের মৃত্যুর খবর তাঁর বন্ধু এবং পরিবারের কাছে ছিল এক গভীর আঘাত। রিয়াদ শুধু পরিবারের নয়, সমাজের একজন মূল্যবান মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠছিলেন।

বড় ভাই বলেন, আমাদের পরিবারের সম্পদ ছিল। ভাই হিসেবে বললে কী হবে- এলাকার মানুষ তাকে ভালো জানে। সব মানুষের ভালোবাসা অর্জন করেছিল আমার ভাই অচেনা লোককেও মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নিতো। অল্প সময়েই মানুষের সাথে মিশে যেত ভাইটি আমার। আল্লাহ যা ভালো মনে করেছেন তাই করেছেন। ভাইকে হারিয়ে মনে অনেক কষ্ট।

শহীদ হৃদয়ের বন্ধুরা জানায়, রিয়াদ ছিল সাহসী ও দয়ালু, কোনো বিপদে মানুষকে সাহায্য করতে সে সবসময় এগিয়ে আসত।

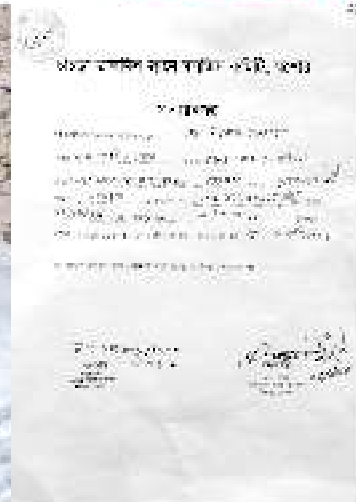

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম	: মো: রিয়াদ শেখ
জন্ম তারিখ	: ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৬
জন্মস্থান	: যশোর
পেশা	: ছাত্র
শ্রেণি	: এইচএসসি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: যশোর সরকারি কলেজ
নিজ জেলা	: যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: হোল্ডিং ১১২, চাঁচড়া, রায়পাড়া এলাকা, ৬ নং ওয়ার্ড থানা: সদর, জেলা: যশোর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম- চাঁচড়া, রায়পাড়া, যশোর
পৌরসভা	: ৬ নং ওয়ার্ড, থানা: সদর , জেলা: যশোর। (তবে পূর্বপুরুষদের ভিটা গৌরনদী, বরিশাল)
পিতার নাম	: মো: কাকিল শেখ
পিতার পেশা	: বেকার (বয়স: ৫৬)
মায়ের নাম	: শাহিনুর বেগম
মায়ের পেশা	: গৃহিণী (বয়স: ৩৯)
মাসিক আয়	: ১০,০০০/-
আয়ের উৎস	: বাবা ও বড় ভাই (ড্রাইভার)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৫
ভাই	: হৃদয় শেখ (বয়স ২৭, পেশা: ড্রাইভার)
মৃত্যু	: ০৫/০৮/২০২৪, ৬টা ৩০মিনিট
মৃত্যুর কারণ	: আগুন নেভাতে গিয়ে মাথায় কাঁচ পড়ে আঘাত ও রক্তক্ষরণ
শহীদের কবরের অবস্থান	: ভাগমিল মুসলিম কবর স্থান, চাঁচড়া, সদর থানা, যশোর। [শহীদের কবরের অবস্থান (GPS লোকেশন)] (https://maps.app.goo.gl/ikMEU42zbwm5dEsR8)

প্রস্তাবনা

রিয়াদের শাহাদাতের পর তাঁর পরিবার গভীর অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে। পরিবারের আয়ের উৎস এখন শুধু রিয়াদের বড় ভাই হৃদয় শেখ, যিনি প্রাইভেট কার চালিয়ে সামান্য অর্থ উপার্জন করেন। রিয়াদের বাবার চাকরি হারানোর ফলে পরিবারের জীবনযাপন আরও কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রিয়াদের পরিবারের প্রয়োজন যথাযথ সহায়তা। প্রস্তাবিত সমাধানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. রিয়াদের বাবার জন্য পুনরায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. রিয়াদের স্বপ্ন পূরণে একটি নতুন ঘর নির্মাণের জন্য সহায়তা প্রদান করা।

'আমি একটু সামনে থেকে আসতেছি, খাবার দাও', বলে হাসতে হাসতে চলে গেল- এলো লাশ হয়ে।' শহীদের মা

শহীদ ফজল মাহাদী

ক্রমিক : ৩৮৯
আইডি : ঢাকা বিভাগ ০০৫

শহীদ পরিচিতি

শহীদ ফজল মাহাদী (চয়ন), ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যশোর সরকারি কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং মেধাবী ও উদ্যমী হিসেবে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠেন। তার স্থায়ী ঠিকানা ছিল চাঁচড়া, রায়পাড়া, যশোর। ফজলের বাবা মফিজুর রহমান। মা রওশনারা রুনা একজন গৃহিণী। বাবা মফিজুর রহমানের সাথে বিচ্ছেদোত্তর তার মা এস আই জামাল উদ্দীনের সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই সংসারে জায়ান (২) নামে তার একটি বৈপিত্রেয় ছোট ভাই রয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, যশোরের চিত্রার মোড়ে হোটেল জাবেরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ফজল আগুন নেভাতে গিয়ে আটকা পড়েন। নিজেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় পাশের ছাদে লাফ দেন, কিন্তু ভাগ্য তার সহায় হয়নি। সন্ধ্যা ৬টায় তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়।

ফজল মাহাদী চয়নের নিঃস্বার্থ সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের স্মৃতি তার পরিবার ও প্রিয়জনদের মনে চিরকাল অমলিন থাকবে। যশোরের রাজবাড়ী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে এই তরুণ শহীদ।

ঘটনা সংক্রান্ত বিবরণ

শহীদ ফজল মাহাদী (চয়ন) ছিলেন এক অনন্য যোদ্ধা, যিনি মানবতার জন্য আত্মত্যাগের এক মহান উদাহরণ স্থাপন করেছেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, স্বৈরাচারী সরকার শেখ হাসিনার পতনের দিন, সাধারণ মানুষ খুশিতে আত্মহারা হয়ে বিজয় মিছিল বের করেন। দিনটি ছিল সকলের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার সূচনা। কেননা, পতনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী হাসিনার দীর্ঘদিনের জুলুমের অবসান ঘটেছে।

ফজল, তাঁর দুই বন্ধু রিয়াদ ও শান্তকে নিয়ে বিজয় মিছিলে অংশ নিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। আনন্দের আবহে তারা যশোর শহরের চিত্রার মোড়ের দিকে অগ্রসর হন। তখনই তারা জানতে পারেন জাবের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর বিক্ষুব্ধ জনতা স্বৈরাচারের পৃষ্ঠপোষক যশোরের চিত্রার মোড়ের হোটেল জাবের-এ আগুন দেয়।

হোটেলের ভিতরে অনেক মানুষ আটকা পড়েছে এমন আশঙ্কায়, ফজল ও তার বন্ধুরা স্থানীয়দের সাথে উদ্ধার কাজে যোগ দেন। তাদের মনে সাহস ও মানবিকতার উদ্দীপনা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ফজল আগুন নেভাতে ও আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই আটকা পড়েন শহীদ ফজল মাহাদী।

অগ্নিদুর্যোগের তীব্রতা বেড়ে গেলে ফজল সাহসী হয়ে হোটেলের ৮ম তলা থেকে পার্শ্ববর্তী একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে লাফ দেয়। কিন্তু সেই লাফটিই তার শেষ বিদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে কে জানত। তিনি পিছলে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর ডান হাত ও ডান পা ভেঙে মৃত্যু ঘটে।

ফজল মাহাদীর মৃত্যু তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের জন্য একটি গভীর শোকের বিষয়। তিনি ছিলেন সেই যুবক, যিনি সব ধরনের মানবিক কাজে সবার আগে ছুটে যেতেন। তাঁর সাহসিকতা এবং মানবিকতা চিরকাল মানুষের হৃদয়ে অম্লান থাকবে।

পাশের বাড়ির বন্ধু রিয়াদ শেখ ও শান্তসহ তিন বন্ধুকে একসাথে গোসল ও জানাযার পর চাঁচড়া রাজবাড়ী কবরস্থানে দাফন করা হয়। ফজল মাহাদী চয়ন আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এক মহান শহীদ হিসেবে, যিনি মানবতার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয় ও বন্ধুর বক্তব্য/অনুভূতি

শহীদের মা বলেন, এই বছর(২০২৪) ১২ ডিসেম্বর ১৯ বছর পূর্ণ হতো। ১৯ বছর ধরে মা হিসেবে কত কথা, কত স্মৃতি জমা হয়েছে! সে লম্বা হয়েছিল, কিন্তু তারী বুদ্ধি হয়নি। শিশুসুলভ স্বভাবটাই রয়ে গিয়েছিল।

কত স্মৃতি বলব! আপনারা যদি ওকে নিয়ে কথা বলতে আসেন, কোনো নেগেটিভ কিছুই শুনবেন না। এলাকার মানুষ ওকে খুব ভালো জানতো। কেউ তাকে খারাপ বলবে না, কারণ সে ছিল ভীষণ নম্র-ভদ্র। সকলকে সালাম দিয়ে কথা বলত।

সব সময় নতুন কাপড় পরিধান করতে চাইত। নিজেকে সবসময় ফিটফাট রাখত, পুরাতন কাপড় পরতে চাইত না। প্রায়ই নতুন কাপড়ের জন্য বায়না ধরত, আর ইনিয়েবিনিয়ে নিজের আবদার পূরণ করে নিত। এখন আর কেউ বায়না করে না। আমার কলিজাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে।

ছেলেমানুষী করত খুব। বাচ্চাদের মতো এটা ওটা চাইত। খুবই আবেগী ছিল, বিশেষ করে পোশাকের ব্যাপারে।

মটরসাইকেল চালানোর প্রবল আগ্রহ ছিল। এক শবে বরাতে প্রিয় নানা ওকে শখের মটরসাইকেল কিনে দিয়েছিলেন। নানা-নানি তাকে অনেক ভালোবাসতেন, তাদের খুব আদরের ছিল। এখন সেই মটরসাইকেল পড়ে আছে, আর আমার বাবাটা গোরস্থানে শুয়ে আছে।

বাজারে গেলেই বলত, "একটা চকলেট এনো।" আইসক্রিম, চকলেট–এমন মিষ্টি খাবারগুলো অনেক পছন্দ করত। ঝাল খেতে পারত না। খুব আবেগপ্রবণ ছিল আমার বাবা।'

প্রথম দিকে আন্দোলনে যায়নি। ৫ আগস্ট প্রথম বের হয়েছিল। নিষেধ শুনল না। বলল, "আমি একটু সামনে থেকে আসতেছি, খাবার দাও।" এই বলে সে চলে গেল–ফিরল লাশ হয়ে। সেদিনই ডিপফ্রিজ পরিষ্কার করে দিল। বলল, "এটা পরিষ্কার করে দিলে কী দিবা আমাকে?" আমি অবশিষ্ট মাংস রান্না করে দিলাম, কিন্তু বাবা আমার খেয়ে যেতে পারল না। সিসি ক্যামেরায় দেখেছি, হাসতে হাসতে বাসা থেকে বের হয়েছে। আল্লাহ কী কল্যাণ রেখেছেন, জানি না। কেন তাঁকে বেছে নিলেন, আল্লাহই ভালো জানেন।'

মা হিসেবে আমার প্রতি যত্নবান ছিল । আমার উচ্চ রক্তচাপ। প্রতিদিন খোঁজ নিত, ঔষধ আছে কিনা। এখন কে খোঁজ নেবে? বিকাল হলে প্রতিদিন একবার ওর ছোট ভাই আর আমাকে শহর ঘুরিয়ে আনত। সবার সঙ্গে মিশুক ছিল, সহজে আড্ডা জমাতে পারত। পথশিশুদের চকলেট কিনে খাওয়াত।

পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ

ফজল মাহাদীর বাবা মফিজুর রহমানের সাথে বিচ্ছেদোত্তর তার মা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন এসআই জামানকে, যিনি বর্তমানে খুলনায় কর্মরত আছেন। বাবার আয় থেকেই তাদের সংসারের খরচ চলে। পরিবারটি মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করলেও মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থায় আছে।

Government of the People's Republic of Bangladesh

Birth Registration Certificate

শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

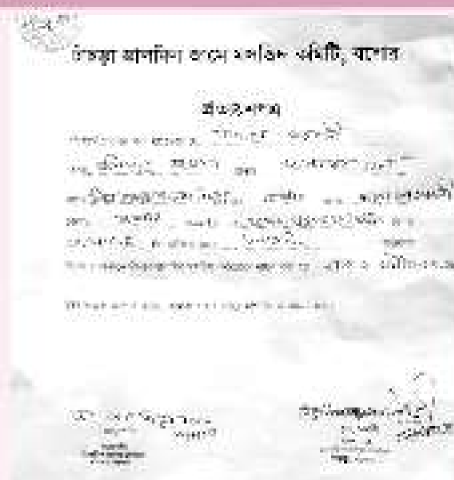

নাম	: ফজলুল মাহাদী, জন্ম: ১২ ডিসেম্বর ২০০৫
পিতার নাম	: মফিজুর রহমান
মায়ের নাম	: রওশনারা রুনা
মায়ের পেশা	: গৃহিনী
মায়ের বয়স	: ৩৬
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪
ভাই-বোন	: ১. জায়ান, বয়স ০২ (বৈপিত্রেয় ভাই)
জন্মস্থান	: যশোর
পেশা/পদবী	: ছাত্র
নিজ জেলা	: যশোর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: যশোর সরকারী কলেজ
ঘটনার স্থান/পয়েন্ট/এলাকা	: হোটেল জাবের, চিত্রার মোড়, যশোর
আক্রমণকারী	: নেই। আগুন নেভাতে গিয়ে আটকা পড়ে। বাঁচতে গিয়ে পাশের ছাদে লাফ দিলে- পড়ে গিয়ে মৃত্যু
আহত হওয়ার সময়কাল	: ৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৪:৩০ টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টা, হোটেল জাবের, চিত্রার মোড়, যশোর
শহীদের কবরের বর্তমান অবস্থান (জিপিএস লোকেশনসহ)	: রাজবাড়ী কবরস্থান, চাচড়া, যশোর। (https://maps.app.goo.gl/ikMEU42zbwm5dEsR8)

পরামর্শ

পরিবারটির কোনো প্রকার সহযোগিতা আবশ্যক নয়। তবে শহীদের মা-কে মাসিক বা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এই সহায়তা তার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে সাহায্য করবে এবং পরিবারের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

'আমি শহীদ হলে
তুমি চিন্তা করিও না মা
আমি তোমার জন্য
জান্নাতে অপেক্ষা করব।'

শহীদ মো: খালিদ হোসেন শান্ত

ক্রমিক : ৩৯০

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০৬

শহীদ এর পরিচয়

নিকৃষ্ট শাসক দ্বারা পরিচালিত দেশ আমাদের বাংলাদেশ। বাংলাদেশের যশোর জেলার চাঁচড়া ইউনিয়ন রায়পাড়া গ্রামে ০৯ মার্চ ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মো: মোতালেব মিয়ার ঘর আলো করে আসে খালিদ হোসেন শান্ত। তার বাবা মায়ের বিয়ের দীর্ঘ ১৩ বছর পর আল্লাহর অশেষ রহমতে তার জন্ম হয়। তার বাবা পেশায় একজন রিকশাচালক, তার মা একজন আদর্শ গৃহিণী।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো গুন্ডা বাহিনী

শান্ত খুব দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তার পরিবারে তার বাবাই একমাত্র উপার্জন করতেন। তিনিই পরিবারের সকল চাহিদা পূরণের চেষ্টা করতেন। শান্তর স্বপ্ন ছিল সে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তার পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। তার বাবা মায়ের দুঃখ দুর্দশা দূর করবে। তার বাবা মাকে সুন্দর একটা জীবন উপহার দিবে । কিন্তু স্বৈরাচারী আওয়ামী শাসক গোষ্ঠী ও হেলমেট বাহিনীরা তার স্বপ্ন আর পূরণ করতে দিলো না। তার বাবা মা কান্না করতে করতে বলেন আমরা কাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবো কে আমাদের দেখে রাখবে কে আমাদের কবরের পাশে গিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে?

যেভাবে শহীদ হলেন খালিদ হোসেন শান্ত

আওয়ামী পৈশাচিক সরকার ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের সাথে অঘোষিত ভাবে যুদ্ধে নেমে পড়ে। টোকাই লীগ বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, চাইনিজ রাইফেল, ছুরি, চাপাতি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শহরের বিভিন্ন যায়গায় আন্দোলনরত ছাত্র জনতার উপর হায়েনা পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রদের যৌক্তিক আন্দোলনের উপর এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়ে হেলমেট ধারি পুলিশ। তাদের এই গুলিতে পথচারী থেকে শুরু করে মায়ের কোলের অবুঝ শিশুও রেহাই পায় নাই। শহীদ শান্তর বাবা তাকে একদফা দাবির আন্দোলনে রাস্তার মোড়ে দেখেছিলেন। আন্দোলন চলাকালীন একপর্যায়ে হোটেল জাবেরে কৌতূহল বশত ঢুকে পড়ে শহীদ শান্ত। সেদিন আওয়ামী নরপিশাচরা ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, সরকারি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। তাদের সেই ধ্বংসযজ্ঞে ছাই হয় জাবের হোটেলটি। গুন্ডা বাহিনীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি হোটেলে অবস্থানরত শহীদ খালিদ হোসেন শান্ত। একপর্যায়ে ৯ম তলা থেকে নিজের গায়ের জামা হাতে পেঁচিয়ে উড়াতে থাকে ও বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে।

আন্দোলনকারীরা শান্তকে উদ্ধার করে আনে। ততক্ষনে আগুনে তার পুরো শরীর পুড়ে যায়। কমপ্লিট শাটডাউন জারি থাকায় শান্তকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয় তারা। এরপরও যশোর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ততক্ষণে খালিদ হোসেন শান্ত আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শাহাদাতের সুধা পান করেন। হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বলেন, 'শান্ত আমাদের অনুপ্রেরণা, আমরা তার কাছে চিরঋণী হয়ে গেলাম।'

আন্দোলনের অগ্রসেনানি শহীদ শান্ত

আন্দোলনের শুরু থেকেই নিরঙ্কুশ অংশগ্রহণ ছিল মো: খালিদ হোসেন শান্ত। ছাত্রদের অধিকার আদায়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে সে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতো। এই ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করার জন্য স্বৈরাচারী সরকারের পুলিশ ও গুন্ডা লীগ ছাত্র জনতার উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। শাহাদাত এর দিন সকালে আন্দোলনে যেতে চাইলে তার মা তাকে বলে তোর কিছু হয়ে গেলে আমরা কোই যাবো আমাদের কী হবে শান্ত তার মাকে কোমল ভাষায় বিনয়ের সাথে বুঝিয়ে বললেন "আম্মু আবু সাইদ যদি পাঁচটা গুলি খাতি পারে, তা আমি গুলি খেয়ে মইরে যাবো আম্মু শহীদ হয়ে যাবো, আমি চইলে যাই। তার আম্মু বলে তুমি যাইয়ো না, তুমি একটা ছেলে আমার আর কেও নেই। মাটি দেবে কিডা? আমাগে খাতি দেবে কিডা? মা আমি যদি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাতে অপেক্ষা করবো।" দুনিয়াতে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর জিম্মায় ও আমার বিজয়ী ভাইদের কাছে রেখে গেলাম এ কথা বলে শান্ত বাসা থেকে বের হয়ে গেলো। আর ফিরলো না ফিরবেও না সে তার মায়ের বুকে। তার বাবা মা হয়ে গেলেন পুনরায় নিঃসন্তান। শান্ত তার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। শান্তর মা খাদিজা বেগমের আর্তনাদ যেন থামছেই না।

কেমন আছেন শান্তর পরিবার

শান্তর বাবা মা হয়ে গেলেন সন্তান হারা। তার বাবা মার বিয়ের ১৩ বছর পর একটি সন্তান পেয়ে খুশি ছিলেন তারা। কিন্তু ছেলের ১৮ বছর বয়সেই তাকে আবার হারিয়ে ফেললো। শান্তর শহীদ হওয়ার পর তার মা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে, কথা বলতে পারে না ঠিক মতো। আওয়ামী টোকাই লীগ শান্তর মাকে করে দিলো পুণরায় নিসন্তান।

রেখে যাওয়া স্মৃতি

শান্ত ছোট থেকেই ছিল অনেক অমায়িক। সবার সাথে সুন্দর ব্যবহারে মাতিয়ে রাখতো শ্রেণীকক্ষ। বাবা মা শিক্ষক ও বড়োদের সম্মান করতো। পরোপকার করতে ভালোবাসতেন। শিক্ষকরা প্রতিনিয়ত তার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করেন। শিক্ষকরা শহীদ খালিদ হোসেন শান্তকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে গর্ববোধ করেন। শিক্ষকরা তার জন্য প্রতিনিয়তো দোয়া করছেন শহীদ শান্তকে যেন আল্লাহ তায়ালা জান্নাত বাসী করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয়

মৃত্যু সনদ

শহীদের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল

নাম	: মো: খালিদ হোসেন শান্ত
পিতার নাম	: মো: মোতালেব মিয়া
পেশা	: রিকশাচালক
মাতা	: খাদিজা বেগম
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৩ জন
ভাই-বোন	: নেই
জন্মস্থান	: যশোর
পেশা/পদবী	: ছাত্র
নিজ জেলা	: যশোর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	: যশোর সরকারী কলেজ
ঘটনার স্থান/পয়েন্ট/এলাকা	: হোটেল জাবের, চিত্রার মোড়, যশোর
আক্রমণকারী	: আওয়ামী সন্ত্রাসীদের দেওয়া আগুন নেভাতে গিয়ে আটকা পড়ে। বাঁচতে গিয়ে পাশের ছাদে লাফ দিলে- পড়ে গিয়ে মৃত্যু
আহত হওয়ার সময়কাল	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, বিকাল ৪:৩০টা
মৃত্যুর তারিখ ও সময়, স্থান	: ০৫ আগস্ট ২০২৪, আনুমানিক সন্ধ্যা ৬.০০টা, হোটেল জাবের, চিত্রার মোড়, যশোর

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
২। পরিবারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং বিপদাপদে পাশে থাকা।

শহীদ সাকিবুল হাসান মাহি

ক্রমিক : ৩৯১

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০৭

পরিচয়

মো: সাকিবুল হাসান মাহি একজন প্রতিভাবান শিক্ষার্থী, যিনি ৯ম শ্রেণিতে যশোর জেলা স্কুলে পড়াশোনা করছিল । তার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা যশোর জেলার সদর থানার চাঁচড়া ডালমিল পাড়ায়, যেখানে পরিবারের সাথে তিনি বসবাস করতেন। পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই গ্রামীণ পরিবেশ সাকিবুলের শৈশবকে রঙিন করেছে। প্রকৃতির মাঝে তার দুরন্তপনা এবং খেলাধুলার প্রতি ভালোবাসা তাকে তার বয়সী অন্যদের থেকে একটু আলাদা করে তুলেছে। তার পিতা, মো: শহীদুর রহমান, একজন পরিশ্রমী ব্যবসায়ী। ৪৫ বছর বয়সী শহীদুর মাছের ব্যবসার মাধ্যমে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করেন এবং মাসিক ১০,০০০ টাকা আয় করেন। পরিবারের কর্তা হিসেবে তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং তার কঠোর পরিশ্রমের ফলেই পরিবার একটি স্বচ্ছল জীবন যাপন করে। সাকিবুলের মাতা, মোছা: আইরিন সুলতানা, একজন আদর্শ গৃহিণী। ৪০ বছর বয়সী এই নারী তার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দেখাশোনা করেন এবং ঘরোয়া কাজের পাশাপাশি সন্তানদের আদর-যত্নে কোনো ত্রুটি রাখেন না। পরিবারের ৪ সদস্যের মধ্যে সাকিবুল তার ছোট বোন সুসকান সুলতানাকে নিয়ে ভীষণ স্নেহপ্রবণ ছিলেন। সুসকান বাপ্তা প্রভাত কিন্ডারগার্টেনের ২য় শ্রেণিতে অধ্যয়নরত এবং মাত্র ৮ বছর বয়সী। পরিবারের ছোট সদস্য হিসেবে সে সবার আদরের এবং সাকিবুল তাকে সবসময় আগলে রাখত। সাকিবুল তার মা-বাবার অত্যন্ত আদরের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই সে দুরন্ত এবং খেলাধুলায় মেতে থাকলেও, মায়ের কাজে সাহায্য করতে সে কখনো দ্বিধা করত না। ছোট হলেও পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি তার দায়িত্বশীল আচরণ এবং মায়ের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব তাকে পরিবারের মাঝে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছে। একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে, সাকিবুল এমন এক চরিত্রে গড়ে উঠেছে, যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং পারিবারিক দায়িত্ববোধের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্টের ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের অবসান সমকালীন বিশ্বে এক বিরল উদাহরণ। তবে এই অসাধারণ জাগরণ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের টানা ১৬ বছরের চরম স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির পতন আকস্মিকভাবে ঘটেনি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা জনগণের অসন্তোষ, যেখানে স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত অংশ নিয়েছিলেন, ফলে এটি গণবিস্ফোরণে পরিণত হয়েছিল। তেমনি এক স্কুল ছাত্র যশোর জেলা স্কুলের নবম শ্রেণির সাকিবুল হাসান মাহি। সে শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। বিশেষ করে যখন রংপুরে আবু সাঈদ শহীদ হয়, সেদিন থেকে মাহি সরাসরি রাজপথের আন্দোলনে যোগ দেয়। তার অনুরোধে তার বাবা তাকে একটি জাতীয় পতাকা কিনে দেন। ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের বিজয়ের দিনে চাঁচড়া চেকপোস্টে ছাত্র-জনতার জমায়েতের খবর পেয়ে মাহি বাসা থেকে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। কিছুক্ষণ পর বিজয় মিছিলে অংশ নিতে তার বাবা ও বোনও যুক্ত হোন। মুসকান ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাইলে তারা রেলওয়ের কাছে মাহির দেখা পান। তখন মাহি বাবাকে বলে, "বাবা, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি বিজয় মিছিল করে তারপর আসব।" এই কথা বলে মাহি রোড ডিভাইডার পার হয়ে বোনের গালে একটি চুমু খায় এবং মিছিলের অগ্রভাগে চলে যায়। সন্ধ্যার দিকে এলাকার সব ছেলে ফিরে এলেও মাহি বাসায় ফেরেনি। তখন তার বাবা খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন যে, জাবির হোটেলের লাগা আগুনের কথা। মাহি জাবির হোটেলে উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে এবং মাহি সহ এলাকার আরও তিনজন ছেলে নিখোঁজ রয়েছে। এই খবর পেয়ে মাহির বাবা তাকে অনবরত ফোন করেন, কিন্তু ফোন রিসিভ হয়নি। কিছুক্ষণ রিং হওয়ার পর তার ফোনটিও বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর তার বাবা জাবির হোটেলের বাইরে এবং হাসপাতালে পাগলের মতো খোঁজ শুরু করেন। আনুমানিক সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উদ্ধারকর্মীরা মাহিকে মৃত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে গিয়ে তার বাবা মৃতদেহ সনাক্ত করেন এবং আগুনে বিকৃত দেহ দেখে তার বাবা মুহূর্তেই আতকে উঠে। বিজয় মিছিলে অংশ নেয়া প্রিয় মাহিকে বাবার কাধে করে বাসায় নিয়ে আসেন। বাড়িতে শোকের ছায়ায় , চারিদিকে অন্ধকার হয়ে যায়। ফুটফুটে ছেলের অকালে দেশের জন্য জীবন দেওয়াটা অনেকেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু সারাদেশের শহীদদের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে রংপুরের আবু সাঈদের প্রেরণা, হৃদয়ে পাথর বেঁধে শহীদ সাকিবুল হাসান মাহিকে চিরবিদায় জানানো হয়। পরদিন ৬ আগস্ট সকাল ১০:০০ ঘটিকায় চালমিল মোড়ে প্রায় হাজার মুসল্লির উপস্থিতিতে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে স্থানীয় চাচড়া রাজবাড়ী কবরস্থানে দাফন করা হয়। বিদায় নেয় সকলের আদরের মধ্যমণি, দেশের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া প্রিয় শহীদ সাকিবুল হাসান মাহি।

শহীদ সম্পর্কে অনুভূতি

সাকিবুল হাসান মাহি ছিল এমন এক কিশোর, যার জীবন আলোকিত হয়েছিল তার অসাধারণ মেধা ও সৎ জীবনধারায়। প্রতিবেশী বড়রা আজও গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করেন। তারা বলেন, 'সাকিবুল ছিল মেধাবী, সৎ এবং অত্যন্ত মিশুক।" তার মায়াবী হাসি আর বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সবার হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। মায়ের কাজে সাহায্য করতে সে সবসময়ই প্রস্তুত থাকত, যেন তার দায়িত্ববোধ এবং পরিবারের প্রতি ভালোবাসা সবসময় জাগ্রত ছিল । তার কাজের প্রতি আন্তরিকতা এবং নিরলস শ্রম তাকে অন্যান্য সমবয়সীদের থেকে আলাদা করে তুলেছিল ।

সাকিবুলের আচরণ সবসময়ই ছিল প্রশংসনীয়। বড়দের সাথে বিনয়ী এবং ছোটদের প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার তাকে সবার কাছে অনুকরণীয় করে তুলেছিল। এমনকি যখন তার চারপাশের অনেক কিশোর বাজে সঙ্গের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছিল , সাকিবুল সেই সব অসৎ সঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে রাখতো। তার এই সচেতনতা, শুদ্ধ মনোভাব এবং জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি তাকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো করে তুলেছিল, যার আলো আজও মানুষের মনে জ্বলজ্বল করে। আজ তার অনুপস্থিতিতে, সবাই অনুভব করে তার সেই কোমল, বিনয়ী এবং অনন্য ব্যক্তিত্বের শূন্যতা, যা অনেকের জীবনে এক গভীর শূন্যতা সৃষ্টি করেছে।

পারিবারিক আর্থিক অবস্থার বিবরণ

শহীদ হাসিবুল হাসানের বাবা তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। স্থানীয়ভাবে মাছের রেণু কুড়িয়ে প্রাপ্ত ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা দিয়ে সংসার পরিচালনা করা অনেকটাই অসম্ভব। সম্প্রতি প্রিয় ছেলে মারা যাওয়ার কাজে মনোযোগ দিতে পারছেন না। শহীদের পিতা ব্যবসায় সহায়তা পেলে হয়তো বাকী সদস্যদের নিয়ে স্বাচ্ছন্দে নিজেদের জীবন পার করতে পারবে।

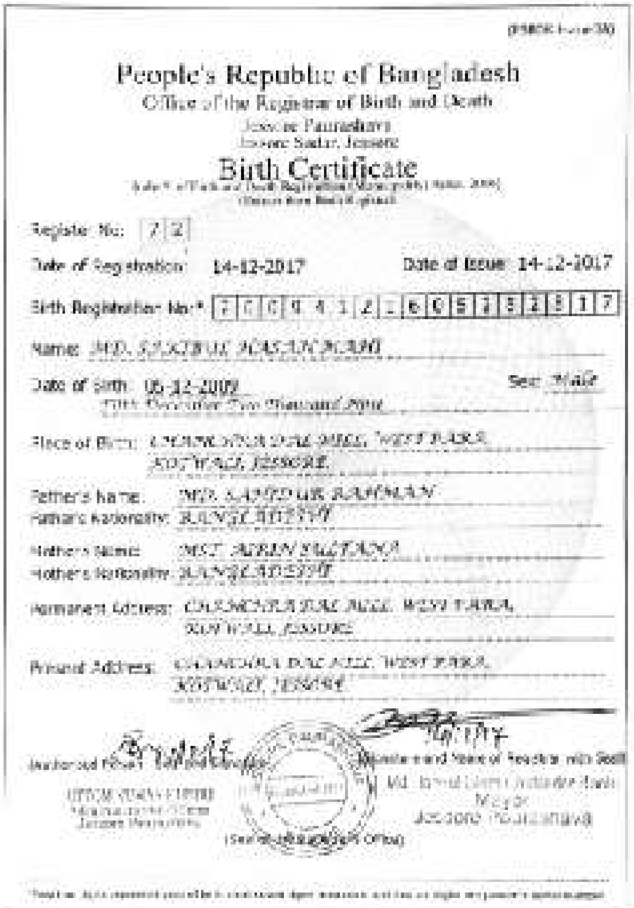

People's Republic of Bangladesh
Office of the Registrar of Birth and Death
Jessore Paurashava
Jessore Sadar, Jessore
Birth Certificate

Register No: 7 2
Date of Registration: 14-12-2017 Date of Issue: 14-12-2017
Birth Registration No.*

Name: MD. SAKIBUL HASAN MAHI
Date of Birth: 05-12-2009 Sex: Male
Place of Birth: CHANCHRA DAL MILL, WEST PARA, KOTWALI, JESSORE
Father's Name: MD. SAHIDUR RAHMAN
Father's Nationality: BANGLADESHI
Mother's Name: MST. AIRIN SULTANA
Mother's Nationality: BANGLADESHI
Permanent Address: CHANCHRA DAL MILL, WEST PARA, KOTWALI, JESSORE
Present Address: CHANCHRA DAL MILL, WEST PARA, KOTWALI, JESSORE

Authorised Person
Signature and Name of Registrar with Seal
Mayor
Jessore Paurashava

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সাকিবুল হাসান মাহি, জন্ম: ০৫-১২-২০০৯
পেশা	: শিক্ষার্থী, ৯ম শ্রেণি
প্রতিষ্ঠান	: যশোর জেলা স্কুল
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা	: চাঁচড়া ডালমিল পাড়া, পৌরসভা: ৫নং ওয়ার্ড
থানা	: সদর, জেলা: যশোর
পিতার নাম	: মো: শহীদুর রহমান,
বয়স	: ৪৫, পেশা ব্যবসা
মাতার নাম	: মোছা: আইরিন সুলতানা, বয়স: ৪০, পেশা : গৃহিণী
মাসিক আয়	: ১০০০০/- আয়ের উৎস: মাছের ব্যবসা
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ৪ জন
১) বোন	: সুসকান সুলতানা, বয়স: ০৮ মাঙ্গা প্রভাত কিন্ডারগার্টেন, ২য় শ্রেণি

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

শহীদ মো: ইউসুফ আলী

ক্রমিক : ৩৯২

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০৮

শহীদ পরিচিতি

মো: ইউসুফ আলী, এক উদ্যমী ও প্রতিশ্রুতিশীল কিশোর, যিনি ছোটবেলাতেই শিক্ষা ও ধার্মিকতাকে আলিঙ্গন করেছেন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করার পর, তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে আসার জন্য যশোর রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসায় হিফজ কোর্সে ভর্তি হন। ইতোমধ্যেই তিনি ৯ পারা কুরআন মুখস্থ করেছেন, আর তাঁর এই ধারাবাহিকতা তাঁকে একদিন পূর্ণ হাফেজে পরিণত করবে বলে আশা ছিল । ইউসুফের জন্ম ৩ এপ্রিল, ২০০৯ সালে, যশোরের এক শান্ত ও সরল গ্রাম চাঁচড়া ভালমিলে। তার পিতা মো: মানিক হোসেন, একজন পরিশ্রমী ড্রাইভার, যিনি পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন নিঃস্বার্থভাবে। আর মা শাহিনা আখতার, একজন গৃহিণী, যিনি স্নেহের পরশে সন্তানদের লালন করে চলেছেন। ইউসুফের পরিবারে মোট পাঁচজন সদস্য–দুই বোন ও এক ভাই সহ এক সুন্দর বন্ধনে আবদ্ধ একটি পরিবার। এই পরিবারের ইতিহাসও গর্বের, কারণ ইউসুফের একজন আত্মীয় ২০০৪ সালের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হন। তার এই আত্মত্যাগ তাদের পরিবারকে একটি অনন্য সম্মানের আসনে বসিয়েছে। ইউসুফের শৈশব কাটছে এই পরিবার ও গ্রামের পরিবেশে, যেখানে ধর্ম, শিক্ষা এবং বীরত্বের গল্প তাকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করে তুলছে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

২০২৪ সালের আগস্ট মাসের ৫ তারিখ, বাংলাদেশের ইতিহাসে গভীরভাবে খোদিত একটি অধ্যায়। দীর্ঘ ষোলো বছরের শাসনের পর, ছাত্র জনতার আন্দোলনের তীব্রতায় ভেঙে পড়ে শেখ হাসিনার সরকার। এদিন জনতার উল্লাসে ভরে ওঠে শহরের প্রতিটি প্রান্ত। এই আন্দোলন ছিল একটি জাতীয় মুক্তির প্রতীক, আর সেই মুক্তির

মিছিলে শামিল হয়েছিল যশোর রেলস্টেশন মাদ্রাসার কিশোর ছাত্র, ইউসুফ আলী। ৫ আগস্টের সেই ভোরে, ইউসুফ আলী নতুন জামাকাপড় পরে, ভাইয়ের কিনে দেওয়া নতুন জুতো পায়ে, উচ্ছ্বাস আর আশায় ভরা হৃদয় নিয়ে মিছিলে বের হয়। ঘর থেকে বেরোনোর আগে মায়ের কাছে এসে বলে, "আম্মু, মিছিলে যাচ্ছি। তিনটার মধ্যে ফিরে আসবো।" মায়ের চোখে ছিল উদ্বেগের ছাপ, কিন্তু ছেলেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে দেখে বিদায় দেন। ইউসুফ, মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে, রাস্তায় নেমে যায় বিজয় মিছিলে।

আনুমানিক দুপুর দুইটার দিকে, চাঁচড়া চেকপোস্টে ইউসুফের সাথে তার মেজো ভাই ইয়াসিনের দেখা হয়। বিজয় মিছিলের ভীড়ে, তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য কথা বলে। ইয়াসিন তাকে বাসায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, আর ইউসুফ শান্ত গলায় সম্মতি জানায়, "ভাই, আমি দ্রুত ফিরবো।" কিন্তু এই কথাই ছিল দুই ভাইয়ের শেষ কথোপকথন। সেই মিছিলের উত্তাল ভীড়ে ইউসুফ যেন হারিয়ে যায়।

বিকেলের দিকে ইউসুফের পরিবারের কাছে আসে মর্মান্তিক সংবাদ- জাবির হোটেলে আগুন লেগেছে এবং সেখানে তিনজন ছেলে নিখোঁজ। উৎকণ্ঠায় ছুটে যায় ইউসুফের পরিবার, তাকে খুঁজতে শুরু করে জাবির হোটেল সংলগ্ন এলাকা এবং হাসপাতালগুলোতে। কিন্তু কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিল না।

রাত আটটার দিকে তারা জানতে পারে যশোর সদর হাসপাতালে বেশ কিছু মৃতদেহ আনা হয়েছে। শঙ্কা ও দুশ্চিন্তায় সেখানে ছুটে যায় পরিবার। তবে ইউসুফের চেহারা এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথমে তাকে চেনা যাচ্ছিল না। তবুও তার ভাই ইয়াসিন, যিনি কিছুদিন আগে তাকে নতুন জুতো কিনে দিয়েছিলেন, সেই জুতো দেখে ভাইকে শনাক্ত করতে সক্ষম হন। মুহূর্তটি ছিল পরিবারের জন্য এক অকথ্য হৃদয়বিদারক যন্ত্রণার। ইউসুফ আলী আর ফিরে আসেনি। পরদিন, ৬ আগস্ট সকাল ১০টায়, স্থানীয় কবরস্থানে শহীদ ইউসুফ আলীকে জানাজার শেষে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। তার কোমল হৃদয়ে ছিল কোরআনের হাফেজ হওয়ার স্বপ্ন, আল্লাহর কালাম মুখস্থ করার দৃঢ় সংকল্প। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হলো না। ইউসুফ আলী চিরবিদায় নিলো, রেখে গেল তার অপূর্ণ স্বপ্ন, মায়ের অশ্রু এবং পরিবারের বেদনাময় স্মৃতি। তার এই শহীদী মৃত্যু শুধুমাত্র তার পরিবারের জন্য নয়, পুরো দেশের জন্য ছিল এক গভীর শোকের প্রতীক। এই সাহসী কিশোর বিজয়ের মিছিলে জীবন উৎসর্গ করে গেলো, দেশের পরিবর্তনের স্বপ্নে অবিচল থেকে, নতুন দিনের প্রার্থনায় অনন্তের পথে পা বাড়ালো।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম : মো: ইউসুফ আলী
পেশা : শিক্ষার্থী। পঞ্চম শ্রেণী পাশের পর যশোহর রেলওয়ে স্টেশন মাদরাসায় হিফজে অধ্যয়নরত ছিল। সর্বশেষ ৯ পারা হেফজ সম্পন্ন করেছেন
জন্ম তারিখ : ০৩//০৪/২০০৯
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: চাঁচড়া ডালমিল, ইউনিয়ন : ৫ নং ওয়ার্ড, থানা: সদর, জেলা: যশোর
পিতা : মো: মানিক হোসেন
বয়স : ৫০
পেশা : ড্রাইভার
মাতার নাম : শাহিনা আকতার, পেশা: গৃহিণী, বয়স: ৪৫
আহত ও শাহাদাতের তারিখ: ০৫ আগস্ট ২০২৪
পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৫ জন
ভাইবোনের সংখ্যা : ২ বোন ১ ভাই
১) মো: জীবন, বয়স: ২৯
পেশা: টেইলারিং মাস্টার
২) মো: ইয়াসিন, বয়স ২৬
পেশা: ড্রাইভার ,
৩) মাহিমা আক্তার, বয়স - ১১, পেশা, শিক্ষার্থী

প্রস্তাবনা

শহীদ ইউসুফ আলীর বাবা, মো: মানিক, একজন ড্রাইভার। তার আয় মূলত সার্ভিসের উপর নির্ভরশীল, যা পাঁচজন সদস্যের পরিবারের জন্য অত্যন্ত সীমিত। ডাল মিলপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাসায় বসবাস করছেন তারা, যেখানে দৈনন্দিন জীবনের খরচ মেটানোও তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। মো: মানিকের একমাত্র ছেলে ইউসুফ আলী একটি স্বাধীন দেশের জন্য শহীদ হয়েছে। পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে, মৌলিক চাহিদা মেটাতে এবং ভবিষ্যতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সাহায্য প্রয়োজন।

" আমি যদি শহীদ হয়ে যায় তার বিনিময়ে তোমরা ভালো থাকবে, দেশ ভালো থাকবে। আমার জন্যে দোআ করো।"

শহীদ মো: মেহেদী হাসান আলিফ

ক্রমিক : ৩৯৩

আইডি : খুলনা বিভাগ ০০৯

শহীদ পরিচিতি

যশোর জেলার সদর উপজেলার পুলেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র মো: মেহেদী হাসান আলিফ। যশোর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড অধিভুক্ত চাঁচড়া আদর্শ পাড়ার জরাজীর্ণ এক ঘরে শুয়ে স্বপ্ন দেখত কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার তীব্র ইচ্ছা তার পড়াশোনায় ভালোই প্রভাব ফেলেছিল। সবসময় পড়াশোনায় ভালো করত। স্বপ্ন পূরণের ব্যাপরে সে ছিল আত্মবিশ্বাসী ছিল। মেহেদী হাসান আলিফের বাবা জনাব মো: হারুন অর রশিদ পেশায় একজন ড্রাইভার। তার একমাত্র আয়েই পরিবার চলে। তার মা মোসা: মোমেনা বেগম ডলি। আলিফের একটি ছোট বোন আছে। তার নাম মীম। মীম স্থানীয় একটি স্কুলে ১ম শ্রেণিতে পড়ে।

শহীদ মো: মেহেদী হাসান আলিফ ২০০৯ সালের ৩ অক্টোবর যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুলেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত। ছোট থেকেই তিনি একজন ভালো মানুষ ছিলেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষের মন জয় করে নিতেন। কেউ একবার তার সংস্পর্শে আসলেই বন্ধু হয়ে যেত। ছোট বোন মীমের কাছে শহীদ মেহেদী ছিলেন একজন আদর্শ ভাই। ছাত্র হিসেবে যেমন ছিলেন মেধাবী তেমনি মানুষ হিসেবে ছিলেন চমৎকার।

আলিফের দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ

মেহেদী হাসান আলিফের মা মোমেনা বেগম ডলি একদিন ছেলেকে বলেন, "তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে?" প্রত্যুত্তরে আলিফ বলে, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তার বিনিময়ে তোমরা ভালো থাকবে, দেশ ভালো থাকবে। আমার জন্য দোয়া করো।"

এতটুকু একটা বাচ্চা ছেলের এমন জবাবে মা মোমেনা বেগম কান্নায় ভেঙে পড়েন। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি কতটা ভালবাসা থাকলে এমন উত্তর দিতে পারে।

জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেও ছিল একজন সম্মুখ সারির যোদ্ধা। প্রায়শই বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে চলে যেত আন্দোলনে অংশ নিতে। ৫ আগস্ট ২০২৪, সকালে সে বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আন্দোলনে যায়। যাওয়ার আগে মা কে বলে যায়, "মা আমি যাচ্ছি। "কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞসা করলে, বাবার ভয়ে সে ইশারায় উত্তর দেয়। এমন সময় বাবা ডেকে বলেন, "বাবা আলিফ, আমার সাথে ভাত খাও, আসো।" সে ভাত খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না। আনুমানিক সকাল ৯:৩০ এর দিকে আলিফ বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। বাসা থেকে বের হয়ে আলিফ তার অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়।

৫ আগস্ট ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শেষ দিন। ৬ আগস্ট ২০২৪ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সারা দেশের ছাত্র-নাগরিক-শ্রমিকদের ঢাকায় আসার আহ্বান জানান। যাকে বলা হয় মার্চ টু ঢাকা। তবে আরেক ঘোষণায় এ কর্মসূচি এগিয়ে ৫ আগস্ট ২০২৪ এ নিয়ে আসা হয়। সেদিন স্বৈরাচার সরকার কমপ্লিট শাট ডাউন ঘোষণা করে। ডিজিটাল ক্র্যাক ডাউনের মাধ্যমে সারা দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঢাকার প্রবেশমুখগুলোতে পিস্তল, রাইফেল, সাজোয়াজান ও আধুনিক অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, অবস্থান নেয়। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল স্বৈরাচারের দোসর আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ। সাজোয়াজান ও ট্যাংক দিয়ে রাস্তা আটকে রাখে।

সকল ভয়ভীতি উপেক্ষা করে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করে। উদ্দেশ্য ছিল গণভবন ঘেরাও করে স্বৈরাচার খুনি হাসিনাকে পদত্যাগ করানো।

বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ হিসেবে যশোরের সাধারণ মানুষ রাজপথে নেমে আসে। তাদের প্রতিবাদ মিছিলে ঘাতকেরা আক্রমণ চালায়। পুলিশ সেখানে টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা পিছু হটে না। এরপর শুরু হয় গুলি, গ্রেনেড নিক্ষেপ। পুলিশের গুলিতে আহত হয় শতাধিক নিহত হয় আরও অনেকে। আন্দোলন ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায়।

এদিকে সারাদেশ থেকে মুক্তিকামী মানুষ সকল বাঁধা উপেক্ষা করে ক্রমেই গণভবনের দিকে এগিয়ে আসে। অবস্থা বেগতিক দেখে খুনি হাসিনা পদত্যাগ করে পালিয়ে যায়। পতন ঘটে স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদের।

এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশে আনন্দ মিছিল বের হয়। এ মিছিলে যুক্ত হয় যশোরের সাধারণ জনতা। এ মিছিলে মেহেদী হাসান আলিফও অংশ নেয়। মিছিল নিয়ে চিত্রার মোড় জাবির হোটেল অতিক্রম করার সময় সেখানে অগ্নিকাণ্ড দেখতে পায়। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেকে ভিতরে আটকা পড়ে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের সাথে আলিফও আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে যায়। উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই হোটেলের ভিতরে আটকা পড়ে। আর বের হতে পারে না। দগ্ধ হয়ে প্রাণ যায় মেহেদী হাসান আলিফের।

এদিকে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেলেও ছেলে ঘরে ফিরে না। মা ছেলেকে খোঁজাখোজি শুরু করেন। তার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে, "তোমরা ত চলে আসলে কিন্তু আমার ছেলে ত এখনো আসল না।" ছেলেটি উত্তর দেয়, "চলে আসবে আন্টি, চিন্তা করিয়েন না"। অপেক্ষা করতে করতে আলিফের বাবা ও মা টিভিতে খবর দেখে জানতে পারেন হাসিনার পতনের কথা আর জাবির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের কথা। খবর শুনে তারা আফসোস করতে থাকেন। বিকেল হয়ে গেলেও ছেলের ফিরে না বাসায়। মা চিন্তিত হয়ে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। এলাকারই আরেক শহীদ মাহিরের মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান তার ছেলেও বাড়ি ফেরেনি। এরপর প্রতিবেশি ইউসুফের নিখোঁজের খবর শুনে আরও চিন্তিত হয়ে পড়েন। ছেলের খোঁজে সদর হাসপাতালে। খোঁজা-খুজির এক পর্যায়ে তারা মাহি ও ইউসুফের লাশ দেখতে পান। বুঝার আর বাকি রইল না তাদের ছেলেও আর বেঁচে নেই। একসময় তারা আলিফের লাশ খুজে পান। শরীরের অধিকাংশ অংশ পুড়ে যাওয়া তাকে চিনা যাচ্ছিল না। এদিকে আলিফের কাছে অন্য একজনের ফোন থাকায় আলিফের লাশ তার মা-বাবাকে দিতে অসম্মতি জানায়। অবশেষে অনেক কষ্টে বিভিন্ন উপায়ে পরিচয় নিশ্চিত করে ছেলের মরদেহ বাড়ি নিয়ে আসেন। হাসপাতাল থেকে লাশ নিয়ে এসে তাদের নিজ বাড়িতেই দাফন-কাফন সম্পন্ন করেন। তাকে চাচড়া রাজবাড়ী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি

একমাত্র আদরের ছেলেকে হারিয়ে মা শোকে পাথর। কান্না জড়িত কন্ঠে বলেন, আমার ছেলেটা কখনো নিজের কথা ভাবেনি। সবসময় দেশের কথা দেশের মানুষের কথা ভাবত। তিনি বলেন, একদিন শুয়ে শুয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে?" প্রত্যুত্তরে আলিফ বলে, আমি যদি শহীদ হয়ে যাই, তার বিনিময়ে তোমরা ভালো থাকবে, দেশ ভালো থাকবে। আমার জন্য দোয়া করো।" এতটুকু একটা বাচ্চা ছেলের এমন জবাবে মা মোমেনা বেগম কান্নায় ভেঙে পড়েন। দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি কতটা ভালবাসা থাকলে এমন উত্তর দিতে পারে।

পারিবারিক অবস্থা

মেহেদী হাসান আলিফের বাবা জনাব মো: হারুন অর রশিদ পেশায় একজন ড্রাইভার। তার একমাত্র আয়েই পরিবার চলে। তার মা মোছা: মোমেনা বেগম ডলি। আলিফের একটি ছোট বোন আছে। তার নাম মীম। মীম স্থানীয় একটি স্কুলে ১ম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। জায়গা জমি নেই। ভাড়া গাড়ি চালিয়ে সংসার চালান।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মেহেদী হাসান আলিফ
পেশা	: ছাত্র, ৮ম শ্রেণি
বয়স	: ১৪ বছর
জন্ম তারিখ	: ০৩/১০/২০০৯
জন্ম স্থান	: ঝালোপাড়া, ভার্থকলা, সিলেট
পিতা	: জনাব মো: হারুন অর রশিদ
মাতা	: মোসা: মোমেনা বেগম ডলি
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আগুনে দগ্ধ হন,
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: চাঁচড়া আদর্শ পাড়া, ৫ নং ওয়ার্ড, থানা: সদর থানা জেলা: যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান তৈরি করে দেওয়া।
২। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
৩। শহীদের ছোট বোনের পড়ালেখার ব্যয়ভার বহন করা।

"দেশের জন্য শহীদ হয়ে যাবো তাতে তোমাদের সমস্যা কি? আবু সাইদ মারা যাওয়ার পর তার মা যদি ধৈর্য ধরতে পারে তাহলে তোমরা কেন পারবা না। আমার জন্য তোমরা দোয়া করো।"

শহীদ মো: মেহেদী হাসান

ক্রমিক : ৩৯৪

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১০

শহীদ পরিচিত

যশোর সদরের কারবালা রোডের রাজ টেইলার্সের মালিক। জনাব মো: রুস্তম আলীর ছোট ছেলে মো: মেহেদী হাসান। মেহেদী হাসান পুলেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির একজন মেধাবী ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি মেহেদী বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তিনি জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন ফুলকুঁড়ির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

মেহেদী হাসান জন্মগ্রহণ করেন ২০১২ সালের ২৩ মে। তার জন্মস্থান যশোরের কৃষ্ণবটি গ্রাম। তার পিতার নাম জনাব মো: রুস্তম আলী এবং মায়ের নাম মোসা: মনোয়ারা বেগম। তারা ৪ ভাইবোন।

শাহাদাতের ঘটনা
জুলাইয়ের শুরুতে কোটা সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। সকল শ্রেণি পেশার মানুষ এতে যুক্ত হয়। আন্দোলনে স্বৈরাচার সরকারের হামলা অনেকটা আগুনে ঘি ঢালার মত। সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শহর থেকে গ্রামে, রাজপথ থেকে অলিগলি সবজায়গায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

যশোরেও এর ব্যতিক্রম নয়। যশোরের সাধারণ জনতা রাস্তায় নেমে আসে। তারাও প্রতিটি কর্মসূচিতে অংশ নেয়। বিরত ছিল না ১২ বছরের শিশু মেহেদীও। তার চোখে মুখে ছিল স্বপ্ন। একটি সোনালি প্রভাতের স্বপ্ন। যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না। যেখানে রাত পোহালেই কোনো মায়ের বুক খালি হবে না। যেখানে প্রাণ দিতে হবে না মুগ্ধের মত কোনো স্বপ্নবাজ তরুণকে। তাইতো সে দীপ্ত শপথে এগিয়ে যায়। ঝাপিয়ে পড়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে। বাড়িতে বাবা মায়ের উৎসাহ এবং নিজের প্রতিবাদী

মানসিকতা তাকে নিয়মিত মিছিলে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায়। এদিকে রংপুরে পুলিশের গুলিতে শহীদ আবু সাইদ শহীদ হয়। এ দৃশ্য অন্য সবার মত মেহেদীর মনেও পীড়া দেয়। তখনি তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, প্রয়োজনে নিজের জীবনটাও বিলিয়ে দিব। তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষ করব না।

শহীদ মো: মেহেদী হাসানের গর্বিত মা বলেন, "আমরা তাকে আন্দোলনে যেতে নিষেধ করিনি। আর নিষেধ করলেও সে শুনত না। বলত দেশের জন্য শহীদ হয়ে যাবো তাতে তোমার সমস্যা কি?

বিশেষ করে রংপুরে আবু সাইদ মারা যাওয়ার পর তাকে আর ঘরে আটকে রাখা যেত না। আমাকে বলতো, আবু সাইদ মারা যাওয়ার পর তার মা যদি ধৈর্য ধরতে পারে তুমি কেন পারবা না।? আমার জন্য তোমরা দোয়া করো।"

৫ আগস্ট ২০২৪ দুপুরে স্বৈরাচার পতনের সংবাদ আসার পর মেহেদী বাবার কাছ থেকে ৩০ টাকা নিয়ে পরনের জামা পরেই বেরিয়ে যায়। চাঁচড়া মোড় থেকে সে ছাত্র-জনতার বিজয় মিছিলে যোগদান করে। মিছিল চাঁচড়ার মোড় থেকে শহরের দিকে গেলে মেহেদীও মিছিলের সাথে শহরের দিকে যায়। জাবের হোটেলের সামনে গেলে কিছু লোকজন বলাবলি করে সেখানে বোমা বিস্ফোরণ হবে। বোমা বিস্ফোরণ থেকে বাচতে মেহেদীসহ অনেকে জাবির হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই হোটেলেই অগ্নি বিস্ফোরণ ঘটে। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। তারা সকলেই ভিতরে আটকা পড়ে।

বের হতে না পেরে মেহেদী, সাথের একজনের ফোন থেকে তার মায়ের কাছে ফোন দিয়ে বলেন, "মা আমরা জাবির হোটেলে আটকা পড়ে গেছি। নিচে সব আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। আমি কোনো ভুল করে থাকলে মাফ করে দিও। আর তুমি একটু মামাকে ফোন দাও। হেলিকপ্টার নিয়ে আসতে বলো। আমাদের উদ্ধার করো।" এই ছিল তার সাথে পরিবারের সর্বশেষ কথা। তারপর মেহেদীর মা ঐ নাম্বারে বহুবার চেষ্টা করেও আর যোগাযোগ করতে পারেননি। ছেলের শেষ আবদার হেলিকপ্টার নিয়ে আমাকে উদ্ধার কর। ছেলের শেষ আবদার পূরণ করতে পারল না মা। মায়ের উপর অভিমান করে চিরতরে কথা বলা বন্ধ করে দিল মেহেদী। সেই ফোন কলটির কথা মনে পড়লেই মায়ের অন্তর কেঁপে উঠে।

দাফন
ঘটনার দিন রাত ১১ টায় ফায়ার সার্ভিস এসে ঘটনাস্থল থেকে নিহতদের মৃত দেহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে মেহেদীর মৃতদেহ শনাক্ত করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ৬ আগস্ট জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়ের অনুভূতি
শহীদের মা: ছেলের একটি আবদার পূরণ করতে না পারায় মায়ের সাথে চিরতরে কথা বলা বন্ধ করে দিল। এই দু:খ রাখার জায়গা নেই মায়ের। কানে শুধু একটি কথায় ভেসে আসে, "মা, মামাকে বল হেলিকপ্টার পাঠাতে।" অসহায় মায়ের কি সে সামর্থ্য আছে।

পারিবারিক অবস্থা
মেহেদী হাসানের পিতা একজন দর্জি। তার আয়ের মাধ্যমেই ৫ জনের পরিবারের ভরনপোষণ হয়।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Birth Registration Certificate

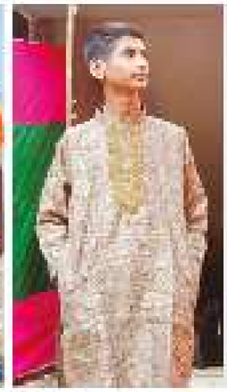

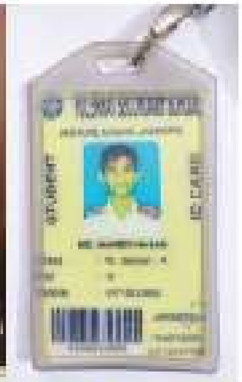

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মেহেদী হাসান
পেশা	: ছাত্র, ৭ম শ্রেণি
বয়স	: ১২ বছর
জন্ম তারিখ	: ২৩/০৫/২০১২
জন্ম স্থান	: কৃষ্ণবাটি, আরবপুর, যশোর
পিতা	: জনাব মো: রুস্তম আলী
মাতা	: মোছা: মনোয়ারা বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪, আগুনে দগ্ধ হন
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কৃষ্ণবাটি, ইউনিয়ন: আরবপুর থানা: সদর থানা জেলা: যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

"আমি যদি মারা যাই তাহলে আমি শহীদ হব। বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হবে।"

শহীদ রোকনুজ্জামান রাকিব

ক্রমিক : ৩৯৫

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১১

শহীদ পরিচিতি

শহীদ রোকনুজ্জামান রোকন ২০০২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার বালিয়া ভেকুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব জাহাঙ্গীর আলম পেশায় একজন রংমিস্ত্রি। তার মা মোসা: রোজিনা বেগম একজন গৃহিণী। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তার ছোট ভাই নাজমুল হাসান দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। পিতার আয়েই সংসার চলত।

শহীদ রোকনুজ্জামান বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে স্বৈরাচারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার। ৫ আগস্ট ২০২৪ আওয়ামী সন্ত্রাসীরা যশোরের চিত্রার মোড়ের জাবের হোটেলে অগ্নিকাণ্ড ঘটায়। কৌশলে সাধারণ মানুষদের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে হত্যা করে। সেখানে আটকা পড়েন রোকনুজ্জামান। আগুনে দগ্ধ হয়ে শহীদ হন রোকনুজ্জামান।

বিস্তারিত ঘটনা

৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক সোনালি দিন। এদিন রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। আর এ ইতিহাসের রুপকার সাধারণ ছাত্র-জনতা। রক্ত দিয়ে তারা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এদিন দেশ ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার এই দেশের মানুষকে সব ধরনের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। সেই ক্ষোভ তিলে তিলে জমা হতে থাকে জনগনের মনে। তারই প্রেক্ষিতে জুলাই মাসজুড়ে চলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একপর্যায়ে রুপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। এই আন্দোলনের সফলতার আসে ৫ আগস্ট ২০২৪। এই সফলতার পিছনে আছে অসংখ্য মানুষের

আত্মত্যাগ, অসহায় মানুষের আর্তনাদ, স্বজন হারানোর বেদনা। জীবন দিয়েছেন কতশত মানুষ। হাত পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন আরও সহস্রাধিক।

তেমনি যশোর এমএম কলেজের ছাত্র রোকনুজ্জামান রাকিবও আন্দোলনের শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন। লাগাতার আন্দোলনে রাজপথে থেকে লড়াই করেছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ৫ই আগস্ট আন্দোলনের জন্য বের হওয়ার পূর্বে তার মা তাকে কারফিউ এর কারনে বের হতে বাঁধা প্রদান করেন। তিনি তখন তার মাকে বলেন, 'দেখো মা এতদিন ধরে আমাদের ছাত্র ভাইয়েরা সবাই একসাথে আন্দোলন করছে। আজকে কোনো একটা সমাধান হবেই ইনশাআল্লাহ। আমরা না গেলে তো হবে না।"

৫ আগস্ট দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের সংবাদ শুনে শহীদ রোকনুজ্জামান বিজয় মিছিলে যোগ দিতে বাসা থেকে বেরিয়ে যায়। মিছিল নিয়ে চিত্রার মোড় জাবির হোটেল অতিক্রম করার সময় সেখানে অগ্নিকাণ্ড দেখতে পায়। আওয়ামী সন্ত্রাসীরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। অনেকে ভিতরে আটকা পড়ে। রোকনের কয়েকজন বন্ধুও সেখানে আটকা পড়ে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যদের সাথে রোকন তার বন্ধুদের উদ্ধার করতে যায়। বন্ধুদের নিয়ে নিচে নামার সময় রোকনুজ্জামানও সিঁড়িতে আটকা পড়ে। অক্সিজেনের অভাবে দম বন্ধ হয়ে সেখানেই মৃত্যু ঘটে রোকনুজ্জামানের।

বিকেল ৫:৩০ টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে। আনুমানিক ১০ টার দিকে রোকনুজ্জামানের পরিবারের কাছে তার লাশ হস্তান্তর করা হয়। সন্তানকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন শহীদের মা রোজিনা বেগম।

দাফন

৬ আগস্ট তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে মালগোপাড়া, বালিয়া ভেকুটিয়ার স্থানীয় কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে নিকটাত্মীয়দের অনুভূতি

শহীদের বাবা বলেন তার ছেলে বারবার বলত, "আমি যদি মারা যাই তাহলে আমি শহীদ হব। আমি শহীদ হলে, বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হবে।"

সহপাঠী সিফাতুল ইসলাম বলেন, "রাকিব প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, সামাজিক কাজে যুক্ত থাকত।"

শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগে মসজিদের ইমাম সাহেবের সাথে রোকনুজ্জামানের কথোপকথন

শাহাদাতের কিছুদিন আগে জুম'আর নামাজে শহীদ রোকনুজ্জামান ইমাম সাহেবকে ছাত্রদের জন্য দোআ করার অনুরোধ করেন। ইমাম সাহেব তাকে বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে কি আমি পারব ছাত্রদের জন্য প্রকাশ্যে দোআ করতে?' তখন রাকিব বলে, "আপনি সরাসরি না পারলেও কৌশলে হলেও ছাত্র ভাইদের জন্য একটু দোআ করে দেন।"

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, JESSORE

SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION, 2018

সরকারী এম এম কলেজ
যশোর
পরিচয়পত্র

JASHORE SHIKSHA BOARD GOVT. MODEL SCHOOL & COLLEGE
Testimonial

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ রোকনুজ্জামান রাকিব
পেশা	: ছাত্র, সরকারি এমএম কলেজ যশোর
বয়স	: ২২ বছর
জন্ম তারিখ	: ২০/০২/২০০২
জন্ম স্থান	: বালিয়া , ভেটকুটিয়া , যশোর
পিতা	: জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম
মাতা	: মোসা: রোজিনা বেগম
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ , আগুনে দগ্ধ হন
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বালিয়া , ভেটকুটিয়া , ইউনিয়ন: আরবপুর থানা: সদর থানা জেলা: যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: ঐ

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা শেষে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া।

'আম্মু হাসিনা পদত্যাগ করেছে।'

\- শহীদ হাফেজ মো: রাসেল রানা (বাশার)

শহীদ মো: রাসেল রানা (বাশার)

ক্রমিক : ৩৯৬

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১২

শহীদ পরিচিতি

শহীদ হাফেজ মো: রাসেল রানা ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে যশোর জেলার সদর থানার দেয়ারা ইউনিয়নের আলমনগর গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে পাশাপোল ডিগ্রি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল। তার পিতা মো: আব্দুল কুদ্দুস (মৃত) পেশায় একজন কৃষক ছিলেন এবং তার মা আঞ্জুআরা বেগম (৪০) পেশায় একজন গৃহিণী। তারা তিন ভাই-বোন। বড় বোন রাবেয়া সুলতানা (২২) তিনি বিবাহিতা। ছোট ভাই মো: তারেক হোসেন তুষার (১৫) দশম শ্রেণির ছাত্র।

ঘটনার সামগ্রিক বর্ণনা

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসজুড়ে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রথমে কোটা বৈষম্যের প্রতিবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকার যখন এই শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশে তার গুন্ডা বাহিনী ছাত্রলীগকে পাঠালেন সমাবেশকে নস্যাৎ করার জন্য তখন সেই গুন্ডালীগ বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের নিরীহ নিরস্ত্র শিক্ষার্থীদের উপর ন্যাক্কারজনক হামলায় মেতে ওঠে। তারা ১০ তলা ছাদের উপর থেকে মিছিলরত নিরীহ শিক্ষার্থীদের উপর ইট, ফুলের টব, পাথর নিক্ষেপ করে পৈশাচিক আনন্দে মেতে ওঠে। উপর থেকে ইট, ফুলের টব, পাথর নিক্ষেপের ফলে একের পর এক মিছিলকারী শিক্ষার্থীদের মাথা ফেটে রক্তের বন্যা বয়ে যেতে থাকে। আহত শিক্ষার্থীদের যখন ঢাকা মেডিকেলে নেয়া হয় সেই সময় তাদের গুন্ডাবাহিনী ছাত্রলীগ, যুবলীগ, এমনকি রাস্তার টোকাই ভাড়া করে হাসপাতালে আহতদের উপর পুনরায় হামলা করে। এমনকি তারা শিক্ষার্থী বোনদের নির্মমভাবে রক্তাক্ত করে। এসময় পুলিশলীগ শুধু নিরব দর্শকের মতো ঠাঁই দাড়িয়ে থাকে।

যার ফলে দেশের আনাচে কানাচে গড়ে ওঠে তীব্র আন্দোলন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা নিজেদের অঞ্চলে আন্দোলন করতে পারে না তারা

নিকটবর্তী মফস্বল বা শহরে গিয়ে হলেও হাল্দো আন্দোলনে যোগ দেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পরে কেননা স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের অত্যাচার সকলের রক্তে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

সেরকমই একজন প্রতিবাদী বীর সৈনিক হাফেজ মোঃ বাশার। যশোর শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে দেয়ারা ইউনিয়নের আলমনগরে বসবাস করত। সেখান থেকে আন্দোলনে যোগদান করা অত সহজ কাজ ছিলনা। পারি দিতে হয় যে অনেক পথ। কিন্তু এই দুর্বার তরুণকে ঠেকায় কে। তার রক্তে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল।তাই সে আর বাসায় বসে থাকতে না পেরে আন্দোলনে যোগদান করতে সকল বাধা পেরোয় এবং প্রতিদিন যোগ দেয় যশোর শহরের আন্দোলনে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী হওয়ায় তার সাথে শিবিরের আরও কিছু কর্মী সাথী তার সাথে প্রতিদিন আন্দোলনে যোগদান করে।

৪ আগস্ট বাসা থেকে বের হতে দেরি হওয়ায় সেদিন আর আন্দোলনে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য হয়নি বাশারের। সে বাসায় ফিরে আসে মনমরা হয়ে। তার মা আঞ্জুয়ারা বেগম তাকে মনমরা দেখে বলে

- তোর কি হয়েছে বাবা? মনমরা হয়ে আছিস কেন?

বাশার বলে

- কিছু না মা এমনিই। কিছু ভালো লাগছেনা।

তার মা তাকে জোড়াজুড়ি করে বললে সে বলে

- আজ আমার সকল সাংগঠনিক ভাইয়েরা আন্দোলনে গিয়েছে মা শুধু আমিই যেতে পারলামনা।
- তার চোখের কোনে পানি জমতে থাকে। এটা দেখে তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে বলে,
- আজ যেতে পারিসনি তো কি হয়েছে, কালকে যাবি।

মায়ের স্বান্তনা পেয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয় বাশার। কিন্তু সারাটা দিন তার অস্থিরতায় কাটে। কোনো সহপাঠী, বন্ধু বা সাংগঠনিক ভাইয়ের খোঁজ সে নিতে পারছিল না।

অবশেষে ৫ আগস্ট সকালে বাশার ছাত্রশিবিরের এক সাংগঠনিক ভাই এবং স্থানীয় মসজিদের ইমামের সাথে আন্দোলনে যায়।

সেদিন ছাত্র-জনতার আন্দোলন অন্যান্য দিনের তুলনায় আরও বেশি তীব্রতর হয়। প্রতিটি শহর মফস্বল, থানা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত আন্দোলনকারীতে ভরে যায়। এত তীব্র আন্দোলনে ভয় পেয়ে পেয়া ছাত্রলীগ আগেই পালিয়ে যায় কিন্তু পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি বাহিনী বৃষ্টির মত গুলি ছুড়তে থাকে। যখন ছাত্র-জনতা এসব গুলিকে তোয়াক্কা না করে গণভবনের দিকে রওয়ানা হয়, তখন খুনী, ভীতু, জালিম শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এই খবর পেয়ে সবাই আনন্দে কান্না করতে থাকে। সকলে বিজয় মিছিল বের করে এবং যারা আগেই মিছিলে ছিল তার গণভবনে গিয়ে আনন্দ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই আনন্দ মিভছিল বের হয়।

এসময় বাশারও আনন্দে কান্না করে ফেলে। আনুমানিক দুপুর ২:৩০টায় সে তার মাকে ফোন দিয়ে আনন্দিত কণ্ঠে বলে

- আম্মু হাসিনা পদত্যাগ করেছে
- তাই নাকি? সত্যি? আলহামদুলিল্লাহ! তুই এখন কোথাই আছিস বাবা?
- আম্মু আমি মিছিলে আছি
- ঠিক আছে দ্রুত বাসায় চলে আয়
- ঠিক আছে আম্মু আমি দ্রুতই আসব

এই বলে ফোন রেখে দেয় বাশার। আনন্দ মিছিলে এক পর্যায়ে বাশারের সাথীরা তাকে হারিয়ে ফেলে। এরপর তার সাথে পরীবারে

আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। সন্ধ্যা ৭ টার দিকে বাশার বাসায় না আসায় তার মা সেই নাম্বারে ফোন দেন যে নাম্বারে দুপুরে তার সাথে কথা হয়েছে, দিয়ে জানতে পারেন যে, বাশার তাদের সাথে নেই। এরপর পরিবার এবং আন্দোলনকারীরা বাশারকে খুঁজতে থাকে। ইমাম এবং তার সহপাঠী সাথী হাসপাতালে খুঁজতে গিয়ে এক পর্যায়ে স্থানীয় তাকে মর্গে শণাক্ত করে। জানা যায় জাবের হোটেলের অগ্নিকান্ডে তাকে মৃত উদ্ধার করা হয়েছে। তার পোড়া লাশ দেখে মা এবং ছোট ভাই ঠিক থাকতে পারেনি। তার মা অজ্ঞান হয়ে যায় আদরের সন্তানকে হারিয়ে।

জানাযা গোসল করিয়ে, কাফন পড়িয়ে অবশেষে আলমনগরে বাশারের জানাযা হয়। পারিবারিক কবরস্থানেই তাকে কবরস্থ করা হয়।

তার সহযোদ্ধাদের মন্তব্য

তার সহযোদ্ধা ও স্থানীয় মসজিদের ইমাম বলেন," বাশারবেকজন নির্ভীক ছেলে ছিল। নিয়মিত নামাজ পড়ত। সবসময় সে সামাজিক কাজে নিয়োজিত থাকত। সে কোরানের হাফেজ ছিল এবং বেশ কয়েকবার তারাবির নামাজও পড়িয়েছে সে।

পরিবারের বর্তমান অবস্থা

তাদের পরিবারে বর্তমানে আয় রোজগার করার মতো কেউ নেই। প্রথমত সন্তান হারানোর কষ্ট, দ্বিতীয়ত আর্থিক অভাব অনটনের মাঝেই দিন কাটাচ্ছে বাশারের পরিবার।

পারিবারিক অবস্থা

বাশারের বাবা একজন দরিদ্র কৃষক ছিলেন। তিনি দুই বছর আগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এতে পরিবারটিকে বিপাকে পড়তে হয়। পরিবারে বাশারের একটি ছোটভাই আছে। বড়বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাশারে বাবা মারা যাওয়ার আগে কৃষি কাজ করে হাজার দশেক টাকা মাসে ইনকাম করে কোনোমতে সংসার চালাতেন। কিন্তু ওনার মৃত্যুর পরে পরিবারে আয়-রোজগার করার মত কেউ ছিল না। এমতাবস্থায় বাশারকেই পরিবারের হাল ধরতে হয়। যেহেতু বাশার একজন কোরআনের হাফেজ ছিল এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ছিল তাই অনায়াসেই সে তারাবী নামাজ পড়িয়ে এবং কোরআন পড়িয়ে যে হাদিয়া পেত, তাই দিয়েই সংসারে আর্থিক সাহায্য করার চেষ্টা করেন।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: হাফেজ মো: রাসেল রানা
জন্ম তারিখ	: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বাবার নাম	: মো: আব্দুল কুদ্দুস
মায়ের নাম	: আঞ্জুআরা বেগম
পেশা	: ছাত্র (পাশাপোল ডিগ্রি কলেজ, দ্বাদশ শ্রেণি)
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-আলমনগর, ইউনিয়ন : দেয়ারা, থানা : সদর, জেলা: যশোর
স্থায়ী ঠিকানা	: ঐ
পরিবারের সদস্য	: ৩ জন, (মা এবং ছোট ভাই)
ঘটনাস্থল	: জাবের হোটেলের অগ্নিকান্ড
ঘটনা ও মৃত্যুর তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার ব্যয় বহন করা এবং পড়াশোনা শেষে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেওয়া

শহীদ মো: আলামিন বিশ্বাস

ক্রমিক : ৩৯৭

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১৩

পরিচয়

মো: আলামিন বিশ্বাস ২০০৪ সালের ১১ মে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় ছিলেন ছাত্র, আব্দুর রাজ্জাক কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী। পৈতৃকভূমি যশোর সদরের আরবপুর ইউনিয়নের সুজলপুর গ্রামে। পিতা মো: আলমগীর হোসেন, পেশায় একজন রিকশাচালক। মাতা মোসা: মমতাজ বেগম, পেশায় গৃহিণী। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন আলামিন।

শহীদী মৃত্যুর প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট, ২০২৪। বাংলাদেশিরা পেল দ্বিতীয়বারের মত স্বাধীন হওয়ার সুযোগ। প্রায় ১৬ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট সরকার দেশটাকে চেটেপুটে খাচ্ছিলো, মানুষের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছিল। এদিন ছাত্র-জনতার 'রোড মার্চ টু গণভবনে' ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাড়াহুড়ো করে পদত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করেন বিগত সরকার প্রধান। এসময় সবাই যখন আনন্দ মিছিলে ব্যস্ত, তখনও দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে জালিম সরকারের দোসরেরা পরাজয় মেনে না নিয়ে আক্রমণ করেই যাচ্ছিলো। ঠিক এমনই এক আক্রমণের শিকার আলামিন বিশ্বাস।

৫ তারিখ বিকালে বাবার কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়ে বাসা থেকে বের হয় আলামিন। সে যাদের সাথে আন্দোলনে যেত, তাদের সাথে না গিয়ে অন্য কারো সাথে যায় সেদিন। এরপর পরিবারের সাথে তার আর কোন যোগাযোগ হয়না। আনুমানিক বিকাল ৫টার দিকে তার কিছু বন্ধু এসে জানায় যে আলামিন তাদের সাথে যাওয়ার কথা থাকলেও যায়নি। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আলামিন তাদের একজনকে ফোন করে বলে, "বন্ধু আমাকে বাঁচা।"

এরপর আলামিনের পরিবার তাকে হন্যে হয়ে খোঁজা শুরু করে, আশেপাশের বাসা, আলামিন যেখানে যেখানে যেত, আশেপাশের হোটেল, হাসপাতাল সবই দেখা হয়। কিন্তু আলামিনের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। একজনের পরামর্শে মর্গে খোঁজ নিয়ে তাকে খুঁজে পান তার মা। আনুমানিক রাত ১০টায় তাকে সনাক্ত করা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলামিন বিশ্বাসকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসীব করুন।

শহীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

আলামিনের বাবা বাসের হেল্পার হিসেবে কাজ করতেন। করোনাকালীন সময় একটি অ্যাক্সিডেন্টে তার ডান পা ভেঙে যায়। পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে তার পায়ের হাড় জোড়া লাগলেও একটি পা আরেকটি পা থেকে ২ ইঞ্চি ছোট হয়ে যায়। ফলে তার পক্ষে পূর্বের কাজটি আর চলমান রাখা সম্ভব হয় না। বর্তমানে তিনি অটোরিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। আলামিনের মা আয়েশা ফাউন্ডেশনে স্বল্প বেতনে চাকুরি করেন। তাদের দুইজনের আয় দিয়েও পরিবার চালানো দুরূহ হয়ে যায়।

একমাত্র ছেলে আলামিনকে নিয়ে তার বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল-ছেলে পড়ালেখা শিখে মানুষের মত মানুষ হবে, ভালো চাকরি করবে, তাদের অভাব ঘুচবে। আলামিনের মৃত্যুতে সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

নিকটাত্মীয়/ প্রতিবেশীর মন্তব্য

শহীদ আলামিনের চাচা মো: বেল্লাল হোসাইন বলেন, "আলামিনের মা-বাবার প্রত্যাশা ছিল একমাত্র ছেলেকে পড়ালেখা করিয়ে বড় কিছু বানাবেন। তার পড়ালেখায় যেন কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটে, তাই তাকে পরিবার থেকে অর্থ উপার্জনের জন্য কোন চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। ছেলে হিসেবে আলামিনকে সবাই পছন্দ করতো, ভালোবাসতো।"

স্থানীয় এলাকাবাসীও আলামিনকে অনেক ভালোবাসতেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও নীতি-নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন এবং তার আচার-ব্যবহার এলাকায় প্রশংসিত ছিল।

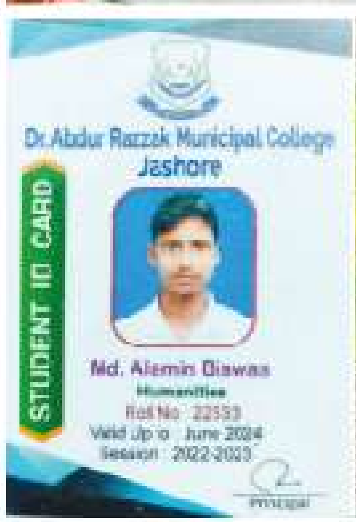

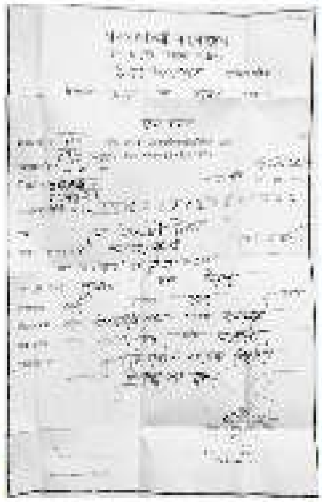

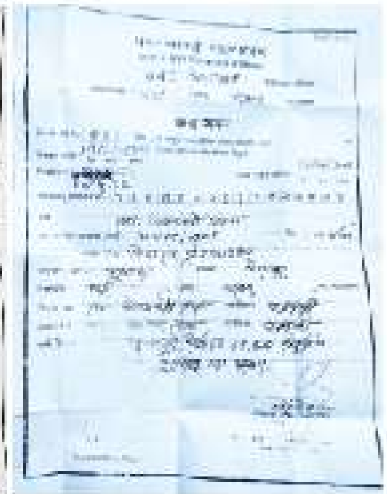

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: আলামিন বিশ্বাস, জন্ম: ১১ মে ২০০৪
পেশা	: ছাত্র
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: সুজলপুর, ইউনিয়ন: আরবপুর, থানা: সদর, জেলা: যশোর
বর্তমান ঠিকানা	: গ্রাম: সুজলপুর, ইউনিয়ন: আরবপুর, থানা: সদর, জেলা: যশোর
পিতার নাম	: মো: আলমগীর হোসেন
মাতার নাম	: মোসা: মমতাজ বেগম
পরিবারের সদস্য	: ২ জন
ঘটনার স্থান	: জাবের হোটেল, চিত্রা মোড়, যশোর
আক্রমনকারী	: অজ্ঞাত
মৃত্যুর তারিখ ও সময়	: ০৫/০৮/২০২৪ ইং
কবরস্থান	: কারবালা কবরস্থান

পরামর্শ

১। পরিবারকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান ও নিয়মিত মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা

২। শহীদের বাবার স্থায়ী ব্যবসা করার ব্যবস্থা করা

“কিসের গ্যাঞ্জাম? গ্যাঞ্জাম হলে আমি চলে আসব?”
-এটাই ছিল মায়ের সাথে শেষ কথা

শহীদ মো: তারেক রহমান

ক্রমিক : ৩৯৮

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১৪

শহীদ পরিচিতি

তারেক রহমান ১৯৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জনাব মো: ওলিয়ার রহমান সাবেক চেয়ারম্যান। বর্তমানে বার্ধক্যজনিত কারনে শয্যাশায়ী। তার মাতা মোসা: নুরুন নাহার বেগম, বয়স ৬০ বছর। শহীদ তারেক রহমান পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। অনার্স শেষ করার পর কোনো চাকরির ব্যবস্থা না করতে পেরে স্থানীয় বাজারে একটি বিকাশের দোকান দেন। তার ক্ষুদ্র আয়েই সংসার চলত।

তার স্ত্রীর নাম মোসা: আফিমা খাতুন। তার ঘরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। তার ছেলে আরাফ রহমানের বয়স ৩ বছর এবং মেয়ে অনিজ ফাতেমার বয়স ১০ মাস।

৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার হাসিনা দেশ ছেড়ে পালালে সারা দেশে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। সেদিন বিকেলে যশোরের চিত্রার মোড়ে জাবির ইন্টারন্যাশনাল পাঁচ তারকা হোটেলে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। সেখানে ১৪ তলা হোটেলে শতাধিক মানুষ আটকা পড়ে। আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে যান শহীদ তারেক রহমান। উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই আটকা পড়েন। প্রচণ্ড আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান শহীদ তারেক রহমান।

তারেক রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যু

৫ আগস্ট ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক সোনালি দিন। এদিন রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। আর এ ইতিহাসের রুপকার সাধারণ ছাত্র-জনতা। রক্ত দিয়ে তারা এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এদিন দেশ ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার এই দেশের মানুষকে সব ধরনের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। সেই ক্ষোভ তিলে তিলে জমা হতে থাকে জনগনের মনে। তারই প্রেক্ষিতে

জুলাই মাসজুড়ে চলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন একপর্যায়ে রুপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। এই আন্দোলনের সফলতায় আসে ৫ আগস্ট ২০২৪। এই সফলতার পিছনে আছে অসংখ্য মানুষের আত্মত্যাগ, অসহায় মানুষের আর্তনাদ, স্বজন হারানোর বেদনা। জীবন দিয়েছেন কতশত মানুষ। হাত পা হারিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন আরও সহস্রাধিক।

তেমনি যশোর বিকাশ ব্যবসায়ী জনাব মোঃ তারেক রহমানও আন্দোলনের শুরু থেকেই সোচ্চার ছিলেন। লাগাতার আন্দোলনে রাজপথে থেকে লড়াই করেছেন বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

৫ আগস্ট দুপুরে বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তারেকের মা বলেন, অসুস্থ বাবাকে গোসল করিয়ে তারপর বাইরে যাও। জবাবে তারেক বলেন,

-একথা আগে বলবা না? আমি তো বের হচ্ছি।
-কোথায় যাচ্ছ?
-যশোর যাচ্ছি
-আজকে যশোর যাচ্ছো? যশোরে তো গ্যাঞ্জাম।
-কিসের গ্যাঞ্জাম? গ্যাঞ্জাম হলে আমি চলে আসব না?

এই বলে তারেক বের হয় যশোরের উদ্দেশ্যে।

বিজয় মিছিল নিয়ে যখন ছাত্র-জনতা চাচড়ার মোড় অতিক্রম করে। মিছিলের পিছন দিক থেকে দুর্বৃত্তরা পেট্রোল দিয়ে জাবির ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের ১৪ তলা বিল্ডিং এ আগুন দেয়। মুহূর্তেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে আটকা পড়ে অনেক মানুষ। সবাই চিল্লাচিল্লি শুরু করে। চিল্লাচিল্লি শুনে ছাত্ররা এগিয়ে যায় আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে।

আটকে পড়া মানুষকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যান শহীদ তারেক রহমানও। উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেই আটকা পড়েন। একজন বিদেশী নাগরিকসহ মোট ২৪ জন মারা যান সেখানে। আহত হন শতাধিক। ঘটনার দিন রাত ১১ টায় ফায়ার সার্ভিস এসে ঘটনাস্থল থেকে নিহতদের মৃত দেহ উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃতদের হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে তার পরিবার

সারাদিন তারেকের অপেক্ষায় থাকেন। দিন পার হয়ে যায় কিন্তু ছেলেকে দেখতে না পেয়ে চিন্তায় পড়েন মা। সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলের জন্য অপেক্ষা করেন মা। বেশ কয়েক জায়গায় ফোন করেও কোনো সন্ধান মেলে না। ফজরের সময় মা ছেলের স্ত্রীকে বলেন, "আমার মনি (তারেক) মনে হয় বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ঠিকই বাড়ি আসত।"

সকাল হয়ে গেলেও ছেলে আর বাড়ি ফেরে না। মায়ের মন কি আর মানে! পরিবারের লোকজনদের নিয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে। সাথে এলাকাবাসীও যুক্ত হয়। শহরের অলিতে গলিতে খোঁজাখোজি করে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় লোকজন পরামর্শ দেন হাসপাতালে খোঁজ নিতে।

অবশেষে হাসপাতালের মর্গে গিয়ে ছেলেকে খোঁজে পান। আগুনে পুড়ে বিকৃত অবস্থা হয়ে যায় তারেকের লাশ। মরদেহ উদ্ধার করে নিজ গ্রামে দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে মায়ের অনুভূতি

তারেকের মা জানান তাদের ইচ্ছে ছিল, ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকুরি করাবেন। কিন্তু তারেকের অনার্স পাশ করার পর কোনো ধরনের চাকরী না পেয়ে স্থানীয় বাজারে একটি বিকাশ এর দোকান পরিচালনা করা শুরু করেন।

পারিবারিক অবস্থা

শহীদ তারেক রহমানের পিতা জনাব মো: ওলিয়ার রহমান সাবেক চেয়ারম্যান। বর্তমানে বার্ধক্যজনিত কারনে শয্যাশয়ী। তার মাতা মোছা: নুরুন নাহার বেগম, বয়স ৬০ বছর। শহীদ তারেক রহমান পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। অনার্স শেষ করার পর কোনো চাকরির ব্যবস্থা না করতে পেরে স্থানীয় বাজারে একটি বিকাশের দোকান দেন। তার ক্ষুদ্র আয়েই সংসার চলত।

তার স্ত্রীর নাম মোছাঃ আফিমা খাতুন। তার ঘরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। তার ছেলে আরাফ রহমানের বয়স ৩ বছর এবং মেয়ে তানিজ ফাতেমার বয়স ১০ মাস। তার পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো আর কেউ রইল না।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: শহীদ মো: তারেক রহমান
পেশা	: বিকাশের দোকানদার
বয়স	: ২৭ বছর
জন্ম তারিখ	: ১০/০১/১৯৯৬
জন্ম স্থান	: গ্রাম: কল্যানপুর , ইউনিয়ন: নরেন্দ্রপুর , থানা: সদর থানা , জেলা: যশোর
পিতা	: জনাব মো: ওলিয়ার রহমান
মাতা	: মোসা: নুরুন্নাহার
আহত হওয়ার তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪ , জাবির হোটেল অগ্নিকাণ্ডে আগুনে দগ্ধ হন
শাহাদাতের তারিখ	: ৫ আগস্ট ২০২৪
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কল্যানপুর , ইউনিয়ন: নরেন্দ্রপুর , থানা: সদর থানা , জেলা: যশোর

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। ছোট দুই সন্তানের জীবনধারণের এবং পড়াশোনার সমস্ত ব্যয় বহন করা

৩। শহীদের বৃদ্ধ পিতার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করা

শহীদ মো: সিফাত হোসেন ফেরদৌস

ক্রমিক : ৩৯৯

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১৫

শহীদের পরিচয়

জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে শুরু হওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন এক পর্যায়ে পরিণত হয় একদফা আন্দোলনে। শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, দমন-পীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। সরকার এই আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করলেও ছাত্র-জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধ এবং একতাবদ্ধ লড়াই একসময় গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। অবশেষে, ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে দেশজুড়ে ছাত্রদের তুমুল আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই অভ্যুত্থানে প্রাণ হারান বহু সাহসী তরুণ। যাদের মধ্যে শহীদ মো: সিফাত ফেরদৌস অন্যতম। সিফাতের দুই বোন–পারভীন সুলতানা দিপ্তি (৩০) এবং নাসরিন সুলতানা সুমি (২৭) বিবাহিত। সিফাত ছিল পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান এবং তার মা রওশনারা বেগমের আশ্রয়স্থল। শহীদ সিফাত ফেরদৌসের পরিবারে আয়ের উৎস ছিল তার প্রয়াত বাবা শহিদুল ইসলাম, যিনি ব্যাংকে চাকরি করতেন। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। সিফাতের মা রওশনারা বেগম আত্মীয়স্বজনের সহায়তায় সংসার চালিয়ে আসছিলেন। দুই বোন বিবাহিত হওয়ায় সিফাতই ছিলেন মায়ের শেষ ভরসা।

যেভাবে শহীদ হয়

৫ই আগস্ট সকাল ১০টার দিকে সিফাত তার সহপাঠীদের সাথে যশোর শহরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। স্থানীয়দের কাছে থেকে জানা যায় কারফিউ চলাকালীন তারা একসাথে না গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে শহরে গিয়ে পৌছায় । বিকেলে ৩ টার দিকে সিফাতের মা তার চাচাকে জানায় যে সিফাত যশোর গেছে এখনও ফিরেনি। তখন চাচা তাকে ২/৩ বার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সে কোন রিসিভ করেনা। পরে চাচা মোটরসাইকেল যোগে যশোর শহরে গিয়ে সিফাতের খোঁজ করতে থাকেন। জাবের হোটেলে অগ্নিকান্ডের ঘটনা জেনে সেখানে গিয়েও তার খোঁজ করেন। এক পর্যায়ে সিফাতের ফুফাতো ভাই তাকে খবর দেয় সিফাত সদর হাসপাতালের মর্গে আছে। তিনি মর্গে গিয়ে অনেক খোঁজাখুজি করে তার খোজ পান। থানা এবং সদর হাসপাতালে ফর্মালিটি শেষ করে মর্গে ঢুকে সিফাতকে সনাক্ত করেন । রাত ৯.৩০ এর দিকে তাকে এম্বুলেন্সযোগে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। পরদিন সকালে জানাজা ও দাফন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

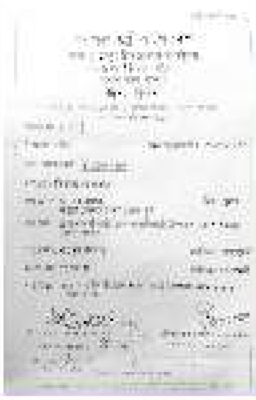

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম	: মো: সিফাত ফেরদৌস (২২)
পেশা	: শিক্ষার্থী
ঠিকানা	: শাখারীগাতি, ৬নং নরেন্দ্রপুর, যশোর সদর, যশোর
জন্ম তারিখ	: ০৭/০২/২০০২
পিতা	: মৃত শহিদুল ইসলাম
পিতার পেশা	: ব্যাংকে চাকরি করতেন
মাতার নাম	: মোছা: রওশনারা বেগম (৫০)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের বোন	: ১) পারভীন সুলতানা লিপি (৩০)
	২) নাসরিন সুলতানা সুমি (২৭)
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫ জন

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। শহীদের মায়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা

শহীদ এম এম তৌহিদুর রহমান

ক্রমিক : ৪০০

আইডি : খুলনা বিভাগ ০১৬

শহীদের পরিচয়

৫ আগস্ট ২০২৪ সাল, বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে দেশের জনগণের ওপর চেপে বসা স্বৈরাচারী সরকারের অবসান ঘটে এই দিনে। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার সরকার বহুদিন ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে জনগণকে শাসন করে আসছিল। বিশেষ করে তরুণ সমাজ, ছাত্র-জনতা এবং সাধারণ মানুষ শোষণ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছিল। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া গণ-আন্দোলন পরবর্তীতে সরকার পতনের একদফা দাবিতে রূপ নেয়। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের দিন ছিল যেমন আনন্দের, তেমনই বেদনারও। এই দিনে সরকারের মরণ কামড় হিসেবে শত শত মেধাবী কিশোর ও তরুণদের হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে শহীদ এম এম তৌহিদুর রহমান ছিলেন একজন সাহসী তরুণ, যিনি স্বাধীনতার বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাতবাড়িয়া ইউনিয়নের শহীদ তৌহিদুর রহমান সাভারের আশুলিয়া এলাকায় একটি গার্মেন্টসে কর্মরত ছিলেন। তৌহিদের জন্ম ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসের ৮ তারিখে যশোর জেলার কেশবপুর অন্তর্গত ভালুকপুর গ্রামে। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, যিনি তার স্ত্রী, মেয়ে এবং বাবা-মায়ের দায়িত্ব পালন করতেন। তৌহিদুর রহমানের পরিবারে তার বাবা-মা, স্ত্রী নাসরিন আক্তার এবং একটি ছোট্ট কন্যা সন্তান রয়েছে। তার ভাই মো: জাহিদ হাসান গার্মেন্টস শ্রমিক। হিসেবে কাজ করেন। তৌহিদুরের মৃত্যুতে পরিবারে ভীষণ শূন্যতা তৈরি হয়েছে।

যেভাবে শহীদ হয়

শহীদ এম এম তৌহিদুর রহমান সাভারের আশুলিয়া এলাকায় একটি গার্মেন্টস এ চাকুরীর সুবাদে থাকতো। শাহাদাতের দিন ৫ আগস্ট তার বাবার সাথে কথা হয়, বলে যে সরকারের পতন হয়েছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সে বিজয় মিছিলে অংশ নিবে। এর আগেও দেশের পরিস্থিতির কথা বাবাকে বলতো প্রায় সময়, বার্ধক্যজনিত বাবা সবকিছু খেয়াল রাখতে পারতোনা বা মনেও থাকতো না। সেদিন বিকেলে তার সাথে বাবা এবং মায়ের শেষ কথা হয়, বিজয় মিছিলের অনেক শব্দ থাকায় সে দ্রুত দোয়া চেয়ে ফোন রেখে দেয়। এর পর আর যোগাযোগ না হওয়ায় ঢাকায় অবস্থানরত তৌহিদুর এর বড়ভাই এর সাথে তার বাবা যোগাযোগ করে তৌহিদূরকে খুঁজতে বলে। আনুমানিক রাত ১২ টার দিকে তার ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। অপর প্রান্ত থেকে এক মহিলা জানান যে সাভার থানার সামনে তিনি এই ফোনটি রাস্তায় খুজে পেয়েছেন। এই শুনে তৌহিদুরের বাবা তার ভাইকে জানালে তারা তৌহিদুর এর সন্ধান করতে বিভিন্ন হাসপাতাল ও সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোজ নিতে থাকেন। ফেসবুকে ঘুরে বেড়ানো সাভার এনাম মেডিকেল এ দুইটি অজ্ঞাত পরিচয়ের লাশের ছবি দেখে তার কিছু আত্মীয় তাকে সনাক্ত করে এবং হাসপাতাল থেকে সকালে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সংশ্লিষ্ট একজনের ভিডিওর একটা অংশে দেখা যায় আনুমানিক ৫টার দিকে বিজয় মিছিল শেষে বাসায় ফিরার পথে আশুলিয়া থানার বাইপাইল এলাকায় বিপথগামী কিছু পুলিশের এলোপাথাড়ি গুলির শিকার হন তৌহিদুর রহমান। সাথে সাথে তাকে তার সাথীরা হাসপাতালে নিয়ে যান এবং কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষনা করেন। উদ্ধারকৃত তৌহিদুরের ফোন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার সেদিনের বিজয় মিছিল, আহত ও নিহত অবস্থায় বেশ কিছু ছবি ভিডিও পাওয়া গেছে।

পরদিন বাদ আছর তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং ভাণ্ডুকঘর উত্তরপাড়া জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মো: মাহিদুর রহমান তার জানাজার নামাজ পড়ান। নামাজ শেষে তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে বাবার মন্তব্য

তৌহিদুর রহমানের বাবা আব্দুল জব্বার মোল্লা জানান যে, ঘটনার কিছুদিন আগে তৌহিদুর তার স্ত্রী ও মেয়েকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বাবা জানতে চাইলে সে বলেছিল যে, ঢাকার পরিস্থিতি ভালো নয়, তাই তাদের নিরাপত্তার জন্য গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার তাদের ঢাকায় নিয়ে আসবে বলে জানিয়েছিল।

ব্যক্তিগত প্রোফাইল

নাম : এম এম তৌহিদুর রহমান (২৮)
পেশা : গার্মেন্টস কর্মী
ঠিকানা : ভালুকঘর, সাতবাড়িয়া, কেশবপুর, যশোর
জন্ম তারিখ : ০৮/০৮/১৯৯৬
পিতা : মো: আব্দুল জব্বার মোল্লা (৬১)
পিতার পেশা : কৃষি
মাতার নাম : মোসা: রাশিদা বেগম (৫০)
মাতার পেশা : গৃহিণী
শহীদের মেয়ে : আয়েশা আক্তার (০২)

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।
২। শহীদের একমাত্র কন্যা সন্তানের জীবনধারণের এবং পড়াশোনার সমস্ত ব্যয় বহন করা।
৩। শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

“বেঁধে রেখে লাভ নাই, উড়তে দিয়ে দেখ; দিনশেষে যদি ফিরে আসে, তবে না হয় আটকে রেখো।”

শহীদ মো: ইমতিয়াজ আহম্মেদ জাবির

ক্রমিক: ৪০১

আইডি: খুলনা বিভাগ ০১৭

শহীদের পরিচয়

শহীদ মো: ইমতিয়াজ আহম্মেদ জাবিরের খাতায় লেখা এই লাইনটি ছিল তার জীবনের শেষ কিছুদিনের উপলব্ধি, যা গুলিবিদ্ধ হওয়ার দুইদিন আগে তিনি লিখেছিলেন। এই লাইন শুধুমাত্র একটি অনুভূতির প্রকাশ নয়, বরং তার স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। জাবির ছিলেন একজন সাহসী যুবক, যিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষকে নিজের মতো করে বাঁচতে দেওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশত, ২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য এই স্বাধীনতার পথেই তাকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয়।

২০২৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট কোটা পদ্ধতি পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেয়, যার ফলে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দীর্ঘদিনের আন্দোলন নতুন করে জোরদার হয়। দেশের তরুণ প্রজন্ম আন্দোলনের পথে নামে এবং জুলাইয়ের শুরুতেই বিক্ষোভ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্রদের এই উত্তাল আন্দোলনের মাঝপথে ১৫ জুলাই ছাত্রলীগের সদস্যদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি আরও অস্থির হয়ে ওঠে। পরবর্তী দিনগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী- পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি এবং ক্ষমতাসীন দলের মদদপুষ্ট ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা সহিংসভাবে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে। ১৮ জুলাই থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়, এই সময়ের মধ্যে ব্যাপক সহিংসতা এবং গণহত্যা সংঘটিত হয়। জাবির ছিলেন রাজধানীর সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির বিবিএ-৬৫তম ব্যাচের একজন মেধাবী ও আদর্শবান ছাত্র, যিনি সবসময় ন্যায়ের পথে চলতেন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পিছপা হতেন না। সাহসী ও দৃঢ় নীতিতে বিশ্বাসী এই তরুণ তার নেতৃত্বগুণের জন্যও বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত ছিলেন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে তিনি সাহসিকতার পরিচয় দেন এবং নিজের দায়িত্ববোধ থেকে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

জাবিরের পরিবারে বাবা মা এবং একটি বোন রয়েছে। তার বাবা একজন কৃষক এবং পোল্ট্রি ফার্মের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সীমিত হলেও জাবিরের মেধা ও নৈতিকতা তাকে পরিবারের একটি বড় আশা ও সম্ভাবনা হিসেবে গড়ে তুলেছিল।

যেভাবে শহীদ হয়

১৯ জুলাই ২০২৪ শুক্রবার, তিনি জুমার নামাজের পর মিছিলে যোগ দেন। কিছুক্ষণ পর তার মামা ইসতিয়াক আহমেদকে অপরিচিত এক লোক ফোন করে বলেন, জাবির অসুস্থ এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, জাবির আসলে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল ছিল বনশ্রী সি ব্লক, যেখানে পুলিশের ছোড়া গুলিতে জাবির গুরুতরভাবে আহত হয়। একটি গুলি তার অণ্ডকোষ ভেদ করে বাম পায়ের উরুতে বিদ্ধ হয়।

আহত অবস্থায় তাকে বনশ্রী হাসপাতাল থেকে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে দুইদিন আইসিইউতে থাকার পর তার শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। পরবর্তী সময়ে তার চিকিৎসার জন্য তাকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় তার পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পর চিকিৎসকরা পা কাটার সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। তবে কিছুদিনের মধ্যে কিডনির ক্রিয়েটিনিন মাত্রা বেড়ে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৬ জুলাই ২০২৪ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর দ্রুত দাফনের জন্য প্রশাসনের লোকেরা চাপ সৃষ্টি করে বলেও জানা যায়।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদ জাবির সম্পর্কে তার বাবা বলেন, "জাবির অনেক মেধাবী ছিল। সে ৫ম শ্রেনীতে বৃত্তি পেয়েছে এবং SSC এবং HSC তে তার রেজাল্ট অনেক ভাল।" তিনি বলেন জাবির তার কাছে দোয়া চাইতো এবং সে খুব শীঘ্রই বাড়ি আসার কথা ছিল ।

জাবির এর মামা ইসতিয়াক আহমেদ জানান, জাবির বাড়ি আসার জন্য টিকেট কেটেও বাড়ি আসতে পারেনি। সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য খুব উদগ্রীব হয়ে থাকতো। এক পর্যায়ে জাবিরের মেসের বড় ভাই তাকে মানা করলে সে বলে, "আমি কি বাসায় চুড়ি পড়ে বসে থাকবো?" জাবিরের মামা আরও জানান, জাবির শেষ মুহূর্তে মামাকে জড়িয়ে ধরে অনেক অনুনয় করেছিল বাঁচার জন্য। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

একনজরে শহীদের পরিচয়

পূর্ণ নাম	: মো: ইমতিয়াজ আহম্মেদ জাবির
পেশা	: শিক্ষার্থী। বিবিএ-৬৫, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
ঠিকানা	: দেউল, ইউনিয়ন: থানা: ঝিকরগাছা, এলাকা: হাজিরবাগ, জেলা: যশোর
জন্ম তারিখ	: ১৭/১০/২০০৪
পিতা	: নওশের আলী (৫৬)
পিতার পেশা	: কৃষি
মাতার নাম	: শিরিনা আক্তার (৪০)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের বোন	: জেরিন (১৯)
পেশা	: শিক্ষার্থী। এইচএসসি, আখিলউদ্দীন ডিগ্রি কলেজ
পারিবারিক আয়	: ১৫০০০ টাকা
আয়ের উৎস	: কৃষি

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

শহীদ সাকিব (সাকিবুল হাসান সাকিব)

ক্রমিক: ৪০২

আইডি: খুলনা বিভাগ ০১৮

শহীদের পরিচয়

সাকিবুল হাসান সাকিব ছিল বিদ্রোহী কিশোর। আওয়ামী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছিল তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাছাড়া বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোই ছিল তার স্বভাব। কোটা আন্দোলনের প্রথম থেকেই সাকিব ছিল সক্রিয়। একটা প্ল্যাকার্ড হাতে তাকে মিছিলের অগ্রভাগেই দেখা যেত। প্ল্যাকার্ডে লাল ও কালো কালিতে লেখা-

লাশের ভেতর জীবন দে
নইলে গদি
ছাইড়া দে

শহীদ সাকিবুল হাসান সাকিব ছিল তার পরিবারের একমাত্র অবলম্বন। ছেলে বড় হয়ে মানুষের মতো মানুষ হবে, চাকরি করবে সংসারের হাল ধরবে এরকমই ভাবনা ছিল তার পিতামাতার। শহীদ সাকিবুল হাসান সাকিব ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের ২৭ তারিখে যশোরের শংকরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পড়ালেখা করত বি এম এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। পিতা মো: আলাল উদ্দীন (৪৬) একজন শ্রমিক। মাতা মোছা: শিল্পী আকতার (৩৯) একজন গৃহিণী। বোন মোমতাহিনা তিসা (১৪) ইসলামিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী।

যেভাবে শহীদ হয়

২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে থাকবে। দেশের তরুণ প্রজন্ম নিজেদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রামে নেমেছিল, এটি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদী ও ন্যায্য লড়াই। ২০২৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট "কোটা পদ্ধতি" পুনর্বহালের নির্দেশ দিলে এই আন্দোলন নতুন করে সূচনা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রসমাজ এবং সাধারণ জনগণ পথে নেমে আসে। তাদের দাবি ছিল ন্যায্য। তারা চেয়েছিল একটি সমতা ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যেখানে মেধা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরিতে সুযোগ পাওয়া যাবে। আন্দোলন চলাকালীন সরকারীদলের নির্মম অত্যাচার ও গণহত্যা চালালে ছাত্রদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন এক পর্যায়ে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। তীব্র আন্দোলনের মুখে হাসিনা সরকার ৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পদত্যাগে বাধ্য হয় এবং সারাদেশ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। সারাদেশে পাড়ায় পাড়ায় জেলা উপজেলায় বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। যশোরে ছাত্রদের বিজয় মিছিলের চলাকালীন ঘটে যায় মর্মান্তিক এক অগ্নিদুর্ঘটনা। যেখানে শহীদ হন সাকিবুল হাসান সাকিব।

বি এম এস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাকিব ছিলেন একজন উজ্জ্বল এবং সাহসী ছাত্র। যিনি মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যশোরের শংকরপুর এলাকায় বসবাসকারী এই তরুণের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে দেশের সেবা করা। কিন্তু তার স্বপ্ন থেমে যায় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়, যখন তিনি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেন।

সাকিব ছিল তার পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান এবং তার উপর তার বাবার অনেক আশা-ভরসা ছিল । বাবা মোঃ আলাল উদ্দিন ছিলেন একজন শ্রমিক যার সামান্য আয় দিয়ে ৮ম শ্রেণি পড়ুয়া বোন সহ পরিবারের চাহিদা পূরণ করা কঠিন ছিল, কিন্তু সাকিব সবসময় চেয়েছিল তার মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে পরিবারকে সহায়তা করতে।

৫ আগস্ট ২০২৪, সকাল ১০টায় সাকিব তার বন্ধুদের সাথে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেয়। দুপুর পর্যন্ত তারা বিজয় মিছিল নিয়ে শহরের দিকে অগ্রসর হলে জানতে পারে যে, যশোরের জাবির হোটেলে আগুন লেগেছে। সাকিব এবং তার বন্ধুরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়। হোটেলের উপর থেকে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার শোনা মাত্রই সাকিব বাকি বন্ধুদের সাথে উদ্ধার কাজে এগিয়ে যায়। সাকিব ছিল অত্যন্ত সাহসী, তাই সে ভয় না পেয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং কিছু লোককে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হলে এবং সে নিজেও ভিতরে আটকা পড়ে যায়।

এক পর্যায়ে সাকিব ১ম তলা থেকে বাইরে লাফ দেয়। কিন্তু ততক্ষণে তার শরীরের বাট ভাগ পুড়ে যায়। আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত যশোর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। চরম মর্মান্তিক এই অবস্থায় চারদিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৯ আগস্ট বিকেল ৫টা ১৬ মিনিটে সাকিব মৃত্যুবরণ করে।

শহীদ সম্পর্কে বন্ধুর বক্তব্য

ঘটনার সময় উপস্থিত বন্ধু নাঈম জানান, আমরা সবাই একসাথে ছিলাম। জাবের এর সামনে গেলে ১ জন উপর থেকে বাঁচাও বাঁচাও বললে সে দৌড়ে উপরে চলে যায়। কয়েকজনকে উদ্ধারও করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সাকিব তার বন্ধুকে বলে, "আমি ষষ্ঠ তলা পর্যন্ত উঠলে এক পর্যায়ে একটা গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট হলে আমি ফ্লোরে পড়ে যাই। পরে কোনোমতে নিচে নেমে ১ম তলা থেকে বাইরে লাফ দেই।

People's Republic of Bangladesh

Birth Certificate

Register No:

Date of Registration: 29-01-2015

Date of Issue: 29-01-2015

Birth Registration No: 2 0 0 6 4 1 2 1 6 0 7 2 4 0 0 6 9

Date of Birth: 27-11-2005

Sex: Male

Place of Birth:

Father's Name:

Mother's Name:

Permanent Address:

Present Address:

একনজরে শহীদের পরিচয়

পূর্ণ নাম	: সাকিবুল হাসান সাকিব, জন্ম: ২৭-১১-২০০৬
পেশা	: শিক্ষার্থী
ঠিকানা	: শংকরপুর, যশোর পৌরসভা, যশোর
জন্ম তারিখ	: ২৭/১১/২০০৬
পিতা	: মো: আলাল উদ্দীন (৪৬)
পিতার পেশা	: শ্রমিক
মাতার নাম	: শিল্পী আকতার (৩৯)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের বোন	: মোমতাহিনা তিসা (১৪)
পেশা	: শিক্ষার্থী
পারিবারিক আয়	: ৭০০০ টাকা

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা

২। পিতার ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে দেয়া

৩। বোনের শিক্ষার দায়িত্ব নেয়া

শহীদ মো: সোহানুর রহমান (শিহাব)

ক্রমিক : ৪০৩

আইডি: খুলনা বিভাগ ১৯

শহীদ পরিচিতি

সরকারি এমএম কলেজের অনার্স ৩য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র সোহানুর রহমান (শিহাব) লেখা পড়ার পাশাপাশি বাবার ব্যবসায়ে সহযোগিতা করতেন। তার জন্ম ৩০ এপ্রিল ১৯৯৮ সাল। পরিবারের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো হলেও, সোহান সবসময় নিজেকে এবং পরিবারকে আরও উন্নত অবস্থানে নেয়ার স্বপ্ন দেখতেন। যশোর শহরের কিসমত নওয়াপাড়ার বাসিন্দা শহীদ সোহান ছিলেন পরিবারের আশার আলো। তায়মান রহমান সাওয়াব নামে তার একটি চার বছর বয়সী ছেলে সন্তান আছে। শহীদ সোহানের বাবা আনোয়ার হোসেন লাল্টু নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সার ও কীটনাশক কারখানা পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল এক জ্বলন্ত অধ্যায়, যা দেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। কোটার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রথম থেকেই জনগণের সমর্থন পায় এবং দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী আক্রমণ এবং সরকারের কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬ জুলাই আবু সাঈদসহ সাতজন শিক্ষার্থী নিহত হলে আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই যৌক্তিক আন্দোলন দমনের জন্য স্বৈরাচারী সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এমনকি হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়েও মানুষ হত্যা করে, যার ফলে সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে ছাত্র জনতার তুমুল আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে ফ্যাসিবাদী সরকার পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সারা দেশে বিজয়ের আনন্দে মিছিল বের হয়, কিন্তু সেই আনন্দের মাঝেও যশোরে ঘটে যায় এক মর্মান্তিক ঘটনা এবং সেখানেই শহীদ হন সোহানুর রহমান শিহাব।

যেভাবে শহীদ হয়

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই শহীদ সোহান সক্রিয় ছিলেন। ৫ আগস্ট ছাত্র জনতা যশোরের রাজপথ দখলে নিয়ে স্বৈরাচার পতনের এক দফা দাবিতে স্লোগানে মুখর হয়ে হয়ে উঠে। দুপুর ২ টায় রক্তপিপাসু স্বৈরশাসকের পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে বাঁধভাঙা জোয়ারের চতুর্দিক থেকে ছাত্র জনতা বিজয় মিছিল নিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসে। এ সময় কিছু দুর্বৃত্ত ছাত্র জনতার উপর হামলাকারী যশোরের ত্রাস আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের প্রিন্টিং প্রেস ও জাবির হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা হোটেলে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য হোটেলের ভিতর ঢুকে পড়েন।

এক পর্যায়ে আগুনের উত্তাপ বেড়ে গেলে উদ্ধারকারী জনতার একটি অংশ হোটেলের মাঝে আটকে পড়েন। শহীদ সোহান তার ছোট ভাই রোহানকে হোটেলের নিচে রেখে বন্ধুদের উদ্ধারের জন্য হোটেলের ভিতরে ঢুকে যান। কিন্তু পরবর্তিতে তিনি আর বের হতে পারেননি। কিছুক্ষণ পর তিনি হোটেলের ৫ম তলা থেকে ছোট ভাইয়ের সাথে ইশারায় কথা বলেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করতে বলেন। পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় ছোট ভাই বাবাকে ফোন করেন এবং ভাইকে উদ্ধারের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। ফায়ার সার্ভিসের রেসকিউ টিম পাঁচ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আনেন এবং আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরবর্তীতে যশোর সদর হাসপাতাল মর্গে শহীদ সোহানের মরদেহ সনাক্ত করা হয়। তাকে গ্রামের বাড়ি শুরুশিয়ায় দাফন করা হয়।

শহীদ সম্পর্কে মন্তব্য

শহীদ সোহান সদালাপী ও বন্ধু বাৎসল ছিলেন। প্রতিবেশীরা তাকে খুবই ভালোবাসতো। তিনি ছিলেন পরিবারের মধ্যমণি ও আশার আলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় পরিচয়পত্র / National ID Card
নাম
মোঃ সোহানুর রহমান
Name
MD. SHOHANUR RAHMAN
পিতা
মোঃ আনোয়ার হোসেন
মাতা
মোছাঃ কহিনুর আক্তার
Date of Birth 30 Apr 1998
NID No. 375 500 9168
সোহানুর

শহীদের ব্যক্তিগত প্রোফাইল

পূর্ণ নাম	: মো: সোহানুর রহমান (শিহাব)
পেশা	: শিক্ষার্থী
ঠিকানা	: কিসমত নওয়াপাড়া, যশোর সদর, যশোর
জন্ম তারিখ	: ৩০/০৪/১৯৯৮
পিতা	: আনোয়ার হোসেন লাল্টু (৫০)
পিতার পেশা	: ব্যবসা
মাতার নাম	: কহিনুর আক্তার (৪৫)
মাতার পেশা	: গৃহিণী
শহীদের ভাই	: তানভির হাসান রোহান (২২)
পেশা	: শিক্ষার্থী। অনার্স, উপশহর ডিগ্রি কলেজ
শহীদের ছেলে	: তাফমান রহমান সাওয়াব
বয়স	: ৪ মাস

পরামর্শ

১। শহীদ পরিবারের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা।

২। শহীদের শিশু সন্তানের জীবনধারণের এবং পড়াশোনার সমস্ত ব্যয় বহন করা।

৩। শহীদের স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

“দেশ ও মানবতার তরে সবান্ধব জীবন উৎসর্গ করেছেন শহীদ মোর্শেদ”

শহীদ সৈয়দ মিথুন মোর্শেদ

ক্রমিক: ৪০৪

আইডি: খুলনা বিভাগ ২০

শহীদের পরিচয়

বীরোচিত ২৪ এর বিপ্লবে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আমাদের বীর যোদ্ধারা। তাঁদের মধ্যে অনেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন একজন মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ 'জীবন'। তেমনি এক প্রদীপ্ত নক্ষত্র শহীদ সৈয়দ মিথুন মোর্শেদ। তিনি ২১ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ শাহীন ফরহাদ এবং মাতার নাম সৈয়দা নাজনিন নাহার। তাঁর পিতা একজন পুলিশ অফিসার যিনি বর্তমানে যশোর জেলা ডিবি অফিসে কর্মরত আছেন। শহীদ মোর্শেদের মা একজন গৃহিণী। পিতা-মাতা ও ৩ ভাইসহ মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত মোর্শেদদের পরিবার। মৃত্যুকালে তিনি এম এম কলেজ, যশোরের মাস্টার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। কোটা আন্দোলনের শুরুর দিকেই মোর্শেদ তার দুই বন্ধু শহীদ ফয়সাল এবং সোহানের সাথে সক্রিয় হন।

ঘটনার সামগ্রিক বিবরণ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ঘটে যাওয়া কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল এক জ্বলন্ত অধ্যায়। এটি দেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। কোটার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন প্রথম থেকেই জনগণের সমর্থন পায় এবং দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সন্ত্রাসী আক্রমণ এবং সরকারের কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬ জুলাই আবু সাঈদসহ সাতজন শিক্ষার্থী নিহত হলে আন্দোলন আরও বেগবান হয় এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই যৌক্তিক আন্দোলন দমনের জন্য স্বৈরাচারী সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এমনকি হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়েও মানুষ হত্যা করে, যার ফলে সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। অবশেষে ছাত্র জনতার তুমুল আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে ফ্যাসিবাদী সরকার পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ছাত্র-জনতার কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু থেকেই মিথুন তার দুই বন্ধু সোহান এবং আরেক বীর শহীদ ফয়সালের সাথে সক্রিয় ছিলেন। ৫ আগস্ট ছাত্রজনতা যশোরের রাজপথ দখলে নিয়ে স্বৈরাচার পতনের এক দফা দাবীর স্লোগানে মুখরিত মুখর হয়ে ওঠে।

৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে এম এম কলেজ, যশোরের মাস্টার্সের শেষ বর্ষের ছাত্র সৈয়দ মিথুন মোর্শেদ তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিজয় মিছিলে অংশ নিতে চাচড়া মোড়ে যান। দুপুর ২:০০ ঘটিকায় রক্তপিপাসু স্বৈরশাসক পতনের খবর ছড়িয়ে পড়লে বাঁধভাঙা জোয়ারের ন্যায় চতুর্দিক থেকে ছাত্রজনতা মিছিল নিয়ে শহরের দিকে ছুটে আসে। এসময় দুর্বৃত্তরা ছাত্রজনতার উপর হামলাকারী যশোরের ত্রাস আওয়ামিলীগের সাবেক সংসদ সদস্য শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন প্রিন্টিং প্রেস ও জাবির হোটেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা হোটেলে আটকে পড়া লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য হোটেলের ভিতর ঢুকে পড়েন। আগুনে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধারের জন্য শহীদ মোর্শেদ মিথুন তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে উদ্ধার কাজে অংশগ্রহণ করেন। জাবির হোটেলের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে তারা হোটেলের ভিতরে আটকা পড়ে যান। অগ্নিকাণ্ডের সময়, মিথুনের চাচাতো ভাই কোনমতে বের হয়ে আসতে সক্ষম হলেও, মোর্শেদ ভিতরে আটকা পড়েন। তার বাবাকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার প্রচেষ্টায় অংশ নেন। কিন্তু জটিল পরিস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত মিথুনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফায়ার সার্ভিসের রেস্কিউ টিম পাঁচ ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আহত-নিহতদের উদ্ধার করে পরবর্তীতে পরিবার যশোর সদর হাসপাতালে তার মরদেহ শনাক্ত করেন।

শহীদের নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর অভিব্যক্তি

মিথুন কোটা আন্দোলনের শুরু থেকেই তার দুই বন্ধু, ফয়সাল ও সোহানের সাথে সক্রিয় ছিলেন। আন্দোলনে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সাহসিকতা তাকে স্থানীয়দের প্রশংসায় ভাসিয়েছে।

মিথুনের বাবা সৈয়দ শাহীন ফরহাদ যশোর ডিবি অফিসে পুলিশ অফিসার হিসেবে কর্মরত। তিনি বলেন, "আমার ছেলে মিথুন এম এম কলেজে পড়তো। শুরু থেকেই আন্দোলনে সক্রিয় ছিল। ছোট থেকেই ভাল পথে চলেছে আমার ছেলে। আমি শুধু চাইতাম সে ভালো মানুষ হোক। তার সাহসিকতা ও নিষ্ঠা আমাদের পরিবারের জন্য গর্বের বিষয়। আন্দোলনের সময় সে আমাকে বলেছিল, 'বাবা তুমি সরকারি চাকরি কর, কিন্তু আমাদের ভাইদের ওপর গুলি হচ্ছে, আমরা এটা সহ্য করতে পারছি না।' তার মৃত্যু আমাদের জন্য গভীর শোকের কারণ, কিন্তু তার সাহসিকতা ও আদর্শ আমাদের প্রেরণা দেবে।"

একনজরে শহীদের পরিচয়

পূর্ণনাম	: সৈয়দ মিথুন মোর্শেদ
জন্ম তারিখ	: ২১/০৮/১৯৯৯
পেশাগত পরিচয় ও প্রতিষ্ঠান	: ছাত্র, মাস্টার্স শেষ বর্ষ, এম এম কলেজ, যশোর
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: খোলাইতলা, ইউনিয়ন: কোটাকোল, থানা: লোহাগড়া, জেলা: নড়াইল
বর্তমান ঠিকানা	: বাসা/মহল্লা: উপশহর, এলাকা: পৌরসভা, থানা: যশোর সদর, জেলা: যশোর
পিতার নাম	: সৈয়দ শাহীন ফরহাদ
পিতার পেশা ও বয়স	: চাকুরী, ৪৯ বছর
পিতার পেশা	: পুলিশ অফিসার, যশোর ডিবি অফিস
মাতার নাম	: সৈয়দা নাজমিন নাহার
পেশা	: গৃহিনী, ৪০ বছর
পরিবারের সদস্য সংখ্যা	: ০৫(পাঁচ) জন
আয়ের উৎস	: বাবার চাকুরী
	: ভাই-১: সৈয়দ মাইন্দু মোর্শেদ(২২), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী
	: ভাই-২: সৈয়দ মাহির মোর্শেদ (১৮), এইচএসসি পরীক্ষার্থী
নিহত হওয়ার স্থান	: জাবির হোটেল, যশোর
হতাহতের কারণ	: জাবির হোটেলে আগুনে পুড়ে মারা যান
আহত ও নিহত হওয়ার সময় ও স্থান	: ৫ আগস্ট, ২০২৪, জাবির হোটেল, যশোর
শহীদের কবরের অবস্থান	: গ্রামের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়ায়

وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَٰلَهُمۡ. سَيَهۡدِيهِمۡ
وَيُصۡلِحُ بَالَهُمۡ. وَيُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمۡ

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন।

-সুরা মুহাম্মদ আয়াত: ৪-৬

জুলাই ২০২৪ বিপ্লবের শহীদ স্মারক

২য় স্বাধীনতার শহীদ যারা

ষষ্ঠ খণ্ড

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী